UNIVERSITY OF CALCUTTA

(বঙ্গলক্ষ্মী)

দ্বাত্রিংশ বর্ষ—বর্ণানুক্রমিক বর্ষসূচী

(মাঘ ১৩৬৩—কার্ত্তিক ১৩৬৪ বঙ্গাব্দ)

7563
a2/21

লেখক-সূচী

লেখক	পৃষ্ঠা
শ্রীঅবনী নাথ রায়—ছোট গল্প (প্রবন্ধ)	৪০
শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য—নববর্ষে (কবিতা)	৩৭
—দিবসের নাহি আর ক্ষণ অবকাশ	১২০
শ্রীঅনুরূপা দেবী—প্রেমের পরিণতি (গল্প)	
শ্রীঅরুণ সরকার—অন্নপূর্ণা স্মরণে	
—রবীন্দ্রকাব্যে শিশু (প্রবন্ধ)	
শ্রীঅরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়—রেলওয়ে টাইম টেবল	
শ্রীঅরুণা কর্ম্মকার—কালান্তর (গল্প)	
শ্রীঅরুণা রায়—সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটী কথা	১৮
শ্রীআদিত্য নাথ মিত্র—প্রশ্ন	১২০
শ্রীআশা গঙ্গোপাধ্যায়—নবতীর্থ (গল্প)	৯
শ্রীআরতি দত্ত—ঝরাই থেকে যায়	১০৯
শ্রীইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য—ছিট্টিনাশ (গল্প)	৪
শ্রীঐন্দ্রিলা দেবী—মৃত্যু যদি আনে অমৃত আলোক তবে তাই হোক	
শ্রীকণা দেবী, ভারতী—বৃক্ষরোপণ (গল্প)	
—যার যেথা স্থান	
শ্রীকরুণা চন্দ্র—অনুরাগ (কবিতা)	২৩
ডাঃ কৃষ্ণপদ গঙ্গোপাধ্যায় —নারীদরদী দ্বিজেন্দ্রলাল (প্রবন্ধ)	
শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায়—পুঁচিপে বৈশাখের প্রভাব (প্রবন্ধ)	৩৮
শ্রীজয়দেব রায়—রবীন্দ্রনাথের গানের আদর (প্রবন্ধ)	৪২
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ—মহিলা সমাচার ৬৬, ৯৬, ১৩২	
শ্রীডলি চট্টোপাধ্যায়—কালো মেয়ে (কবিতা)	২৩
শ্রীতপতী মুখোপাধ্যায়—জন্মদিনে (কবিতা)	
—ব্যর্থতা (কবিতা)	২২
—ফেরিওয়ালা (প্রবন্ধ)	৭৮
শ্রীতারাপদ রায়—রাজগীর কুণ্ড ও নালন্দার পথে	১১৫
শ্রীদেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় —চিরদিন কাহারো সমান না যায় (গল্প)	৮১
শ্রীনমিতা রায় চৌধুরী—পল্লী শিল্পের উন্নয়নে	১০২
শ্রীপুষ্প দেবী—অভাবনীয় গল্প (গল্প)	৪৮
—অন্ত্যোপচার	১০২
—সার্থকনামা সরোজনলিনী	২
—মাতৃভূমি (কবিতা)	৬৯
শ্রীপ্রতিমা সরকার—কীর্ত্তিমান ভারত (প্রবন্ধ)	২৪
শ্রীপ্রভাবতী ভট্টাচার্য্য—নবান্ন (প্রবন্ধ)	৩০
শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু—অন্নপূর্ণার স্নেহের তনয় তনয়াদের প্রতি	১১৯
শ্রীপ্রশান্ত মিত্র—রূপকল্প (কবিতা)	৭০
শ্রীপ্রীতি চক্রবর্ত্তী—দক্ষিণের মেয়ে (প্রবন্ধ)	৭৯
শ্রীবাণী রায়—অন্নপূর্ণা মোহান্তী	১০৭
শ্রীবন্দনা দেবী—কবি নজরুল ইসলাম (প্রবন্ধ)	৮৩
শ্রীবনতা ঘোষ—গান (কবিতা)	৮৬
—সহজ মানুষ (কবিতা)	১২১
ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী—স্ত্রী শিক্ষা সংপ্রসারণে বাঙ্গালী মুসলমান	
শ্রীমুন্নিকা দাস—অনুতাপ (কবিতা)	
শ্রীরমা মিত্র—মহিলা সমাচার	
শ্রীশিবানী বন্দ্যোপাধ্যায় —বাঙ্গালী প্রীতি ও রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ)	৪০
শ্রীশৈলকালী মুখোপাধ্যায় প্রথমা (গল্প)	৭৩
শ্রীশৈলেন বিশ্বাস—ভ্রান্তি (কবিতা)	৮৬
স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত—ডায়েরী হইতে	১
শ্রীসুধাকান্ত দে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ছিটেকোঁটা (প্রবন্ধ)	৫৮
শ্রীসুশীলতা দত্ত—অবিবর্ত্তন (গল্প)	১২২
শ্রীহেমলতা ঠাকুর—জগৎ প্রেম সাধনা চায় (কবিতা)	২১
—নূতন যুগের ঘর (কবিতা)	১১৯
শ্রীঅনুপ্রভা ভাদুড়ী—কৃষ্ণকলি (উপন্যাস ২৫,৬০,৮৮,১২৫	
—সেবা (কবিতা)	২২

লেখ-সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
অনুরাগ (কবিতা)—শ্রীকরুণা চক্র	২৩
অনুতাপ (কবিতা)—শ্রীমুখিকা দাস	১২১
অন্নপূর্ণা মোস্তাফী—শ্রীবাণী রায়	
অন্নপূর্ণা স্বরণে—শ্রীঅরুণ সরকার	
অন্নপূর্ণার স্নেহের তনয় তনয়াদের প্রতি শ্রীপ্রভাত কিরণ বসু	১১৯
অভাবনীয় (গল্প)—শ্রীপুষ্প দেবী	৪৮
অস্ত্রোপচার—শ্রীপুষ্প দেবী	১০৪
কবি নজরুল ইসলাম (প্রবন্ধ)—শ্রীমঞ্জুলা দেবী	৮৩
কালান্তর (গল্প) - শ্রীকরুণা কর্মকার	২৮
কালো মেয়ে (কবিতা) - শ্রীউর্মি চট্টোপাধ্যায়	২৩
কীর্তিমান ভারত (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রতিমা সরকার	২৪
কৃষ্ণকলি (উপন্যাস)—শ্রীকণপ্রভা ভাদুড়ী ২৫,৬০,৮৮,১২৫	
গান (কবিতা)—শ্রীমমতা ঘোষ	৮৬
জগৎ প্রেম সাধনা চায় (কবিতা)—শ্রীহেমলতা ঠাকুর	২১
জন্মদিনে (কবিতা)—শ্রীউমপতী মুখোপাধ্যায়	৪৪
চিরদিন কাহারো সমান না যায় (গল্প) —শ্রীদেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	৮১
ছিটিনাথ (গল্প)—শ্রীইন্দুমতী ভট্টাচার্য্যে	৪
ছোট গল্প (প্রবন্ধ)—শ্রীঅবনী নাথ রায়	
ডায়েরী হইতে - বসীয়া সরোজনলিনী দত্ত	
দক্ষিণের মেয়ে (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রীতি চক্রবর্ত্তী	৭৯
নবতীর্থ (গল্প)—শ্রীআশা গংগোপাধ্যায়	৯
নববর্ষে (কবিতা)—শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	৩৭
নবান্ন (প্রবন্ধ)—শ্রীপ্রভাবতী ভট্টাচার্য্য	৩০
নারী দরদী দ্বিজেন্দ্রলাল (প্রবন্ধ) —ডাঃ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়	
নূতন যুগের ঘর - শ্রীহেমলতা ঠাকুর	১১৯
পশ্চিমে বৈশাখের প্রভাব (প্রবন্ধ) —শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায়	৩৮
পরিবর্ত্তন—শ্রীসুধালতা দত্ত	৯০,১২২
পল্লী শিল্পের উন্নয়নে—শ্রীনলিতা রায় চৌধুরী	১০২
প্রথমা (গল্প)—শ্রীশেফালী মুখোপাধ্যায়	৭৩
প্রশ্ন (কবিতা)—শ্রীআদিত্য নাথ মিত্র	১২০
প্রেমের পরিণতি (গল্প)—শ্রীঅনুজাবালা দেবী	১১
ফেরিওয়ালা (প্রবন্ধ)—শ্রীউমপতী মুখোপাধ্যায়	৮৭
বার যেথা স্থান—শ্রীকণা দেবী	১১২
বই-এর কথা (সমালোচনা)—	৩৩
বাঙ্গালী প্রীতি ও রবীন্দ্রনাথ (প্রবন্ধ) শ্রীশিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়	৪০
যৌবন	১০১
রূপকথা (গল্প)—শ্রীকণা দেবী, ভারতী	৫৩
ব্যর্থতা (কবিতা)—শ্রীউমপতী মুখোপাধ্যায়	২২
মাতৃমূর্ত্তি (কবিতা)—শ্রীপুষ্প দেবী	৬৯
মহিলা সমাচার—শ্রীরমা মিত্র	৩১
মহিলা সমাচার—শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ৬৫, ৯৬,১৩২	
মৃত্যু যদি আনে অমৃত আলোক তবে তাই হোক— শ্রীইন্দিরা দেবী	
মিলনের নাহি আর কণ অবকাশ— শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য	১২০
রবীন্দ্রকাব্যে শিশু (প্রবন্ধ)—শ্রীঅরুণ সরকার	৪৫
রবীন্দ্রনাথের গানের আদর (প্রবন্ধ)—শ্রীঅজদেব রায়	৪২
রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে হিটেকৌটা (প্রবন্ধ)—শ্রীসুধাকান্ত দে	৫৮
রেলওয়ে টাইম টেবল—শ্রীঅরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২৮
রূপকল্প (কবিতা)—শ্রীপ্রভাত মিত্র	৭৮
রাজগীর কুণ্ড ও নালন্দার পথে - শ্রীতারাপদ রায়	৯১৫
শোক-সংবাদ	১০০
শ্রাবণী (কবিতা)—শ্রীশৈলেন বিশ্বাস	৮৪
স্বপ্নই থেকে যায়—শ্রীআরতি দত্ত	১০৯
স্ত্রী শিক্ষা সংপ্রসারণে বাঙ্গালী যুগন্ধরগণ— ডক্টর যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী	১১৯
সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি— ৩৪, ৬৭, ৯৭	১৩৩
সহজ মানুষ (কবিতা)—শ্রীমমতা ঘোষ	১২১
সার্থকনামা সরোজনলিনী—শ্রীপুষ্প দেবী	২
সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা —শ্রীঅরুণা রায়	
সেবা (কবিতা)—শ্রীকণপ্রভা ভাদুড়ী	

P30214

৩২শ বর্ষ] [বঙ্গলক্ষ্মী, মাঘ, ১৩৬৩ [১ম সংখ্যা

ডায়েরী হইতে

স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্ত

২৫শে ডিসেম্বর, ১৯২০, লণ্ডন

লাঞ্চের পর আমরা Kew Gardens দেখতে বেরলুম। Gloucester Road থেকে Tube এ করে Kew Gardens এ গেলুম কিন্তু X'mas day বলে বাগান বন্ধ ছিল। তখন আমরা ফিরে আসব মনে করলুম কিন্তু আমার মনে হলো যে যদি খোঁজ করি তাহলে হয়তো আমরা ১৮৯৪ সালে যে বাড়ীতে ছিলুম সেই বাড়ীটা খুঁজে পাব। বন্ধুরা ও উনি আমাকে ঠাট্টা করতে লাগলেন। উনি বললেন, তুমি বাড়ির নাম বা কোন রাস্তায় বাড়ী তা জান না, কেমন করে বাড়ীটা খুঁজে পাবে? আমি একজন লোককে জিজ্ঞাসা করলুম যে এ জায়গায় কোন মেয়েদের স্কুল আছে কিনা, কিন্তু কেউ ভাল করে বলতে পারল না। তারপর একজন লোক বলে দিলো রাস্তা দেখিয়ে যে ঐ দিকে একটা স্কুল ছিল, বোধ হয় এখনও আছে। আমরা সেদিকে গিয়ে দেখি। 'মেয়েদের স্কুল' লেখা একটি Notice রয়েছে। কাছে যেতেই আমি বাড়ীটা চিনতে পারলুম। বাড়ীর পাঁচিলের উপর দিয়ে আমি দেখ্‌ছিলুম এমন সময় একটি মেয়ে জিজ্ঞাসা করল যে আমরা কি চাই। উনি বললেন "আমাদের যখন আট বছরের ছিল তখন সে এখানে এসেছিল, তার মনে হয়, সে এই বাড়ীতে ছিল, তাই সে দেখছে।" তখন মেয়েটি নেমে এসে আমাদের সামনের দুটো ঘর, যেটা সিস্টিনদের স্কুলরুম ছিল ও যেটা আমাদের স্কুলরুম ছিল সেগুলি দেখালো। দুটো ঘরই ক্লাশ-রুম, অন্যঘর দেখাতে পারলো না।

বাড়িটা দেখে বড় আনন্দ হলো, আমি একবারও মনে করিনি যে আবার সেই বাড়িটাকে দেখবো কারণ আসবার সময় বাবার কাছে বাড়িটার ঠিকানা জেনে আসতে ভুলে গিয়েছিলুম। আজ যদিও Kew Gardens দেখলুম না তবু স্কুলটা দেখে এখানে আজ আসা সার্থক হয়ে গেল।

———

সার্থকনামা সরোজনলিনী

শ্রীমতী পুষ্প দেবী

সরোজ নলিনী সমিতির অন্যতমা সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা আরতি বসুর কাছ থেকে জোর অর্ডার এসেছে—আমার দেখা প্রাতঃস্মরণীয়া সরোজ-নলিনী দেবীর সম্বন্ধে কিছু লিখে দিতে হবে।

যতদূর স্মরণ হয়, সে হল ১৯২০ সালের কথা। বাঁকুড়ায় আমার পিতৃদেব স্বর্গত সুকুমার চট্টোপাধ্যায় তখন সব-ডিভিসন্যাল অফিসার। এমন সময় শ্রদ্ধেয়া সরোজ-নলিনী দেবীকে সঙ্গে নিয়ে শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় বাঁকুড়ায় এলেন কার্নেইল হয়ে। সঙ্গে একমাত্র পুত্র বীরেন্দ্র-সদয় স্নেহাস্পদ বালক; যতদূর মনে পড়ে, তখন তার বয়স ৮।৯ বছর হবে, দশও হতে পারে। আমিও বোধ হয় তখন ঐ বয়সীই ছিলুম। কিন্তু সে হল সে যুগের কথা—যখন বারো বছরের মেয়ে ঘরণী গিন্নী হয়ে সংসার করে আর বারো বছরের ছেলে হাফপ্যাণ্ট পরে ফুটবল খেলে বেড়ায়; কাজেই শ্রীমান বীরেন্দ্রকে আমি ছোটই ভাব-তুম। ঐ সময় প্রথম দেখলুম সরোজনলিনী দেবীকে—অনুমান তাঁর বয়স তখন ২৭।২৮-এর উর্দ্ধে হবে না। দেহ-সৌষ্ঠবের মত রং, গড়ন ছিল সতেজ একগুচ্ছ রজনীগন্ধার মত। কি অনুপম লাবণ্য যে ছিল তাঁর মুখে, তা না দেখলে বোঝানো কঠিন আর সবচেয়ে সুন্দর মমতাভরা ছিল তাঁর চোখদুটি—বুদ্ধিতে উজ্জ্বল আর মমতায় কোমল ঠিক যেন দুটি আরতি-প্রদীপ। তাঁকে দেখে মনে পড়ত কবিগুরুর লেখা কবিতা—

"আমার এ দেহখানি তুলে ধর,
তোমার ও দেবালয়ের প্রদীপ কর।"

আমার বাবা অত্যন্ত আদর্শবাদী তেজস্বী মানুষ ছিলেন। সেকালের আই-সি-এস' কুলের মধ্যে শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্ত মহাশয় যেমন ব্যতিক্রম ছিলেন, আমার বাবার মত ব্রিটিশ-মন্ত্রে দীক্ষিত বিলাতীফেরত মানুষও ঠিক তেমনি ডেপুটীকুলের মধ্যে বিরল বললে অত্যুক্তি হয় না। অত্যন্ত পিতৃভক্ত ছিলেন বলে 'ডেপুটী' ও 'রায়বাহাদুর'—দুটো খেতাব তিনি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন বটে, কিন্তু ও দুটোর প্রতি তাঁর কিঞ্চিন্মাত্র মমতা ছিল না। তাই তাঁর পিতৃবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি 'রায়বাহাদুর' খেতাব ও বহুজন-কাঙ্ক্ষিত 'আই-সি-এস' উচ্চপদ ত্যাগ করে দেশ-সেবার উদ্দেশ্যে কবিগুরুর আহ্বানে শ্রীনিকেতনে গিয়ে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বাঁকুড়ায় থাকার সময় চাকরিতে ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর ধ্যান ও জ্ঞান ছিল দেশ ও দেশ-বাসীর সেবা। আমার মা অসুস্থতাবশতঃ তখন কলকাতায় থাকতেন। আর আমি একা কার কাছে থাকব—তাই বাবা গ্রামাঞ্চলে বা সহরের বাইরে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। সেই কারণে বাবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রদ্ধেয় গুরুসদয় দত্ত ও সরোজনলিনী দেবীর নিকট আমার অনেক বার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল।

আদর্শবাদী পিতার কন্যা আমি। বয়স তখন বেশী না হলেও ঐ আদর্শ সম্পত্তির প্রতিটি কাজের মূল্য আমি অন্তর দিয়েই উপলব্ধি করতুম। তা'ছাড়াও আমার নিজস্ব একটা দিক ছিল। আমার বাবা যে সাধারণের সঙ্গে সমান নন—এই গর্ব্বে আমার বুকটি ছিল ভরা। কাজেই ওঁদের কাছে যাবার প্রলোভনও আমায় ওঁদের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। দূর-দূরান্তরের পথে একত্র যাওয়ার সময় ওঁদের আলো-চনার মধ্যে যে গভীর বেদনা ও মমতাবোধ দেশবাসীর প্রতি দেখেছি, তাতে ওঁদের প্রতি আমার শ্রদ্ধারও অন্ত ছিল না।

দেশের দুর্গতদের জন্য কাজে বাবা ও দত্ত মহাশয় উঠে-পড়ে লাগলেন। সে যে কি উৎসাহ, কি আগ্রহ—তা আজও আমার মনে আছে। পুকুরের পানা পরিষ্কার, সমবায় সমিতি স্থাপন, শিল্প প্রদর্শনী, গ্রামে গ্রামে যান্ত্রিক-লণ্ঠন সহযোগে রোগ নিবারণের ব্যবস্থা—কিছু আর বাকী রইল না। ঐ কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনীসূত্রে মনে পড়ে—ঐ সময়

প্রথম আমি আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়কে দেখি। যে সময় কৃষি-শিল্প-প্রদর্শনী উদ্বোধনের ভার স্বর্গের গুরুসদয় দত্ত মহাশয় আচার্য্যদেবকে দিতে গিয়েছিলেন, তখন সেই যুগ—যখন বাড়ীতে একখানা 'গীতা' থাকলেও গৃহকর্ত্তাকে গ্রেপ্তার করা হতো। আমার আজও মনে আছে—সেই প্রদর্শনীতে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে কি আবেগে আচার্য্যদেব তাঁর খাটো বহরের খদ্দরের ধুতির কোঁচার খুট মাথায় তুলে বলেছিলেন—'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই!' উত্তেজক দর্শকমণ্ডলীও 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনিতে চারিদিক ধ্বনিত করে তুলেছিলেন। ঐ সভায় আমিও দশ বছরের বালিকা মাথায় লাল রিবন বেঁধে 'দেশ দেশ নন্দিত করি, মন্দ্রিত তব ভেরী' গানটি গেয়েছিলুম। গুরুসদয় দত্ত মহাশয় ও সরোজনলিনী দেবীর গানটি ভাল লেগেছিল। তাঁদের সেদিনের আদর আমার মনে আজও তেমনি অম্লান হয়ে আছে। ঐ দিনে দত্ত মহাশয়ের চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। আচার্য্যদেবের ভাষণে দত্ত মহাশয়ের প্রশংসার উত্তরে তিনি বলেন—এ সমস্ত প্রশংসাই সুকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাপ্য। চিরকালই এ সব জায়গায় অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের কাজের প্রশংসা উপর-ওয়ালারা নিজেদের প্রাপ্য বলেই মনে করেন। এই সামান্য কটি কথার মধ্যেই সেদিন তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

ঐ দিনই স্বর্গতা সরোজনলিনী দেবীর কাছ থেকে গল্প শুনি—তাঁর পিতা বি, যে মহাশয় বাঁকুড়ায় সুপে যখন কালেক্টর ছিলেন, তখন নিতাইচরণ নাগ নামে একজন সঙ্গীত-শিক্ষকের কাছে তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তাঁর পুত্র গতিরুক নাগ মহাশয় আমার সঙ্গীত-শিক্ষক ছিলেন। যতদূর স্মরণ হয়, শ্রীমান বীরেন্দ্রকৃষ্ণও তাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন।

ঐ সময়ে সরোজনলিনী দেবীর সুমধুর ব্যবহার দুঃখী, অন্ধ ও অনাথা মেয়েদের উদ্ভিন্নবস্ত্রে কি আপ্রাণ চেষ্টা আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তা বলে শেষ করা যায় না। স্বামীর ছায়ার মতন সঙ্গিনী ছিলেন সরোজনলিনী দেবী। বাঁকুড়ার দারুণ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপ, হাড়কাঁপানো শীত, বর্ষার দু'কূল-ব্যাপী প্লাবন কখনও তাঁকে দমাতে পারে নি। স্বর্গত কবি যতীন সেনগুপ্ত রামচন্দ্রের উপর লেখা কবিতায় তিনি লক্ষ্মণ সম্বন্ধে বলেছেন—

ভাবের প্রেরণে কি দিলে মিশায়ে তুলিল প্রেমের সুধা
শুধু উর্ম্মিলা ভেবেছিল নয়, ভেবেছিল নিদ্রা ক্ষুধা।

ঠিক সেই কথাই মনে হতো সরোজনলিনী দেবীকে দেখে। স্বামীর মধ্যে তিনি যেন পরিপূর্ণ ছিলেন, সে প্রেমের মধ্যে এতটুকু ফাঁক ছিল না। আজ অনেক মেয়েকে দেশের কাজে নামতে দেখি, কিন্তু তাঁরা যেন স্বামীর কাছ থেকে অনেকটা সরে যান।

তখন গ্রামে গ্রামে সরোজনলিনী সমিতি হলো। চরকা, মোজা বোনার কল নিয়ে গিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতেন সরোজনলিনী দেবী। তবুও প্রতি বাড়ীতে বৈঠক বসল, কি করে মেয়েদের সামলান যাবে। ম্যাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী নিজে ডেকেছেন—না পাঠাবার সাহসও কারুর নেই, অথচ মন নানা আশঙ্কায় পরিপূর্ণ। সব কথা বলার জায়গা আজ এ ছোট প্রবন্ধে নেই—একটি ছোট গল্প শুধু বলি:

একজন স্থানীয় ভদ্রলোক দত্তমহাশয়ের কাছে চলেই গেলেন—গিয়ে বললেন, বিধবা মেয়েটা আমার সংসার মাথায় করে রেখেছে, তাকে এইভাবে ক্যাম্পানোর চেষ্টা কেন? মেয়ে যদি সভা-সমিতি করে বেড়ায় তবে আমাই হয়ত বাঁধুনি-চাকরানি রাখতে একগুণো টাকা খরচ হয়ে যাবে।

মনে আছে, এই গল্প কি গভীর দুঃখের সঙ্গে বাবার কাছে করেছিলেন। যেদিন এ সব কাজ ওঁরা দু'জনে আরম্ভ করেছিলেন, তখন এ কাজ করা যে কি কঠিন ছিল তা আজকের দিনে মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না। কায়মনোবাক্যে স্বামীর সহধর্ম্মিণী ছিলেন তিনি। রূপের মোহ, যশের মোহ, অর্থের মোহ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। তাঁকে শেষ দেখি আমি আমার বিয়ের রাতে—ওঁরা দু'জনেই এসেছিলেন—তাঁর সেদিনের আশীর্ব্বাদ আমি আজও ভুলি নি।' বলেছিলেন, 'দুঃখের মা হয়ো তুমি। আরো মনে আছে একটি মধুর কৃত্রিম কলহ। সে হলো, ঐ রাতে আমার শ্বেতমর শ্বশুর (বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ ভাষাদাস মুখোপাধ্যায়) মহাশয়ের সঙ্গে দত্ত মহাশয়ের বয়-কনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে।

এর পর সরোজনলিনী দেবীর সঙ্গে দেখা হয়নি। গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছিল রামমোহন লাইব্রেরীতে—কি একটা অনুষ্ঠানে। সেই শেষ দেখা। তখন সরোজনলিনী দেবী চলে গেছেন। তিনি আগের মতই আমাদের কাছে ডেকে আদর করলেন, কত কথা কইলেন। কিন্তু আমার চোখে বারে বারেই জল এসে পড়ছিল তাঁর পাশে সেই দেবীমূর্তিটির অভাব দেখে। একটি মানুষকে হারানো যে আর একটি মানুষের মুখে অমন করে ফুটে থাকতে পারে তা আমি কখনও দেখিনি। মনে পড়ল সতীহীন শিবের কথা। মনে মনে দু'জনকেই প্রণাম করে বললুম—

"তোমার হিয়ার কমল যে শুধু একেলা তোমার নয়
আমাদের চোখে অশ্রুর যার ছিল সেই পরিচয়।"

———

ছিষ্টি নাশ

শ্রীমতী ইন্দুমতী ভট্টাচার্য্য

ভুরু চোখ কুঁচ্‌কে মুখে অপূর্ব্ব বাক্‌ভঙ্গী ফুটিয়ে সব কিছুতেই 'ছিষ্টি নাশ হ'ল' বলা স্বভাব নথুড়ীর। বাঘাবির মত রস কষহীন পাকৃতাড়ে চেহারার ফরাটে, ফরাটে মানুষটি, চুল এত ছোট ক'রে ছাঁটা যে পাঁস দেখা যায় মাথার; ধোঁটে বা গরদের তেলচিটে ধরা খান পরণে। শুধু জল কাচ ক'রে ক'রে আর রোদ্দুরে না দিয়ে আর শুখনো বা ভিজে অবস্থায় প'রে প'রে যার গন্ধে বোধকরি ভূতের চোদ্দপুরুষও পালায়; হাতে পায়ে হাজা ধরা নথুড়ীকে দেখ্‌লে কে মায়েদের কথা বিশ্বাস করবে বল যে একদিন নাকি এই নথুড়ী ছিলেন জাকের সুন্দরী, আর তখনকার দিনের কেতা দুরস্ত পাশী শাড়ী পরা, মেম খোঁপা বাঁধা, লেশ-বসানো আধা গায়ে বড় অফিসার নকাকা বাবুর স্ত্রী, সকলের একান্ত আদরের আর গর্ব্বের নবৌমা? সুদূর বোম্বাইয়ে থাকতেন আর বাকে মাঝে আসতেন বাড়ীতে নতুন নতুন বিস্ময় আর আনন্দের পাড়া জাগিয়ে?

কিন্তু যেমন বেশীর ভাগ মেয়ের ভাগ্যেই এসব সম্বল তেমনি সম্বল নথুড়ীর ভাগ্যেও। নকাকা মারা গেলেন যখন তিরিশ বছর বয়সে নথুড়ীর বয়স তখন আঠার, একটি ছেলে কোলে।

সেদিনের গল্পটা যে মায়েদের মুখে কতবার শুনেছি। নকাকা ছুটি পাননি ব'লে সেবার পুজোর সময় নথুড়ীকে আর বাচ্চাকে ফেলে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বিজয়া দশমীর দিন—সকালে প্রতিমা বিসর্জ্জন হওয়া ছিল তখন আমাদের গ্রামের রীতি, তারপর বউ ঝি, ছেলে বুড়োর এ বাড়ী, ও বাড়ী, সে বাড়ী গিয়ে বিজয়া সম্ভাষণ।

বাড়ীর সকলেই যথারীতি পুজোর কাপড় প'রে এর ওর বাড়ী নমস্কার করতে যাচ্ছেন।—নথুড়ীর সাজটা দেখ্‌বার মত। সকালে স্নান ক'রে নিয়েছেন তাই হাঁটু পর্য্যন্ত ছড়ানো চুলের রাশি যেছে এলানো; গলায়, প্রকোষ্ঠে, বাহুতে, কাণে, বোম্বাই প্যাটার্ণের ঝক্‌ঝকে নতুন গহনা—খোকা হবার আগে সাধের সময় পেয়েছেন, নাকে হীরের নাক ছাবি, সিঁথি ভরি সিঁদুর আর আধভাঙা চাঁদের মত বাঁকা আর ঘন দুধের সরের বৎএর কপালে জোড়া ভুরুর ঠিক ওপরে ছোট্ট সিঁদুর টিপ্—এর ওপর একখানা যেমন তেমন শাড়ী পরলেই যথেষ্ট হ'ত কিন্তু আজকের এই বিশেষ দিনে প'রেছেন নথুড়ী লাল টুক্‌টুকে রংএর সোণালী গুল্‌দার বেনারসী শাড়ী—আল্‌তাপরা সেই সাদা পদ্মের পাপড়ির মতো পা দুখানির ওপর যে শাড়ীর লুটিয়ে পড়াটুকুই শুধু নাকি ছিল দেখ্‌বার মতন।

মা বড় ভালবাসতেন নথুড়ীকে, মায়ের মুখেই এসব কথা শোনা। ঠাকুমা ঠাকুদ্দাকে প্রণাম ক'রে গিয়েই নাকি নথুড়ী এক ছুটে উঠে গেলেন ওপরে—"নবৌমা", "নবৌমা"

ডাক পাড়তে লাগল' সবাই। মা কিন্তু চুপি চুপি এসে দেখলেন নখুড়ীমা ঘরে এসে নকাকার ফটোটা নামালেন মেঝেতে, তারপর ফটা বই দিয়ে চেপে দিয়ে বসিয়ে রেখে মাথা ঠুকে ঠুকে অনেকবার প্রণাম করলেন, আর বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে কি বললেন—প্রায় পাঁচ মিনিট, তারপর মাথা তুলে চোখের জল মুছে ফটোটি যথাস্থানে রেখে নেমে এলেন নীচে। মা বলতেন, বিয়ে হওয়া অবধি কখনও কাছ ছাড়া হননি তাই সেই বিশেষ দিনটিতে—যাকগে। বাড়ীর বউঝিরা বেরোলেন আত্মীয়স্বজনের বাড়ী দশমী সারতে—এদিকে তো এলো টেলিগ্রাম। তখন বেলা দশটা হবে। নকাকা সেদিন ভোরেই—দুতিন দিন জ্বর, গায়ে ব্যথা, তারপর···চাপা বসন্ত হ'য়ে নকাকা,···পরে জানা গিয়েছিল।···

মা দুর্গার বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই নখুড়ীমারও বিসর্জন হ'য়ে গিয়েছিল সেদিন—তা নয়ত কি? "স্বামী যার গেল, সেতো জগৎ থেকে উঠে গেল, মরণ হয়না, তাই বেঁচে থাকা", বলতেন মা।

···সেই নখুড়ীমা। যে অতিমূর্খ আবেগে, আদরে, ভালবাসায় নখুড়ীর সঙ্গে 'মা' শব্দটা আপনা আপনি যোজিত হ'ত—আজ তা কোথায় বিলীন হ'য়ে গেছে—প'ড়ে আছে শুধু, সংকোচিত, উচ্ছ্বাসবিহীন সংজ্ঞা শুধু 'নখুড়ী।'

হ্যাঁ, যা বলছিলাম—একটা বিশেষ ভঙ্গীতে "ছিষ্টি নাশ হ'ল"—"ছিষ্টি নাশ হ'ল" ক'রতে ক'রতে নখুড়ীর মুখ আর নাক বেঁকেই গেছে একদিকে—মুখের চামড়ার আর ভুরুর কোঁচ্‌কানি গেড়েছে মৌরসী পাট্টা—"ছুঁচিবেয়ে, খিটখিটে, হাড়জ্বালানি", হ'য়েছে নতুন নামকরণ। স্বাধিকারপ্রাপ্ত কমবয়সী বাড়ীর এখনকার স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েদের কাছে—নখুড়ীর প্রতি সহানুভূতি দেখাবার বা তাঁকে বোঝবার মত মন দেবার সময় নেই তাদের। আগুনের মতন রূপ আর সর্বনেশে বয়সের বালাই দুটোকে দূর করবার দিকে গভীর মনোযোগ ছিল ঠাকুরমার—তাই সেই অধ্যবসায়ের ফলে সেদিনকার নখুড়ীমা আজকের নখুড়ীতে পরিণত হ'য়েছিল। কিন্তু ইদানীং নখুড়ীও উবে যাব যাব—'ছুঁচিবেয়ে, খিটখিটে, হাড়জ্বালানী আবার 'বুড়ী' শব্দটা ও বলতে কেউ কেউ আড়াল আবডাল ছেড়ে প্রায় সর্বসমক্ষেই। মাত্র হয়ত চুয়াল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের নখুড়ীকে—সেই কথাই বলতে যাচ্ছি।

নকাকার রেখে যাওয়া সেই বাচ্চাটি দেখতে দেখতে বড় হ'য়েছে প্রথমে ঠাকুমা ঠাকুর্দার আদরে। তারপর জ্যাঠামশায়ের। আনন্দময়—সত্যি আনন্দের টুকরো একখানি—তাকে দেখলে আনন্দ, তার কথা শুনলে আনন্দ।

বিচার আচারের ঠ্যালা সামলাতে আর পুজো অর্চনার নিয়ম নিষেধ করতে করতে ছেলের তদারকী করবার সময়ই বিশেষ না নখুড়ীর। দেখতেন ছেলেকে সকালের খাবার সময়। স্কুলে যাবার সময় ছেলে এসে দাঁড়াত মার কাছে। খাবার সময়টুকু বসতেন নখুড়ী ছেলের কাছে। টিফিনের সময় টিফিন নিয়ে গেল কিনা চাকরটা সে খবর নিতেন। আবার বিকেলে ছেলে ফিরলে জল খাবার সময় আর রাত্তিরের খাবার সময়—এটা অন্য কারও হাতে ছাড়তে পারতেন না।

রাত্তিরে আনন্দ শুতো ঠাকুর্দার কাছে—তারপর তিনি গত হ'লে আমাদের ঘরেই অর্থাৎ আমি, বড়দা, মেজদা, আর সেজদা শুতাম বড় হল ঘরটায়, এ বাড়ীর নিয়ম অনুযায়ী। বড়দা কোলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে পড়তেন, মেজদা, সেজদা প্রেসিডেন্সীতে, আমি শিবপুরে—কেউ করতাম হেলি প্যাসেঞ্জারী, কেউ বা হোষ্টেলে থেকে, শনিবারে শনিবারে বাড়ী আসতাম। আনন্দ ম্যাট্রিক ক্লাসের ছেলে। সকলের প্রিয় আমাদের।

আমরা ঠাকুরমার নখুড়ীকে আগলানোর নামে অত্যাচার কিছু দেখেছি—বোঝবার বয়সও অনেকদিন হ'য়েছিল—নখুড়ীমার ওপর ভালবাসাও ছিল তখন—নির্জনে একত্রিত হ'লে সেই নখুড়ীমার নির্যাতনের কথা বলাবলি করতাম।

"আচ্ছা, তুই এখন থেকে নখুড়ীমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দে, দেখতো কি ছিলেন আর ক্রমশঃ ক্রমশঃ কি হ'চ্ছেন"—চুপ ক'রে শুনতো আনন্দ—"এরকম উপোস ক'রে ক'রে আর একতলার ভাঁড়ারেতে ঠাকুর ঘরে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে থাকতে আর

কদ্দিন বাঁচবে নখুড়ীমা?" ছলছল্ চোখে তাকিয়ে থাকত' আমু, "তুই বোঝা মাকে, এরকম ক'রে থাকলে দেবতা রুষ্টই হন্ তুই না হ'য়ে।"

আমাদের কাছে না বললেও আমু যে বলত মাকে তা শুনেছি। অন্তের কথা শোনবার লোকের অভাব তো নেই কোন বাড়ীতে। "মা, এত উপোস কর কেন? শরীর একেবারে যে যাবে!"

"ছি, ছি, ও কথা বলতে নেই বাবা, তোমার মঙ্গল চেয়ে, সংসারের মঙ্গল চেয়ে, এসব করতে হয়।" "কে বলেছে তোমায়? ঠাকুমা? সেকেলে লোক লেখাপড়া জান্ত'না। যত আবোল্ তাবোল্—"

"ছি, ছি, বাবা, গুরুজন স্বর্গে গেছেন, তাঁর সম্বন্ধে ও সব কথা কি মুখে আনে?"

"না বই কি। ন্যাখোনা তুমি অত বিচার বিচার কর। তোমার সব ছুঁয়ে দেব একদিন—" সন্ধ্যায় ব্যাকুল হ'য়ে নখুড়ী কত মিনতি করতেন—"ছিষ্টি নাশ হবে বাবা, ছিষ্টি নাশ হবে। ওসব করতে যেওনা, বড় হ'লে বুঝবে তাঁর আত্মার—"আর বলতে পারেন না নখুড়ীমা।

"ওসব ভুল ধারণা। কারও আত্মা থাকলেও সে কি খুশী হবে তোমার এত কষ্ট দেখে? তোমার এ চেহারা দেখলে—"

"এ্যাঁ? কষ্ট দেখে? কিসের কষ্ট? চেহারা?"

কিন্তু কথাটা বলতে পারেন নি নখুড়ীমা।

"সে কি সুখী হবে এত কষ্ট দেখে? খুশী হবে? এই চেহারা"—বার বার বোধ হয় এই কথাই ভেবেছিলেন। মার কাছেই শুনেছি কোন দিন যা করেননি বিধবা হবার পর, সেই কাজ করেছিলেন একদিন দুপুরে নখুড়ীমা। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে এতদিনকার চাকুনা দেওয়া দাঁড়া আয়নাটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখেছিলেন—মা পাশের ঘরের খুলঘুলি দিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন। তারপর বাক্সের ভেতর রাখা নিজের সধবা বেলাকার ছটোটাকে আয়নার পাশে রেখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন—আর তাদের মুখ চোখ ভেসে গিয়েছিল নখুড়ীমার। কিন্তু স্বভাব বদলাতে পারেন নি। সেই একভাবেই কাটিয়েছেন পরেও।

তারপর আমু বি, এস্, সি পাশ ক'রে বিলেত গেছে পাঁচ বছরের ওপর। প্রথমতঃ বড়দারই পেড়াপীড়িতে। মায়ের ঘোরতর আপত্তি আর চোখের জলে প্রবল বাধা পেয়েছিল আমু। মা, চিরদুঃখিনী মা, তাঁকে ছেড়ে কিন্তু তারপর থেকে শুচি বাই বেড়ে গেছে নখুড়ীর—বাইরে কাপড়খানা শুদ্ধ মেলেন না—পাছে কারুর গায়ে ছোঁওয়া যায়, বা কোন কিছু পড়ে কাপড়ের ওপর। সাবানে চর্ব্বি আছে কেমন করে যেন ঢুকেছে মাথায়, যায় ···· কাপড়ে সাবান দেওয়াও বন্ধ।

"ও সুখদা, বাসুনে গঙ্গাজল তুলিয়ে রোদ্দুরে রেখো বাছা এবার থেকে। জল শুকুলে উঠ্‌বে ঘরে—গঙ্গাজল ভুমি ছুঁলে, তারপর সেই তোমার ছোঁওয়া জল আবার আমরা, ছিষ্টি নাশ হ'ল বাবা, ছিষ্টি—"

"তোমার মাথা খারাপ হ'য়েছে নখুড়ী, গঙ্গাজল কি ছোঁওয়া যায়?"

"কি জানি বাছা, কিসে কি হয়। যা বলছি তা কোরো।"

"বাবাঃ, বাবাঃ" বিরক্তি চাপা থাকেনা সুখদার।

"আচ্ছা, মরদার জল দিলে তো এঁটো হ'ল, তাঁড়ারে বলে মাখা—"

"সে কি নখুড়ীমা, ময়দা যে কাঁচা জিনিষ"—বলে বড় বৌদি।

"কি জানি মা, কাঁচা কি পাকা, কলের কাঁধে চড়ায় তো, তাতেই ধর দিয়ে হ'য়ে গেল তাদা। ছত্তিশ জাতের কাও, ছিষ্টি নাশ—"

"আচ্ছা জ্বালাতন তো" না বলে পারে না বড় বৌদি।

"হ্যাঁরে, কাল রাত্তিরে না ঐ কাপড়খানা প'রে শুয়েছিলি? বাসি কাপড়েই চা খাচ্ছিস্ নাকি মালতী? ছিষ্টি নাশ হ'ল দেখ্‌ছি"—কলেজে পড়ে মালতী—রেগে বলে—"আমি খাচ্ছি, আমি খাচ্ছি, তোমার কি নখুড়ীমা?

"ওমা, বাসি কাপড়ে খাওয়া, মুখ ধুয়েছিস্ তো?"

"না ধুইনি যাও, কি করবে?" গজ গজ করে মালতী—নখুড়ীমাও।

"হাঁড়িতে একটু ক'রে গোবর রেখে দিও বড়দি। এঁটোতো শুদ্ধ করতে হবে"—আমার মাকে বলেন।

"তোর কি মাথা খারাপ হ'ল? গোবর বাখুর হাঁড়িতে?" মা একটু বিরক্ত হ'য়েই বলেন।

"মাথা সত্যিই খারাপ হ'য়েছে। জানেন বড়মা, মাথায় গোবর আর গঙ্গাজল দিয়ে চান করে নখুড়ী"—বল্‌ল সুখদা।

"রাম রাম, মরবি নাকি?" মা বলেন।

নখুড়ী ততক্ষণে খুন্তি কড়ার আংটার খাঁজের ভেতর কোথায় এঁটো লেগে আছে তাই বার করতেই ব্যস্ত।

"এই যাঃ, ছিষ্টি নাশ হ'ল, যা ভেবেছি তাই। এইতো কড়ার খাঁজের ভেতর দুধের সর—নাঃ! ছিষ্টি নাশ হ'ল! নাও, নাও সুখদা। ফেলো ছিষ্টির বাসুন পুকুর ঘাটে সব ছোঁওয়া, নেপা একাক্কার হ'ল। আবার মরিগে চান ক'রে। ওমা বড় বৌমা, রান্নাঘরে ঢোকল্ তোর মা, কাক চুকবে। যাই বাপু ডুব দিয়ে আসি। এসে গঙ্গাজল নোব মাথায়, আর কি করব"—ব'লে পায়ে ভিজে মেঝে মেঝে ছোঁওয়া কাপড় কিছু না যায় যাতে তাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর রাখ্‌তে রাখ্‌তে চল্‌লেন নখুড়ী ঘাটে—হিহি ক'রে হেসে উঠ্‌ল কমবয়সী ঝি বউরা, বাড়ীর ঝি সুখদা। মার চোখ শুধু জলে ভ'রে উঠ্‌ল। "হুঁচিবেয়ে, খিট্‌খিটে, চাড় আলানে বুড়ী" বলে সুখদা ঝামটা।

"কি হ'চ্ছে, মালতী? চন্তি দীগ্গির ভাত চাড়িয়েছ?" মা ব'কে উঠ্‌লেন।

"ওর ওপর আমার রাগ যাবে না—কাপড়ে বাড় দিয়ে যাচা কাপড়গুলো ডুবিয়ে রেখে গেলাম বাল্‌তীতে কলেজে—ও ফেলে দিয়ে কাপড়গুলো পুকুরের নোংরা জলে কেচে কেচে ফকা নিকেশ করেছে!"

"কদিনই বা বাঁচবে, যা দশা হ'য়েছে—খাচ্ছনা, দাচ্ছনা, খালি বিচার। বিচার, উপোস, পুজো, নিয়ম, ভিরেশ—কেন যে আন্নু গেল, দিন দিন যেন—আমার মেয়ের বয়সী, তবু মনে হয় যেন আমিই ওরী মেয়ে," মা চোখ মুছে বলেন। "না, আন্নুরা যাবে কেন, ওর মত গোবর গঙ্গাজল নিয়ে থাকবে।" বল্‌ল মালতী।

"এই চুপ্, চুপ্, আস্‌ছে," মা সশব্দে বলেন। ভিজে কাপড়ে, গায়ে জলঝরা অবস্থায় ভিজি মাদুরে মাদুরে আসেন নখুড়ী, "বৌমা, একটু গঙ্গাজল দাও, বাছা, গায়ে ছিটিয়ে, ছিষ্টি নাশ হ'ল, ছিষ্টি নাশ—"বলেন অবিশ্রান্ত ভাবে।

এমনি প্রায় প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে একটা না একটা অশান্তি লেগেই আছে।

বিচার আচারের জ্বালায় সকলে অস্থির, জ্বালাতন, চটে মটে একাক্কার।

কিছুদিন আগে আন্নু মারাত্মক চিঠিটা আমাকেই লিখেছে। মেম বিয়ে করতে বাধ্য হ'য়েছে সে দুঃখের, একটি বাচ্চা ও হ'য়েছে—বড় বিপদগ্রস্ত একটি অসহায় মেয়েকে—বড় লক্ষ্মী কিন্তু—জানিয়েছে এই প্রথম। চিঠি পড়ে আমার মাথায় বজ্রাঘাত তখনি ছুটলাম বড়মার কাছে কোল্‌কাতায়।

"যাক্‌গে একটা। মায়ের ঐ অবস্থা, এ খবর শুনেই তো হার্টফেল করবে, একবার ভাব্‌ল না পর্য্যন্ত"—রেগে অস্থির বড়দা।

"কিন্তু আন্নুর মত ছেলে, বাদা না হ'লে," কাঁচু মাঁচু মুখে বলি।

"একটা চারিত্রিক দৃঢ়তা পর্য্যন্ত নেই—"

"অসহায়, বিপদগ্রস্ত একটি মেয়ে যদি সাহায্য চায়"—

"তবে আর কি, সাহায্য করতে হবে। দয়া করবার আর জায়গা পেলে না। তোর অত মাথা ব্যথা কিসের বাপু, ছিল তার দেশের লোক, আত্মীয়স্বজনও নিশ্চয় কিছু, কিছু—"

"থাক্‌গে ওকথা, যা হ'য়ে গেছে—"

"হ'য়ে গেছে বটে, কিন্তু একবার নখুড়ীর কথা ভাব্‌লে না—একেতো ছিষ্টি নাশ হ'ল, ছিষ্টি নাশ হ'ল করতে করতে জীবনটাই দিতে বসেছে। তার ওপর ছেলে মেম বিয়ে করেছে শুন্‌লে···দুই আচারনিষ্ঠ বিধবার একমাত্র ছেলে, মানুষ হ'য়ে এসে কোথায় মায়ের দুঃখ ঘোচাবি তা নয়—"

"কিন্তু এতে অন্যায়টা কি? মানুষের মনুষ্যত্ব থাকবে না?" থাক্, মনুষ্যত্বের লেকচারটা তোর কাছে অন্ততঃ শুন্‌তে চাইনা—আমার হাতেই মানুষ হ'য়েছিস্ তোরা মনে রাখিস্। আর আর আমিই জোর ক'রে আন্নুকে

বিলেত পাঠিয়েছিলুম, এই আমার আফ্‌সোস—রাগে, দুঃখে গুম্ হ'য়ে রইলেন বড়দা।

"কিন্তু নখুড়ীকে—"

"যখন আসবে, তখন দেখ্‌বে। তার ছেলে, বুঝ্‌বে, আমাদের দরকার নেই কিছু বলবার", বললেন বড়দা।

কিন্তু মাকে খবরটা না দিয়ে পারলাম না। মা "হাং", "হাং" ক'রে উঠ্‌লেন—"এই ছেলে পেটে ধরেছিল, আবাগী। কপালেই যে ঐরকম। নাহ'লে এ দশা হবেই বা কেন? আর ভালই হ'য়েছে, শুন্‌বে আর মরে যাবে—পেটের মেয়ের মতন ভালবাসি, কিন্তু মনে হয় ওর যাওয়াই ভাল। সন্তু (বড়দা) ঠিকই বলেছে, আমাদের কিছু বলে দরকার নেই—ওর ছেলে এসে বুঝ্‌বে। এখন কারুকেই কিছু বলে দরকার নেই।"

কিন্তু মালতী শুনেছিল—নিজের বোন হ'লে কি হবে তবুও বল্‌ছি, কলেজে পড়্‌লেই বা কি হবে এমন স্বভাবের মেয়েকে কেউই ভাল বল্‌বে না। একদিন নখুড়ীর আচার বিচারের খিট্‌খিটানির উত্তরে আত্মবিস্মৃত হ'য়ে বলে বসল—"এই রকম মন হ'লেই এত দুঃখ তোমার কপালে। ঠিক করেছে আমুল, মেম বিয়ে করেছে। মেম বউ এসে ছিষ্টি ঘষ্টিটালে তোমার ছিষ্টি রক্ষে হয় কি ক'রে দেখো—"

"কি, কি বল্‌লি?" বাগবিদ্ধা হরিণীর মত কাতরোক্তি ক'রে বলে উঠলেন, নখুড়ী।

"মেম বিয়ে করেছে গো, ছেলেও হ'য়েছে, মেমন শুচিবাই তোমার—"

"মেম বউ, তার সাহেব ছেলে"—এই শুধু বলেছিলেন নখুড়ী—তারপর অনেকক্ষণ বসে থেকে ঘরে চলে গিয়েছিলেন—খাল্‌নি, ঘাল্‌নি, ওঠেননি তিন চার দিন।

মাতো মালতীর সঙ্গে কথাই বন্ধ ক'রে দিলেন—"হ'লই বা পেটের মেয়ে, শত্তুর," বলে।

তারপর মায়েরই এক নাগাড় লেগে থাকায় নখুড়ী উঠে বসেছেন, খেয়েছেন, নেয়েছেন। কিন্তু যেন বোবা গেছে, কলের পুতুলের মত। "ছিষ্টি নাশ হ'ল", "ছিষ্টি নাশ হ'ল" মুখে আর প্রহর বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে বলা ছাড়া আর কিছুই বলেননি।

.....আমু বাড়ীতে এল যখন নখুড়ী নিজের ঘরে ঢুক্‌লেন—মেঝের চুপ ক'রে কুঁকড়ি সুকুড়ি হ'য়ে বসে রইলেন।—আমুর বউও এসেছে সাড়ী সিঁদুর প'রে—খোকাটিও যেন মোমের পুতুল একটি। মা গিয়ে কত ডাকলেন, "ওঠ্‌ নবৌ, দেখ্‌বি চল্ একবার, নাহয় না ছুলি, এতদিন পরে ছেলে এল, বলিস্ তো এই ঘরেই—" "না, না, না, ছিষ্টিনাশ হবে, ছিষ্টিনাশ হবে", ব'লে উঠ্‌লেন নখুড়ী। কিন্তু আমু পারেনি—মায়ের হুকুম মত ঘরে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর অধৈর্য্য হ'য়ে এসে ঢুকেছে মার ঘরে—

"মা" বলে মার পা জড়িয়ে ধরতেও গেছে—

"না, না", বলে সিঁটিয়ে সরে গেছেন নখুড়ী—

"ছিষ্টি নাশ হবে", "ছিষ্টি নাশ হবে" বিড়্‌বিড়্‌ ক'রে ব'লে। শুন্‌তে না পেলেও ওঁর ঠোঁট কাঁপুনিটুকু দেখ্‌লেই শুকথাই যে বল্‌ছেন তা বুঝ্‌তে পারা আমাদের মুখস্ত হ'য়ে গেছে।

অপ্রস্তুত ঘরে আমু কি করবে ভাব্‌ছে এমন সময় মা নিয়ে ঢুকলেন আমুর বউ আর ছেলেকে—কোল থেকে নামিয়ে দিতেই খোকা সমাসর গুই গুই ক'রে টল্‌তে টল্‌তে চল্‌ল নখুড়ীর দিকে—হয়ত সবলে দাঁড়িয়ে আছে, একমাত্র নখুড়ীই বসে আছেন দেখে তাঁকেই নাগালের মধ্যে ব'লে ভেবেছে খোকন্—শঙ্কিত হয়ে উঠ্‌ছি আমরা সবাই—এই, ছুঁলে, ছুলে নখুড়ীকে—শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে, "ছিষ্টিনাশ হ'ল ছিষ্টিনাশ হ'ল" বল্‌তে গিয়েই খোকার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন নখুড়ী—কি ছিল সেই মুখে কে জানে কিন্তু দুই বাহু দিয়ে বড় জোরে পারেন খোকনকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে, "ছিষ্টিধর আমার, বংশধর", বলে হাউ হাউ ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন নখুড়ী।

নবতীর্থ

শ্রীমতী আশা গংগোপাধ্যায়

সকাল বেলাতে পুব দিকের জানলাটা খুলে দিতেই সোনালী এক ঝলক রোদ এসে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল।

সেই সংগে ভেসে এল বহুলোকের কণ্ঠস্বর, জিনিষপত্রের টানাটানির শব্দ, নদীর তীক্ষ্ণ হর্ণ।

জানলা ছেড়ে তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এল শর্মিলা। ও! পাশের খালি বাড়ীটায় আজ এতদিন পরে ভাড়াটে এল। দুটি সুন্দর পরিচ্ছন্ন মেয়ে ছুটোছুটি কোরে বেড়াচ্ছে এঘর-ওঘর। বড়টির বয়স বছর বারো-তেরো হবে; ছোটটার বোধকরি পাঁচ-ছয় বছর।

ঝকঝকে পোষাক পরে যে ভদ্রলোক বাইরে দাঁড়িয়ে নদীর মালপত্র নামাচ্ছেন তিনি বুঝি এদের বাবা। একটি প্রকাণ্ড গাড়ী এসে দাঁড়াল।

গাড়ী থেকে নামলেন যে মহিলাটি তার বয়েসটা শর্মিলা ঠিক ধরতে পারল না। মুখশ্রী কমনীয়, দোহারা গঠন, দেখে মনে হয় ত্রিশ-বত্রিশ হবে।

ছোট মেয়েটি ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল—

"মা, কী সুন্দর ফুলের বাগান, মা, বাড়ীর ভিতরের উঠানে। বাবা, দেখবে চল।"

মা-বাবার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ভিতরের বাড়ীতে।

একটা বুকফাটা দীর্ঘশ্বাস চেপে ঘরের ভিতরে কয় শিশুপুত্রের শিয়রে ফিরে এল শর্মিলা।

সারারাত ছটফট কোরে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে। স্বামী সত্যকিংকর গেছে ডাক্তারের কাছে। ঘরের এক-পাশে মেঝেতে বিছানায় শুয়ে আছে পাশাপাশি তিনটি সন্তান। তিনটিই কন্যা। বয়স তাদের যথাক্রমে পাঁচ, চার ও দুই। কোলের ছয় শিশুপুত্রটির বয়স এই সবে দশ মাস। সকলেই দুর্বল ও জীবনী-শক্তিহীন। বেশী ছুটো-ছুটি কোরে খেলা কোরলে বড়মেয়ে চিনুর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায়।

দ্বিতীয়টির দুই পা আর একটি হাতের গঠনের অস্বাভাবিকতার দরুণ বেশীর ভাগ সময়েই এক জায়গাতেই বসে থাকে, নাকি সুরে চেঁচায়, আনন্দ হলে পা-টাকে ঘসে ঘসে ছোট্ট স্বাভাবিক হাতটিকে আশ্রয় কোরে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে চেষ্টা করে।

তৃতীয়টির বয়স যদিও দুই বছর, তবু এখনও হাঁটতেই শিখল না। মেজ মেয়ে বিনুর মত এ আবার খুঁড়িয়ে চলবে কিনা কে জানে?

শর্মিলা আর ভাবতে পারে না। তার নিজেরই শারীরিক অবস্থা এত খারাপ যে যা হয়ে এই অসহায় নিজীব সন্তানদের ভাল কোরে যত্ন কোরতে পারে না পর্যন্ত। এই টানাটানির সংসার; তাতে আবার আরও একটি আসছে —ভাবতে শিউরে উঠল। নিজের সমস্ত অংগ-প্রত্যংগে যেন কি এক বিশ্রী প্রতিক্রিয়া সুরু হয়ে গেল।

বড়বাজারে একটি কাপড়ের দোকানে কাজ করে সত্যকিংকর। বেতন তার একশ' পঁচিশ।

যখন বিবাহ হয়ে তখন এই আয় নিয়েই নবদম্পতী কী খুশী। মাথার উপরে ছিলেন পিতা-মাতা—পর্বতের অন্তরালে থেকে অবিশ্রান্ত গুঞ্জন কোরে কাটিয়ে দিয়েছিল বছর চারেক।

তারপর এল দুঃসময়।

বাবা মা গত হলেন ক্রমে—ততদিনে প্রথমা কন্যা চিনু এসে গেছে। পরের বৎসর এল বিনু—পা দুটি সরু সরু—মাথাটি বেড়ে উঠল, কিন্তু নিম্নাংগ হয়ে রইল শক্তিহীন। ভাল কোরে দাঁড়াতেই পারল না। একে বাংলাদেশের মেয়ে—তাতে রূপহীনা পংগু। কী যে হবে ভেবেই পায় না শর্মিলা বা সত্যকিংকর। দুবছর কাটতে না কাটতে পর পর এল তিনু আর গোপাল। শিউলীগাছের বাচ্চার মত যেন ঝিন্‌ঝিন্ কোরছে।

সংসারে লোক বেড়ে যাওয়ার সংগে সংগে সকাল

বিকেল দুই বেলা ছেলে পড়িয়ে উপরি রোজগার কোরং হয় সত্যকিংকরকে।

ভাগ্নে ভালভাবে এম-এ, টা পাশ কোরেছিল—পুঁথিগত বিদ্যা ভাঙিয়ে তবু সংসারের ভাঙনকে কিছুটা ঠেকিয়ে রাখতে পেরেছে।

মোটের উপর একশ-আশি টাকা আয়ে এতগুলি অক্ষিষ্ণু প্রাণীকে সভ্যভব্য সবল কোরে তুলতে যে রসদের যোগাড় চাই, সেটা শর্মিলাকেই মাথা ঠিক কোরে যুগিয়ে যেতে হয়—নিজেকে বঞ্চিত রেখে—তিলে তিলে নিঃশেষ কোরে।

পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সন্তানধারণের ক্ষমতাও ওর আর নেই। তার উপর আবার একটা আসছে মাস চারেক পরেই। আচ্ছা, এর কি কোনও সমাধানই নেই?

ভগবান গরীবের সংসার পেয়েই যত উপদ্রব কোরেছেন—বিধাতার উপর নিরুপায় হয়ে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে শর্মিলা। মাঝে মাঝে স্বামীকেও দু'কথা শোনাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু তখনি নিজেকে সামলে নেয়—সত্যি, অপরাধ ত একা সত্যকিংকরের নয়। সত্যিকারের বিচার কোরতে গেলে তার নিজেরও মাথা পেতে শাস্তি গ্রহণ করতে হবে।

অভাবের জ্বালায় জলে জলে ওর সমস্ত লাবণ্য ছাই হতে চলেছে। এক সময়ে ছিল ওর সৌন্দর্যের খ্যাতি। এখন সে সোনার বরণ নেই—সে কমনীয়তা নেই। চোখের কুলে গেছে—চক্ষু হয়েছে কোটরাগত। যৌবন ওর অস্তমিতপ্রায়। অথচ কীই বা বয়স! —আচ্ছা! ভগবান ত ওকে টেনে নিলেই পারেন—তাহলেই সব সমস্যার সমাধান হয়। নিজের মৃত্যুর কথা ভাবতেই শীর্ণ বুকখানার মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। আহা—অসহায় দুর্বল সন্তানগুলির কি গতি হবে। স্বামী ত রোজগারের ধান্ধায় পাগল হয়ে বাইরে ঘোরে—কে ধরবে এই হাবুডুবু সংসারের হাল? না—মরা তার চলবে না—শান্তি সেখানে নেই শর্মিলার। হবে—তবে কী উপায় আছে—কী করা যেতে পারে? একলা নারী সে, কী মন্ত্রে শান্ত ক'রতে পারে এই দুনিবার দুর্ভিক্ষের বিশ্বগ্রাসী তাণ্ডব?

* * * * *

এইভাবে ভুগে ভুগে কোলের কচি শিশুটি পেরিয়ে যাওয়া প্রায় এক মাস হল। শোকের ধাক্কা সামলে নিতে না নিতে শর্মিলা শয্যা নিয়েছে। সিঁড়ি থেকে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে—সর্বস্ব সন্তান পেয়েছে আঘাত। একটানা তিনদিন অজ্ঞান অবস্থায় থেকে শেষ পর্যন্ত প্রসব কোরেছে অসময়ের একটি মৃত শিশু।

এখন সে আরোগ্যের পথে। এই দুদিনে সে দেখা পেয়েছে একটি সত্যিকারের দরদী বন্ধুর—পাশের বাড়ীর নতুন প্রতিবেশিনী আরতিদির।

আচারে-ব্যবহারে চেহারার অভাবে অতুলনীয় মনে হয় শর্মিলার। আর সকল বিষয়ে কি যে গভীর জ্ঞান। কত কঠিন কথাই যে জলের মত বুঝিয়ে দেন আরতিদি। শর্মিলা অবাক হয়ে চেয়ে থাকে মুখের দিকে।

রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে শর্মিলার জানা হয়ে গেছে এই তীব্র অভাবের মূল কোথায়, দেখা হয়ে গেছে পরিবার-নিয়ন্ত্রণের স্বাস্থ্যকর সহজ উপায়গুলি। এমন কি এই স্নেহময়ী দিদির আদেশে সত্যকিংকরকে শুদ্ধ যেতে হয়েছে—পাঠ নিতে হয়েছে মিঃ মজুমদারের কাছে—আরতিদির স্বামী। অত্যন্ত দূরদর্শী ও পরোপকারী।

সন্তানবৃদ্ধি যে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের পক্ষে কী নিদারুণ অভিশাপ তিনি তা প্রাঞ্জলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন সত্যকিংকরকে। সঙ্গে সঙ্গে দীক্ষা দিয়েছেন সেই যৌন-যন্ত্রে—যে যন্ত্রের স্পর্শে সে তার বাকী মৃতবৎস সন্তান তিনটি ও স্বাস্থ্যহীনা সংসারিনীকে অমৃতসুখের পথে নিয়ে যেতে পারে।

আশ্চর্য—এই সহজ চিকিৎসা—যা নাকি নিজেদের হাতের মুঠোয়!—সেটা প্রয়োগের কথা তাদের দু'জনের একজনও কোনও দিনও ভেবে দেখেনি। আর সময়ই বা ছিল কোথায়? তিন চারটি কচি শিশুর পরিচর্যা এবং নিজের ক্ষীণ দেহটিকে সংসারের ঘানিতে টেনে টেনে নিয়ে যাওয়া—এ ছাড়া আর কী বা করবার ছিল। সংবাদপত্র পাঠ, আলাপ-আলোচনা, বেতার বার্তা শোনা বা ছবি দেখা—কোনটারই কোনওদিন সময় হয়নি—ইচ্ছাও হয়নি।

আর স্বামী ছিল যেন ইক্ষুদণ্ড—রোজগারের যন্ত্রে পিষে পিষে দিবারাত্র তার জীবনরস নিংড়ে নিঃশেষ কোরে নেওয়া হচ্ছিল—অন্য দিকে তাকাবার, অন্য কথা ভাববার সময় কোথায় ছিল?

হঠাৎ যেন দেবতার দানের মত পাশের বাড়ীতে এল এই সুখী পরিবার—তাদের ছিন্ন শুষ্ক মরুজীবনকে সবুজ উদ্যানে রূপান্তরিত কোরে দিল।

• • • • •

সুদীর্ঘ বাষো বছর কেটে গেছে। ভোরের আকাশে সিন্দুরমাখা রক্তরাগ। সুখ দিকের জানলায় এসে দাঁড়াল শমিলা।

তাই ত! খালি বাড়ীটায় বুঝি লোক এসে গেছে। সামনে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড লরী মালপত্র বোঝাই।

"মা, আমি যাচ্ছি।"

চিনু এসে সামনে দাঁড়াল। সুন্দর মিষ্টি চেহারা। কাঁধের দুই পাশে বিনুনিত বেণী—বি, এ, পড়ে। সকালেই তার কলেজ।

"মা বাবাকে বোলো, কালকের পিকনিকের যেন ব্যবস্থা করে। আর বিনুকে বোলো তার স্কুলের সেই গাইয়ে বন্ধুকে যেন নিমন্ত্রণ কোরে আসে কাল যাবার জন্য আমাদের সঙ্গে। আমি কলেজ থেকে একটু ঘোরার ঘুরে আসব—আমার দেরী হবে আসতে।"

হরদা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল চিনু ট্রামরাস্তার দিকে।

সুন্দর স্বাস্থ্যবতী অস্ফুটযৌবনা মেয়ের গতিভঙ্গীর দিকে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ চোখ থেকে জল ঝড়ে পড়ল শমিলার।

ঘরের ভিতর ঝকঝকে দুটি পালংক। একটিতে শুয়ে আছেন স্বামী, অপরটিতে বিনু আর তিনু। বহুদিন হাসপাতালে থেকে ইলেক্‌ট্রিক চিকিৎসা কোরে বিনুর শারীরিক অক্ষমতাকে দূর কোরে তোলা হয়েছে। তবে একেবারে স্বাভাবিক হবে না ডাক্তাররা বলেন।

স্বামীর নিশ্চিন্ত অধরে শান্তির মৃদুহাসি। এখন আর সংসারে কোনও অভাব—কোনও অনটন নেই। সত্যকিংকর নিজে খুলেছে কাপড়ের দোকান—বেচেছে লোক।

তিনটি কিশোরী কন্যা, স্বাস্থ্যবতী জীবন-সংগিনী নিয়ে তার ক্ষুদ্র পরিমিত সংসার।

শমিলার আর সন্তান হয়নি।

আঁচলে চোখ মুছে জানলার বাইরে দৃষ্টি মেলল। পাশের বাড়ী নতুন লোক আসছে। নিজেরই অজ্ঞাতে শমিলা দুটি কর যুক্ত কোরে ওর ওই নবতীর্থের উদ্দেশে প্রণাম জানাল।

• বেতারে পঠিত।

প্রেমের পরিণতি

শ্রীমতী অমুজবালা দেবী

মেয়ের বিয়ের পর হরবিলাস গাঙ্গুলি যেন একটা সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তাঁকে বেশ প্রফুল্ল দেখা গেল। বললেন—এবার মাথা থেকে মস্ত বড় ভাবনার বোঝা নেমে গেল, ছেলেটা মানুষ হয়ে কিছু রোজগার করতে শিখলেই—ব্যস্—

ভদ্রলোক বিলাতী মহাযুদ্ধের সময়ে পাঁচশো টাকার পেরেক ঘরে কেমন করে পঞ্চাশ হাজার টাকা করলেন, সে কথা হয়তো অনেকেরই মনে গেল কিন্তু মাকেটি কোম্পানীর অফিসে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে যেদিন বাড়ী এলেন, সেদিন পাড়ায় বেশ একটা সোরগোল পড়ে গেল। সবারই মুখে ঐ এক কথা—কিসে ব্যাপার কি?

কিছু টাকা ব্যবসায়ে খাটিয়ে অধিকাংশ টাকার সোনা খরিদ করে ঘরে মজুত করে রাখলেন। বললেন—'সোনার মার নেই'—হাঁ। হিসেবী লোক বটে।

বিশ্বযুদ্ধ তখনও চলছে। কন্‌ট্রাকটারের কাজে ঘুরে ঘুরে তার সোনা হোতে লাগল। প্রায়ই বলতে শোনা যেতো—'পানামাড়ই আমার ভাগ্যলক্ষ্মীর রত্নগড়'—

হবে ও বা।.....

সামান্য কেরাণী জীবনের দারিদ্রপূর্ণ অধ্যায়ের সমাপ্তি রেখা টেনে দিয়ে অদৃষ্ট দেবতা ওর জন্যে রচনা করলেন নূতন অধ্যায়—নূতন সোনার সংসার। ছোটৈশ্বর্য্য

আর বিলাসিতার স্রোতে অবগাহন করে ইনি পার্থিব যাত্রা পথের পাথেয়ের দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হোলেন—আভিজাত্যিক দৈনন্দিন জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দগতিতে চল্‌তে লাগ্‌লো। এর পর এলো পঞ্চাশের মন্বন্তর, এলো দুর্ভোগের দিন—মুদ্রাস্ফীতির আতিশয্য এই সময় থেকেই ভারতের ললাটে কলঙ্ক তিলক পরিয়ে দিল—বহু ব্যাঙ ফেঁপে উঠ্‌লো। পুঁজিবাদীদের পুঁজির মাত্রাধিক্য মধ্যবিত্ত সমাজ রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। বিভক্ত বাংলায় এলো বহু বিপর্য্যয়। সমাজের উঁচুতলার লোক নীচে নাম্‌লো। কিন্তু সংখ্যাতীন সুস্থজীবন হরবিলাসের পরিবার বহাল তবিয়তেই রইলো। তার কারণ অর্থের অনটন নেই।

এই সুন্দর পটভূমিকার ওপর গড়ে ওঠা সংসারে এলো হঠাৎ ঝড়—এর আঘাতে সদ্য কন্যাদায় মুক্ত হরবিলাসবাবু কাতর হয়ে পড়্‌লেন। তার ধৃষ্টতার সম্বন্ধে অন্য কেউ তাবিক করুক আর না করুক, ওঁর স্ত্রী কিরণময়ী এ যাবৎ করে এসেছেন, কিন্তু মেয়ের বিয়ের পর যে ঘটনার পরিস্থিতি তাদের কাছে কঠিন ও কঠোর হয়ে উঠেছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে কিরণময়ী স্বামীকে ধিক্কৃত করে প্রায়ই বলেন—'মেয়ের রক্ষা তুমিই তো মেলে'। স্ত্রীর অভিযোগ হচ্ছে মেয়ে যখন এ বিয়ের ব্যাপারে প্রথমেই আপত্তির সুর তুলেছিল, তখন ঐ পাত্রের সঙ্গে ওর বিয়ে জোর করে দেওয়াটা মোটেই উচিত হয়নি। কিন্তু এ অভিযোগ নাকচ করবার পশ্চাতে যুক্তি দেখিয়ে হরবিলাসবাবুকে বল্‌তে শোনা যেতো—'আমি ওর বাপ, ওর ভালোমন্দটা কে বোঝা?' আগেকার দিনে অভিভাবকরা যা করতেন বা বল্‌তেন, ছেলেমেয়েরা নির্দ্বিধায় তাই মেনে নিত—এখন সবাই যুক্তি কিন্তু প্রত্যুত্তরে বল্‌লেন—'সে সব দিন চলে গেছে—যুগের হাওয়া যেমন বইবে তেমিভাবে চল্‌তে হবে—এই ভুল করে আজ নিজে মর্‌লে, আমাকে মার্‌লে—বিয়ের পর স্বামীর ঘর করতে গিয়ে শান্তি দু'দিনও তো সেখানে থাকবে?—তা নয় সোজা চলে এসে বলে কিনা স্বামীর ঘর কর্‌বো না?—এখনও গায়ে বিয়ের গন্ধ রয়েছে—

হরবিলাস বাবু কিরণময়ীর কথায় চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে পড়্‌লেন, বিশেষ কিছু বল্‌লেন না। বাপের বাড়ী চলে এসেই শান্তি দুদিনের জন্যেও মায়ের কাছে থাক্‌লো না, ইউনিভার্সিটি হোষ্টেলে গিয়ে উঠলো, এতে কিরণময়ী অন্তরে অত্যন্ত আঘাত পেলেন। যারে যারেই বল্‌লেন—'দুদিন আমার কাছে থেকে যা শান্তি!—ও মায়ের কথা শুন্‌লো না। বিবাগমনের আনুষ্ঠানিক পর্ব্ব সমাধা করার ইচ্ছা ছিল, তার ব্যতিক্রম ঘটে গেল মেয়ের শ্বশুরবাড়ী থেকে শান্তির একাই চলে আসতে আর অশান্তি সৃষ্টি করাতে। যাওড়ীর ভাগ্নে জামাই নিয়ে আমোদ আহ্লাদ কর্‌বার আশা অন্তর্হিত হয়ে গেল।

কিরণময়ী তাকে অনেক বুঝিয়ে বলেছিলেন আবার শ্বশুর বাড়ীতে ফিরে যেতে, এমন কি হরবিলাস বাবুও প্রস্তুত হয়েছিলেন মেয়েকে গাড়ী করে পৌঁছে দিতে। সে বেঁকে দাঁড়িয়ে বল্‌লে—'ওরকম স্বামীর সঙ্গে ঘর করা চলেনা—যে ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি, সে আমার আর্টের মর্য্যাদা দিতে পারে না—না পড়েছে সেক্‌সপিয়র মিলটন, না পড়েছে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র—একটা গিধোড়—যারে যারে বলেছিলাম, ছেলে অলে মিশ যাবনা—এরকম একটা ইডিয়টের সঙ্গে ঘর করা আমার পোষাবে না—তবু শুন্‌লে না তোমরা'—

হরবিলাসবাবু এর উত্তরে তার ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে বল্‌লেন—এখন যন্ত্রের যুগ, বিদ্যুতের পরিচালনার ওপর নির্ভর কর্‌ছে আমাদের অনেক শিল্প. রমাপ্রসন্ন মিস্ত্রি হোতে পারে কিন্তু পায় হাজার টাকা মাইনে। সাহিত্য-কলার রসে রসালো হয়ে যারা এম, এ পাস করে বেরোন, তাঁদের অনেককেই সামান্য কেরাণীগিরি কাজ জোগাড় করতে চোখে সরষের ফুল দেখতে হয়—'সে খবর রাখো কি? বাবার আর কদ্দিন করে সদ্য সদ্য বুলি ঝাড়তে পারা যায়—বাবা সরে দাঁড়ালে এ সব বুলি আর বেরোয় না—বুঝ্‌লে—'

—তা হোক, তবু তারা রসিক, সংস্কৃতের ধারক ও বাহক, সভ্যতার অগ্রদূত—একটা সুন্দর রোমান্টিক কবিতার মূল্য গোটা বার্ণপুরের কলকারখানা বিক্রী করেও পাওয়া যায় না'—

—পেটে দানা না পড়্‌লে এসব ভেঁপোমি ঘুরে চলে যায় চোখের জলে—বুঝ্‌লি শান্তি! তোর পরকালটা

আমিই খেয়েছি—ভেবেছিলাম লেখাপড়া শিখে মানুষ হবি—এখন দেখ্‌ছি—

হরবিলাস বাবুর কথা সমাপ্ত হবার আগেই শান্তি ঘর থেকে দ্রুত প্রস্থান করলো। তারপর নিজেই একটা ট্যাক্সি ডেকে ইউনিভার্সিটি হোষ্টেলে চলে গেল। গাঙ্গুলি পরিবারের মানসিক সুখশান্তিও ঘুরে চলে গেল।

হরবিলাসবাবুকে কিরণ্ময়ী বল্‌লেন—'মেয়েকে আটকাতে পার্‌লেনা ?'—

—'ও তো আর কচি খুকি নয়—'

এই কথাটা বলে কণকাল চুপ করে থেকে উনি দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌লেন। স্ত্রীর সুন্দর মুখখানির দিকে দৃষ্টি দিয়ে কি যেন ভাব্‌লেন, তারপর বল্‌লেন—'যার প্রতীকার করা যায় না, তা সহ্য কর্‌তে হবে বৈকি ?'—

—'মেয়েকে নিজেদের কাছে রেখে দেওয়া উচিত ছিল, হোষ্টেলে রেখেই আরও সর্ব্বনাশ ঘটিয়েছ'—

—বাবিনি পাছে পড়াশুনার ব্যাঘাত ঘটে, ইংরাজীতে ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স পেয়ে বি-এ পাশ করার আমার উৎসাহ বেড়ে গেছে—বরাবর হোষ্টেলে রেখেছিলাম বলেই তো ও একটানা সবগুলি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হয়েছে—

—'কিন্তু ওর নতুন সামাজিক জীবনে যে কৃতিত্ব আশা করা গিয়েছিল, তা সমূলে নষ্ট হয়ে গেল—ফুল ফোটার আগেই যদি কুঁড়ি শুকিয়ে যায়—

—'তা বটে—'

হরবিলাস বাবু ঐ কথাটি অন্যমনস্কভাবেই বল্‌লেন। তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি বল্‌লেন—'শান্তির মনের কোথাও হয়তো কাটুল ধরেছে—বেশ বুঝতে পার্‌ছি আমাদের এ লাহনায় এক নতুন অভিজ্ঞতা অর্জ্জন—এক নতুন অবস্থা সঙ্কটের মধ্যে মানসিক বিপর্য্যয়ের সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌তে হবে—

কিরণ্ময়ী স্বামীর কথাগুলি শুনে বল্‌লেন—'চুপ করে থাক্‌লে হবে না। মেয়ের সঙ্গে হোষ্টেলে একবার দেখা করে এলো, বুঝিয়ে সুঝিয়ে যদি কোনরকমে রমাপ্রসন্নের সঙ্গে মু'হাত করে দিতে পারো—পাঁচের কড়ি দিয়ে ভুবে পায় হওয়া কি ভালো ?—

স্ত্রীর কথাগুলি হরবিলাস বাবুকে বেশ ভাবিয়ে তুল্‌লো।.....

কিরণ্ময়ী বল্‌তে থাকেন—লোক সমাজে মুখ দেখাই কি করে বলো তো ?—বিদ্যের গর্ব্বে রূপের গর্ব্বে, বাপের পয়সার গর্ব্বে শান্তি ধরাকে সরা জ্ঞান কর্‌ছে—ইংলিশে এম-এ পড়্‌তে পড়্‌তে কতই না স্বপ্ন দেখ্‌ছে—ভাব্‌ছে না ভবিষ্যতের কথা—

হরবিলাস বাবু সিগারেটের একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে ঘাড় বেঁকিয়ে বল্‌লেন—'ওর আবার ভবিষ্যতের ভাবনা কিসের ? বরাবরই লেখাপড়ায় খুব ভালো—কোন কলেজের অধ্যাপিকা হয়ে গেলেই ব্যস্, ও নিশ্চিন্ত। কথায় বাধা দিয়ে কিরণ্ময়ী বল্‌লেন—'বেশতো, পয়সা খরচ করে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়ার কি দরকার ছিল, জানোতো, পাত্র রূপে গুণে বিদ্যায় ওর সমতুল্য তো নয়,—ধনকুবের হোতে পারে কিন্তু ওর মত বিদুষী মেয়ের মনের মানুষ যে রমাপ্রসন্ন হোতে পারে না, এটা কোন্ বোকায় না বোঝে ?—

—'বিধিলিপি কে খণ্ডাবে বলো ?'—

'—মনের প্রবোধ দেবার সময়ে আমরা যখন হেরে যুরোপিই, তখনই বলি বিধিলিপি, অদৃষ্টের খেলা, নিয়তির ইঙ্গিত, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল এইরকম আবোল তাবোল কথা কিন্তু আজ্‌কের যুগের বিজ্ঞান সম্মত মনের সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ এ সব কথা মান্‌তে চায়না'—

ক্রিং-ক্রিং-ক্রিং আওয়াজ হোতেই হরবিলাসবাবু টেলিফোনের রিসিভারটী কানে দিয়ে বল্‌লেন—

'—হ্যালো—নমস্কার—কি খবর বেয়াইমশাই,—'

কিরণ্ময়ী উৎসুক নেত্রে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। টেলিফোনের রিসিভার ভেদ করে বৈবাহিক মহাশয়ের গুরুগম্ভীর উচ্চকণ্ঠের ধ্বনি বেরিয়ে আস্‌ছিল। কিরণ্ময়ীর লাবণ্যমণ্ডিত গোলাপী মুখখানি ম্লান হয়ে এলো। তিনি বেশ বুঝতে পার্‌লেন মনের ঝড় এদিকে বেগে বয়ে আস্‌ছে।

টেলিফোনের ভেতর দিয়ে মু'চার বার হাঁ হাঁ হাঁ—হ্যালো এইরকম শব্দ করে শেষে হরবিলাসবাবু উত্তেজিত হয়ে বল্‌লেন—'দেখুন বেয়াইমশাই! আমার মেয়েকে জোর করে আপনার ঘরে তুলে দিয়ে আসিনি—আমার মেয়ে যদি আপনার ছেলেকে ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি বলেই থাকে তা অবশ্য খুব গর্হিত কাজ হয়েছে—এর ওপর কি আমাদের

হাত আছে? আপনার ছেলে ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার, বৃত্তি হিসেবে সে ভালোই নিয়েছে, আমিও তো আমার ছেলে রথীনকে এই টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার জন্যে বার্মিংহামে পাঠিয়েছি—আপনি একজন বিজিনেস ম্যাগনেট, আপনার মত আমার অর্থকৌলিন্য নেই—আমার মেয়েকে আপনি একরকম জোর করেই নিয়েছেন, যৌতুক হিসেবে কিছুই দাবী-দাওয়া করেননি—আপনি মহাশয়, মেয়ে সাধারণিকা, তাকে কেমন করে আয়ত্তে আনবো বলুন?—আইনের আশ্রয়েও পারা যাবে না—'

একথার পর কেদারনাথবাবু এমন সব কথা বলতে লাগলেন যেগুলি আদৌ শ্রীতিপ্রদ নয়, ফলে ফোনে উভয় বৈবাহিকের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ চললো বেশ কিছুক্ষণ। শেষে হরবিলাসবাবু তীব্রকণ্ঠস্বরে বললেন—'মশায়! মেয়েকে বুঝিয়েছি অনেক, ও যাবে না আপনাদের এলগিন রোডের বাড়ীতে—ও ইদানীং বিদুষী হবার তপ করেছে, এরপর যা ভালো বোঝেন তা করুন—'

ফোন ছেড়ে দিয়ে রিসিভারটী যথাস্থানে রেখে হরবিলাস বাবু কিংশুকীকে বললেন—

'—তুমি যেটি আমাকে বোঝাতে চাইছ, উনিও ঠিক তেমনিই করছেন—আমি তো মহাসমস্যায় পড়ে গেছি—'

কিংশুকী বললেন—'মেয়েকে ফোনে ডেকে আবার ভালো বুঝিয়ে—চেষ্টার ত্রুটী করা হবে না, তারপর আমাদের ভাগ্য—'

সন্ধ্যার পর হরবিলাসবাবু ফোন করলেন। উত্তর এলো—'এখনও শান্তি ফিরে আসেনি—'

বারে বারে ফোনে ডেকেও শান্তির সাড়া পাওয়া গেল না। শেষে আন্দাজ আটটার সময়ে তাকে ফোনে পাওয়া গেল। হরবিলাসবাবু মেয়েকে বললেন—'তোমার শ্বশুর তোমাকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন—ফোন করছিলেন—কবে যাবে?—'

এর উত্তরে শান্তির কাছ থেকে যে সব কথা তার কানে এলো সেগুলি আদৌ সুখপ্রদ নয়। উপসংহারে ও বললে—'কেন অশান্তির সৃষ্টি করছ বাবা? তোমরা কি আমাকে লেখাপড়া শিখে মানুষ হতে দেবে না?—'

হরবিলাসবাবু গম্ভীরস্বরে ফোনে বললেন—'লেখাপড়া শেখা এক, আর মানুষ হওয়া আর এক—দুঃখ এই যে, লেখাপড়া শিখে শিক্ষিতা হোলে বটে, কিন্তু মানুষ হোলে না—'

এ কথার পর বোধহয় শান্তি টেলিফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল, তাই তিনি একাধিকবার ওকে ডেকেও সাড়া পেলেন না। তাঁর মুখখানি আষাঢ় সন্ধ্যার মেঘাচ্ছন্ন বৃষ্টিভরে আকাশের মত হয়ে রইলো।

মেয়ে বাড়ীতে আসতে চায় না, স্বামীর ঘর করতে প্রস্তুত নয় অথচ হোষ্টেলে থেকে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছে, এর কারণ কি? স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এই প্রশ্ন জটিলতম সমস্যায় রূপায়িত হোলো। তাই কয়েকদিন নানাপ্রকার চিন্তা ও আলোচনার পর হরবিলাসবাবু ইউনিভার্সিটির দিকে অগ্রসর হোলেন।

তখন সবেমাত্র ছুটি হয়েছে। ইউনিভার্সিটি কলেজ থেকে ছেলেমেয়েরা বেরিয়ে আসছে। হরবিলাসবাবু দ্বার-ভাঙ্গা বিল্ডিংএর কাছে এসে দেখলেন শান্তি একটি যুবকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলবার জন্যে দ্রুতপদে প্রাঙ্গণের এক কোণে চলে গেল। পরস্পরের দৃষ্টি বিনিময়ে এক ঝলক হাসি ফুটে উঠলো। তাঁর পক্ষে বুঝতে বিলম্ব হোলো না কোথায় ব্যাধি আত্মগোপন করে আছে।

কিংশুকীর কথাটা মনে পড়ে গেল—সত্যি তো! ওর কোন প্রণয়ী আছে কিনা তা তো কোন দিনই সন্ধান করা হয়নি?—

যা হোক, তিনি লক্ষ্য করলেন ওরা একটা বেঞ্চিতে বসে গল্প গুজব শুরু করলো। দুজনেরই মধ্যে অফুরন্ত রূপ-যৌবন, ওদের নর্শবিলাসের কিছু কিছু প্রকাশভঙ্গিমা তাঁর চোখের ওপর ভেসে উঠলো। মনে হোলো ক্রমেই শান্তির চক্ষুলজ্জার আবরণ ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে আসছে—ওরা আলিঙ্গনের দিকে দুজনেই ঝুঁকছে।

কিছুক্ষণ পরে ওরা দুজনে উঠলো, তারপর শান্তি যুবকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো।

মোটরের দরজা খুলে যুবকটী ওকে পাশে বসিয়ে নিয়ে মোটর ড্রাইভ করে চলে গেল দক্ষিণ দিকে।

ওদের অলক্ষ্যে হরবিলাসবাবু সব লক্ষ্য করে মোটরের নম্বরটী নিজের নোট বুকে টুকে নিয়ে বাড়ী এলেন।

কিরণ্ময়ী ব্যস্ত হয়ে মেয়ের সম্বন্ধে আরও কিছু উৎসুক্য প্রকাশ করাতে তিনি বল্লেন—

'—তোমার কথাই ঠিক, এতদিন পাত্রিকে ভুল বুঝে এসেছি—'

কিরণ্ময়ী বল্লেন—'কি রকম ?'

হরবিলাসবাবু যা দেখেছেন সবই বল্লেন। কিরণ্ময়ী বল্লেন—'আমি ওর মা, ওকে আমার চেয়ে বেশী কেউ জান্তে পারে না, ওর নাড়ী টিপে আমি বলে দিচ্ছি—যা হোক্ এ রোগের কোন ওষুধ নেই, যা ভাগ্যে আছে তাই হবে—'

যা হোক, দুচার দিনের মধ্যেই রহস্য গেল।.....

হরবিলাসের বন্ধু কলিকাতা পুলিসের এসিষ্টাণ্ট কমিশনার মিষ্টার সান্যাল তাঁকে জানিয়ে দিলেন যে, ঐ মোটরখানি একজন ব্যারিষ্টারের—নাম করুণাময় চ্যাটার্জ্জি থাকেন ভিক্টোরিয়া টেরেসে। ভিক্টোরিয়া টেরেসের নম্বরটা হরবিলাস বাবু তাঁর নোট বুকে টুকে রাখ্লেন। নিজের মনে বল্লেন—'দেখা যাক্ কি করা যায়'—

হরবিলাস বাবু করুণাময়ের সঙ্গে পাত্রির অবৈধ প্রণয়ের ইতিহাসটুকু জান্বার জন্যে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠ্তে লাগ্লেন কি ভাবে তথ্য সংগ্রহ করা যাবে কিন্তু তাঁর বৈবাহিক মহাশয় দেবপ্রসন্ন বাবু যে ইতিমধ্যে অনুসন্ধান করে সব জান্তে পেরেছেন, তা তাঁর চিন্তার অতীতই ছিল। শেষে রহস্য আর অন্ধকারে রইলো না।

রবিবার। হরবিলাস বাবু তখন চা পান কর্তে কর্তে খবরের কাগজ পড়্ছিলেন। প্রভাতী সূর্য্যের স্নিগ্ধ আলো জানালায় ফাঁক দিয়ে ভিতরে সবেমাত্র প্রবেশ করেছে, এমন সময়ে বেয়ারা মহাশয়ের আকস্মিক আবির্ভাবে তিনি চম্কে উঠ্লেন। নিজেকে সাম্লে নিয়ে আদর অভ্যর্থনা করে বল্লেন—'সুপ্রভাত, আজ আমার কি সৌভাগ্য !'—

দেবপ্রসন্ন বাবু তাঁর কৃত্রিম পুলকতার বিশেষ কোনরূপ ভাব প্রকাশ কর্লেন না। তাঁকে মনে হোলো ঠিক যেন ফোড়ো হাওয়া। বল্লেন—'আপনার সৌভাগ্য হোতে পারে, কিন্তু আমার নয়। যে ভাবে আমরা এ বিষয়ে এগিয়ে চলেছি, তা'তে আপনাকে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনে অভিযুক্ত করা ভিন্ন অন্য কোন পথ দেখিনে—'

হরবিলাস বাবুর মুখখানি হঠাৎ একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল।

বৈবাহিক-সুলভ হাস্য পরিহাস এক্ষেত্রে অবান্তর। অবস্থাওয়া প্রতিকূল।

দেবপ্রসন্ন বাবু বল্তে সুরু কর্লেন—আপনার মেয়ে এত কথা তা যদি আগে জান্তাম ? তাঁর কথায় বাধা দিয়ে হরবিলাস বাবু বল্লেন—'জেনে শুনে খোঁজ খবর নিয়ে তবেই তো আপনি আমার মেয়েকে নিয়েছেন—আপনি আর আমি দুজনেই সহরের লোক, কয়েক পুরুষের বাসিন্দা, পরস্পরের খবর জানা খুব সোজা, সে খবর যে আপনি নে'ননি, তাও নয়—তার ওপর হয়েছেন মিউনিসেপ ম্যাগনেট, বহু কোম্পানীর বোর্ড অব ডিরেক্টারসের মধ্যে আছেন—কতখানি পাকা বুদ্ধি থাক্লে তবে এমন হওয়া যায়—আমি পেরেক ধরে লেটের ভাত করেছি, আপনি ঘুলো ধরে সোনা করেছেন—সুতরাং এ কাজটা হঠাৎ হয়নি—

দেবপ্রসন্ন বাবু বিরক্ত হয়ে উঠ্লেন। বল্লেন—'ওসব কথা ছেড়ে দিন, ইউনিভার্সিটির কলেজের একটি মেয়ের সঙ্গে সম্প্রতি আমার মেয়ে বাবুর ভাব হয়েছে। বাবু তার মাকে যে সব কথা বলেছে, তাতে কানে আঙুল দিতে হয়। তবুও আমরা বিশ্বাস কর্তে পারিনি, শেষে কয়েকদিন আগে বাবুর বান্ধবীকে নেমন্তন্ন করে আমাদের বাড়ী আনা গেল। আপনার মেয়ে হোষ্টেলের যে রুমে থাকে তার পাশের রুমে থাকে ঐ মেয়েটি—নাম প্রতিভা আইচ। সে বল্লে আপনার মেয়ের সঙ্গে করুণাময়ের বোনের বহুদিনের ভাব—এক সঙ্গেই তারা লরেটো থেকে পাস করে একই কলেজে বরাবর পড়েছে, দু'জনেই পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের ছাত্রী, ওদের মধ্যে একাত্মভাব আছে। বউমা যখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়েন তখন করুণাময় অক্সফোর্ড থেকে এম, এ আর গ্রেজইন্ থেকে ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে আসে। তারপর থেকেই দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা চল্তে থাকে। তারপর তাদের সংঘমের আবরণ শিথিল হয়ে গেছে, এর পর আপনি কি বল্তে চান ? আপনি কি

বলতে চান আপনি কিছু জানেন না? আর তা কেউ বিশ্বাস করতে পারে?—কলকাতার সঙ্গে বউমার বিয়ে হওয়া উচিত ছিল—এ সব বেয়াড়া কাণ্ড কারখানা অসহ্য—

কথার বাধা দিয়ে হরবিলাস বাবু বললেন—'আজকের দিনে ছেলেমেয়েদের মধ্যে মেলামেশা ভাবলাভ হয়েই থাকে, মেয়ে কি এমন বেয়াড়া কাণ্ডকারখানা করেছে?—বলুন! তাহলে নিশ্চয়ই হোষ্টেল কর্তৃপক্ষ আমাকে জানাতেন—আমার মেয়ে বরাবর বোর্ডিং হোষ্টেলে থেকেই মানুষ—শাসনের গণ্ডী পেরিয়ে ও কোনদিন স্বেচ্ছাচারিণী হয়নি—পরের মুখে ঝাল খেয়ে এরকম মন্তব্যটা আপনার মত জ্ঞানীর কাছ থেকে আশা করিনে, আর যাই হোক্, আমার মেয়ের চরিত্র খাঁটি—

একথায় দেবপ্রসন্ন বাবু নিরস্ত হলেন না। বললেন—'আপনাকে জানাতে এসেছি বউমার নামে রমাপ্রসন্ন আদালতে শিগ্‌গির মামলা রুজু করবে, তারপর দেখা যাক কোনঘাটের জল কোন ঘাটে সরে—

তাঁর কণ্ঠস্বরে ধৃষ্টতা ফুটে উঠলো। কিছু বলার অপেক্ষায় তীক্ষ্ণ উষ্মা মুখে সস্ত্রীক হরবিলাস বাবু দেবপ্রসন্নের মুখের পানে চেয়ে রইলেন।

কথা আর হোলো না। মোটরে উঠে দেবপ্রসন্ন ঝঞ্ঝুব্যে প্রস্থান করলেন।

রমাপ্রসন্ন কোনমতেই শান্তিকে ভুলতে পারে না। মধুময় শুভ মুহূর্তে প্রথম মধুরাতে সে শান্তিকে যখন পেয়েছিল, তখন যৌবনের মাধুর্যের আবেষ্টনীর মধ্যে সে তাকিয়ে দেখেছে গোলাপ পাপড়ির মতো কোমল শয্যায় কোটাফুলের মতো সৌন্দর্যের ঢেউ তুলে শুয়ে আছে শান্তি কিন্তু প্রথম আলাপনে শান্তির বিরক্তি দেখেও তবুও ধৈর্যচ্যুত হয়নি, নানাভাবে তার মানসিক প্রফুল্লতা আর আনন্দলিপ্সার উত্তেজনা সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছে, শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে ভেবে দেখেছে ওর জীবনের নতুন যাত্রাপথ কণ্টকাকীর্ণ। আবার কিছুক্ষণপরে ঘরে প্রবেশ করে দেখেছে নববধূর রূপের তরঙ্গ ফুলশয্যার ওপর বয়ে যাচ্ছে, নিদ্রিত মুখে ফুটে রয়েছে কমল কুঁড়ির স্নিগ্ধতা। তার স্পর্শ পেয়ে ঘুম ভেঙে উঠলো শান্তি আর কটু উক্তি করলে—বললে—'ঘুম হও, ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রি—

ও ভেবে দেখলো এ বধূকে নিয়ে ঘর সংসার করা চলেনা।

ফুল শয্যার রাতের কথা মেঘে ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো। শান্তির ওপর সকলেই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো।

রাণুই প্রথম উত্তেজিতা হয়ে শান্তিকে বেশ দুকথা শুনিয়ে দিল। শান্তি বললে—'তোমার দাদার সঙ্গে আমার মনের মিল হোতে পারেনা—যেখানে মনের মিল হয় না সেখানে বড় জোর পোষাকে প্রণয় হোতে পারে, প্রকৃত প্রেম হয় না—আমি পোষাকে প্রণয় করিনে—মিস্ত্রীর সঙ্গে প্রেম করতে বসিনি মেয়েরা—আমরা আর্টের উপাসিকা, আমাদের প্রেরিক হবে আর্টের পূজারী—রাণু কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্ক করে তার বউদিকে বললে—তা হোলে কি করতে চাও—এখানে তো আর্টের পূজা হবে না, আমরা বিজ্ঞানের পথেই চলবো—মিস্ত্রী তোমাকে কেমন করে ইস্ত্রী করবে—তারপর জোরে হেসে উঠতে শান্তি নিজেকে অপমানিতা বোধ করে বললে—

চলে যেতে যাই—

সামাজিক নিয়ম শৃঙ্খলার আবরণ আর পারিবারিক পরিবেশের মধুর আবেষ্টনীর বাইরে এসে শান্তি যেদিন বাপের বাড়ী চলে এলো, সেদিন রমাপ্রসন্নের দুটি চোখের নীরব ভাষায় ছিল উৎকণ্ঠার সুস্পষ্ট চিহ্ন—এই উৎকণ্ঠাই তাকে আকুল করে তুললো কিন্তু বাইরে প্রকাশ করলো যে চলে গেছে তার কথা মুখে আনতেও তার প্রবৃত্তি নেই। শুভার্থীদের উষ্ণির দৃষ্টির সম্মুখে রমাপ্রসন্নের মুখে কোন অপ্রসন্নতা বা চিন্তার ভাব ফুটলোনা। সে অন্য দিনের মতই ঠিকমত নিজের দৈনন্দিন কাজগুলি করতে ত্রুটি প্রকাশ করলো না। তবু তার মনের কোণে থেকে যায় যৌন বেদনা—রাত্রে নিঃসঙ্গতার মধ্যে তার বিনিদ্র মুহূর্তগুলি চলে যায় বিষাক্ত সাপের মত ফণা তুলে—শয্যার পানে তাকিয়ে সে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে। সে কিছুতেই ভুলতে পারেনা—সংসারের অসংখ্য প্রাণহীন চিত্রের মাঝে সে যেন আর একখানি চিত্র। নিজের মনে বলে—'তবে কি শান্তি আর আসবে না? আমার দেহের প্রতিটি

তদীতে অজয়ের কত কাছের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি দেখতে পেয়েও সে আমাকে অবহেলা করেছে, কটুক্তি করেছে, হেলার হাসি হেসেছে—তবু কেন মন তার জন্যে ব্যাকুল? তার রূপের মোহ কেন এখনও আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে?—

দিনগুলি এমিভাবে চলে যেতে থাকে—রমাপ্রসন্ন নীরব। এমন কি জামাইষষ্ঠীর দিনও শ্বশুরবাড়ীর আমন্ত্রণে সে গেল না। সে ভুলে যেতে চেষ্টা করলো তার ক্ষণিকের তাসের ঘরের খেলা—কিন্তু তা কি ভোলা যায়? তাসের রং চোখের নেশা, ওনেশা কাটানো সহজ কি?

রমাপ্রসন্ন ইউরোপ যাত্রার সঙ্কল্প করলো অফিস থেকে কিছুদিন ছুটি নিয়ে কিন্তু ওর মা বললেন—'এখন নয়, কিছুদিন পরে তোমাকে ছাড়বো—তোমাকে ছেলে থাকতে পারবোনা—বাদুর বিয়ের পর যেও—

মায়ের কথার ওপর রমাপ্রসন্ন কোন কথা বললো না।

কিছুদিন পরে শান্তি মা বাপের সঙ্গে দেখা করতে এলো।

মা বললেন—'তবু ভালো যে মনে পড়েছে'—

ও নানা কারণ দেখিয়ে মায়ের মন ভোলাবার চেষ্টা করলো। হরবিলাস বাবু রমেপ্রসন্নের কথাবার্ত্তাগুলি মেয়ের কাছে বলতেই ও বললে—'হাঁ, হাঁ, সব করবে—আইনের সাহায্যে কখন ঘর করানো যায় না,—রেষ্টিটিউসন অব কনজুগাল রাইটের মামলা করবে এই তো, তার খাইনে—

উত্তেজিত কণ্ঠে হরবিলাস বাবু বললেন—'তুমি তো কিছুতেই ভয় খাওনা, কিন্তু আমরা কেলেঙ্কারির ভয় করি—

শান্তি উচ্চকণ্ঠে বললে—ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করলেই কেলেঙ্কারি অনেক দূর পর্য্যন্ত গড়াবে, বিবর্ণী হয়ে কেলেঙ্কারীর চরম করবো—এখন আর ঠাকুর যার যুগ নেই—

হরবিলাস বাবু বললেন—'পরিণামটা ভেবে দেখো, সর্ব্বনাশ হবে যে—

—কেন হবো?—এম. এতে ফার্ষ্ট ক্লাস পেলে, বাস্ কাউকেই তোয়াক্কা করিনে—

কিরণময়ী বললেন—যে ভাবে তোমার চাল চলন দেখা যাচ্ছে তাতে সমগ্র নারী সমাজেরই মুখ হেঁট হয়, কত লোকের মুখ চাপবো বলোতো—

—বেশ, তোমরাও মুখ দেখো না, তা হোলে আর চাপতে হবেনা—

কথায় কথায় বেড়ে চললো। হরবিলাস বাবু উচ্চৈঃ স্বরে বলে উঠলেন—বেরিয়ে যাও, খবরদার এ বাড়ীতে এসোনা, আজ থেকে জানলাম আমার মেয়ে মরে গেছে—

শান্তির অন্তরাত্মা আহত হোলো। ও কোন কথা না বলে মুখ হেঁট করে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল।

মানুষ ভাবে এক, ভগবান করেন আর এক। দৈবের খেলা দেখে মানুষ অবাক হয়ে যায়, বুদ্ধিতে এর ব্যাখ্যা চলে না।

হোষ্টেল আসতেই প্রতিভা আইচ শান্তির ঘরে প্রবেশ করলো। প্রতিভা একখানি পত্র দিল—শিরোনামায় শান্তি দেখলো 'শুভ বিবাহ' মুদ্রিত রয়েছে। পত্রটি ওর নামে নয়—প্রতিভার নামে—আসছে ভিক্টোরিয়া টেরেস থেকে। কি ব্যাপার! খাম থেকে পত্রখানি খুলে ও পড়লো। অভিমানে, ক্ষোভে ক্রোধে ও নিজের মনে বললে—'চালাকি খেলবার দরকার কি ছিল? বললেই হোতো আমাকে—

ও ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়ালই ছিল না। ঘুম ভাঙতেই ও চেয়ে দেখলো রাত্রি প্রায় নয়টা।

ডাইনিং রুমে নৈশাহারের সময়ে ওর কানে এলো তাকে বাদ দিয়ে কল্যাণের বিবাহোপলক্ষ্যে বিভা সবাইকে নিমন্ত্রণ করে গেছে। নিজের মনে বললে—'বললেই কি যেতাম নাকি কুকুরের মত—কোনরকমে নৈশাহার সেরে ও ঘরে এলো, কিন্তু লক্ষ্য করলো মেয়েরা ওর দিকে তাকিয়ে যেন ঠাট্টা তামাসা সুরু করেছে—এর চেয়ে মরণই ভালো?

মনুষ্য চরিত্র সত্যই দুর্জ্ঞেয়—প্রভাতরবি যেন ছুরে দাঁড়িয়েছে মানব সভ্যতার বিশিষ্টরূপ ওর চোখে জল এলো। সকালে কেমন করে সবার কাছে ও মুখ দেখাবে! আর ভাবতে পারে না। মনে পড়ে গেল ফুল শয্যার

রাত্রের কথা, মনে পড়ে গেল স্বামীর প্রথম প্রণয় নিবেদনের উক্তি। ও চিত্তের দৈর্ঘ্য হারিয়ে ফেললে। ওর অন্তরে অনুতাপ এলো। ও ভাবতে থাকে—কেমন করে ও আবার সেখানে ফিরে যাবে যেখান থেকে ও গর্ব্ব ভরে বেরিয়ে এসেছে। নিজের মনে বললে—'যাবা যে রকম বহুরাগী তা'তে বাপের বাড়ী যাওয়া চলে না—'তবে?—যে আমাকে বুকে টেনে নিয়েছিল একদিন, তার কাছেই ফিরে যাওয়া ভালো—বুকলাম শিক্ষিত ভদ্র পুরুষ ও পশুর অধম হয়—

আবর্জ্জনীন স্বচ্ছন্দ জীবনের প্রয়োজন আছে বৈ কি!

ভোর না হোতেই শয্যাত্যাগ করে বাইরে এসে হরোয়ানকে ফটক খুলে দিতে বললে। হরোয়ান আপত্তি করতেই ও হাতে একখানি নোট গুঁজে দিয়ে বললে—আমাকে যেতে দাও সবার উঠ্‌বার আগে—

হরোওয়ান ওর মুখের দিকে চেয়ে কি ভাবলো, তারপর গেট খুলে দিল। রাস্তায় এসে ট্যাক্সি দেখতে পেলোনা, ট্রামে উঠে পড়লো। এসপ্লানেডে এসে ও একখানি ট্যাক্সিতে উঠে বললে—এলগিন রোড—

তারপর ট্যাক্সিখানি যখন দেবপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীর দরজার কাছে এসে থামলো তখন সে দেখতে পেলো রমাপ্রসন্ন প্রাতর্ভ্রমণে বেরোবার জন্যে গেটের কাছে এসেছে। ট্যাক্সি থেকেই স্বামীকে প্রণাম করে সে বললে—এতদিন আমাকে চেয়েছিলে বলে আসিনি, এখন আর চাওনা বলেই এসেছি

রমাপ্রসন্ন মৃদু হেসে বললে—চলো, ভেতরে চলো।

সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কে কয়েকটি কথা

শ্রীমতী অরুণা রায়

বাংলার সংস্কৃতি বা কালচারের পীঠস্থান কোলকাতার একটা প্রেক্ষাগৃহ (Cinema Hall) থেকে বাংলা ছবি দেখে বেরুচ্ছি—এমন সময় পেছন থেকে একটা গুঞ্জরণ কানে এল—"বাংলায় সাহিত্যিক নেই।" সামান্য তিনটি কথায় মনের মধ্যে কেঁপে উঠলো—একটা তীব্র বেদনার শলাকা হৃদয়কে ক্ষত-বিক্ষত করতে লাগলো। সত্যিই কী বাংলায় সাহিত্যিক নেই? কেন আজ এই প্রশ্ন বাঙালীর মনে জাগে? কেন একটা হতাশা তাদের চিত্তকে আন্দোলিত ক'রে বিপন্ন ক'রে তুলছে? কিন্তু আমরা গর্ব করি—করারও আমাদের সুস্থ অধিকার আছে যে—বাংলা কাব্যের দেশ (A land of Poetry)—কবিতার মধুতাও বাংলার ঘরে ঘরে—বাংলার লতা-পাতা ফুল কবির কাব্যের খোরাক—বাংলার নদী নির্ঝরের কল কল গীতি—প্রকৃতির অপূর্ব শোভা বাংলার সাহিত্য। প্রাণরস ক'রে তুলতে সহায়তা করে। তারকা খচিত উন্মুক্ত সুনীল আকাশ—গিরিসুখের তুষার-ধবল নিরবতা বৃক্ষাবলী বাঙালীর মনে আনায় কাব্যের হিল্লোল। তাই তো বাংলা কাব্যের দেশ—সাহিত্যের তীর্থক্ষেত্র—সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র।

যুগ যুগ ধ'রে বাঙালী অনুপ্রাণিত হয়েছে সাহিত্যে—নতুনত্বের মহিমা কীর্তিত হ'য়ে আসছে যুগ যুগান্তর ধরে। তাদের এই বিশ্ববিশ্রুত ভাবধারা বিশ্বের কাছে অভিনন্দিত হয়েছে। তবে আজ কেন সেই বাঙালীর কণ্ঠে হতাশা—মুখে কেন বৈরাগ্যের ছায়া?

এই প্রশ্ন অনেকেই করেছেন—আমার অনেকেই চেষ্টা করেছেন জবাব দিতে। কিন্তু কেন জানি না, কোন সন্তোষজনক জবাব দিতে তাদের লেখনী কেঁপে কেঁপে উঠেছে। একটা আবছা আলো আঁধারের মত জবাব দিয়েছেন তাঁরা—"জাগতিক নিয়ম"। বাংলা ও বাঙালী সেই জাগতিক নিয়মের বাইরে পড়ে না। মেনে নিলাম—কিন্তু যখন বাংলা ও বাঙালীর ঐতিহ্যের কথা আমাদের মনে হয়—তখন কী বাঙালীর বেলায় প্রকৃতি পক্ষপাতিত্ব

করেছিলেন? তা না হলে সে যুগে কেন এই প্রশ্ন ওঠেনি—এই আপত্তিক নিয়ম! তাই এই যুক্তিকে যথাযথ ব'লে মেনে নেওয়া যায় না; কারণ সর্ব যুগেই বাঙালী তার বৈশিষ্ট্য বহাল রেখে চিন্তাধারা ও ভাবধারা উন্মুক্ত ক'রে প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকতো। আজই হচ্ছে তার ব্যতিক্রম—সাহিত্যিকের মন আজ সঙ্কীর্ণ—দৃষ্টিভঙ্গী পরের কাছে বাঁধা পড়া। এইখানেই বাঙালী হারিয়েছে তার আপন বিশেষত্ব—তাতেই হয়েছে তার অপমৃত্যু। বাঙালী জাতির অপমৃত্যু হওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলার সাহিত্যেরও সংস্কৃতির অবসান ঘটছে!

অনেকে আবার প্রশ্ন তুলেছেন—বর্তমান আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন সাহিত্যও অস্বচ্ছ হ'য়ে উঠছে। 'আর্থিক অস্বচ্ছলতা' কথাটা সত্যি—অর্থ-নৈতিক বিপাকে আজ শুধু সাহিত্যিকই নয়—গোটা ভারতবর্ষের লোককে জড়িয়ে ফেললে অবান্তর কিছু বলা হবে না ব'লেই মনে করি। কিন্তু সাহিত্যিকগণের আর্থিক স্বচ্ছলতা কোনদিনই ছিল না—দুঃখ-দুর্দশার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে সৃষ্টির উন্মাদনায় তাঁরা পাগল ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের আদি থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আর্থিক কষ্ট ভোগ করেছেন। শুধু আর্থিক নয়—পারিবারিক নানাবিধ অশান্তি ও তাঁদের মনে মাঝে মাঝে এমন প্রভাব বিস্তার করতো যে, সাময়িকভাবে তাঁরা বিমর্ষ হ'য়ে পড়তেন—তবে সৃষ্টির আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতেন না। এখানে অনেকে নজির তুলতে পারেন যে, পূর্বে আমাদের দেশে সাহিত্য চর্চার যথাযোগ্য মর্য্যাদা দিতেন তদানীন্তন বিত্তশালী রাজা-মহারাজা প্রভৃতি। কথাটা সত্যি—তখনকার দিনের রাজা-মহারাজারা সাহিত্যিকগণের প্রতিভা বিচার ক'রে আজীবন তাঁদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা করতেন। আর্থিক কোন চিন্তা তাঁদের ক'রতে হ'ত না। তাঁরা সমস্ত চিন্তাধারা ব্যয়িত করতে পারতেন সাহিত্য-সৃষ্টিতে। সাহিত্যানুরাগী রাজা-মহারাজার আনুকূল্যের জন্যেই বেদ, উপনিষদ, মহাভারত, রামায়ণ প্রভৃতির ভাষানুবাদ হ'য়েছে।

এখন প্রশ্ন হ'তে পারে—বর্তমানে আমাদের দেশে রাজা-মহারাজা কিছু নেই—পুঁজিবাদী যাঁরা আছেন তাঁরা কাব্যলক্ষ্মীকে বরণ করে বৃথা অর্থ অপচয় করতে চান না। তবে পরোক্ষে একটা কথা মনে আসে—আমাদের জাতীয় সরকারের সাহিত্যিকের প্রতিভার উপযুক্ত মূল্য ও মর্য্যাদা নিরূপণ ক'রে বৃত্তির ব্যবস্থা করা কী উচিত নয়? যাঁরা এ প্রশ্ন করবেন—আমি তাঁদের সঙ্গে একমত। তবে এই কারণেই যে সাহিত্য নিম্নস্তরের হবে—সেদিকে ভোট দিতে আমি নারাজ। কারণ নানা রকম অশান্তি দুঃখ দুর্দশা ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে যে সাহিত্য সৃষ্টি হয়—সেই-ই হয় প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য। তার ভাবরস মানুষকে সমস্ত দুঃখ-জ্বালা থেকে অন্তরে উপনীত করে। সংসারে যখন নিয়তই দুঃখ আছে—তখন এমন একটা কিছু চাই—যা সাময়িক ভাবে আনন্দ দিতে পারে। সুতরাং বলতে পারি খোঁড়া কৈফিয়ৎ দিয়ে (lame excuse) সাহিত্যের মানদণ্ড নির্ধারণ করা সমিচীন হবে না।

আজকাল আমরা বুঝতে চেষ্টা করিনে যে; সাহিত্য কি! অবশ্য বড় বড় মনীষীরা এর জবাব বহুবার বিভিন্ন ভাবে দিয়ে গেছেন। নিরালায় বসে প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি ক'রে সত্যও সুন্দর রূপে প্রকাশই সাহিত্য! অন্ধকারে আলোর সন্ধান; দুঃখের অমানিশাকে অপসারিত ক'রে সেখানে প্রজ্জ্বালিত করা আনন্দের বর্তিকা; কুৎসিৎকে সুন্দর ক'রে তোলা; অজ্ঞানতার তমিস্রাকে সরিয়ে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়াই সাহিত্য। কিন্তু যাঁরা এই জ্ঞানের প্রদীপ—তাঁদেরই অন্তরে তো তেল নেই—সেখানে রসশূন্য—সাহারার মত বিস্তীর্ণ বালুকা রাশি—জলন্ত অগ্নিপিণ্ডের তেজ দীপ্তিতে মৃত বৎ! আবার প্রশ্ন আসে, কেন? এর জবাবে বলবো—বিচার ক'রে দেখ নিজের মনকে।

আজিকার সাহিত্য নিম্নস্তরের হ'য়ে যাচ্ছে ব'লে অনেকে আশঙ্কা করছেন। এই নিম্নস্তরের হওয়ার কারণ সাহিত্যিকদের সঙ্কীর্ণ মনোভাব ও ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি। যাঁরা আজিকার সাহিত্য জগতের পুরোভাগে আছেন—তাঁদের প্রায় সকলেই সাহিত্যকে বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ ক'রেছেন—মানে সাহিত্য ক'রে সংসার চালাবার দায়িত্ব নিয়েছেন। তাই সকলেই প্রায় সংখ্যায় বেশী লিখে পয়সার দিকে ঝুঁকে পড়েছেন। এই বেশী সংখ্যায় লেখার জন্য তাঁরা সাহিত্যকে ক্রমশ নিম্নস্তরের ক'রে তুলেছেন।

একটা ভাল রচনা সৃষ্টি করতে যে সময় ও যে চিন্তা শক্তি ব্যয়িত করতে হয়—এরা সেই সময়ে প্রায় পাঁচটা রচনা লিখে স্বীয় নামের জোরে পয়সা উপার্জনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। সরস্বতীকে কেন্দ্র ক'রে লক্ষ্মীর কৃপা পেতে চান। এতে হয় কি রচনার দিকেও তা উৎকৃষ্ট হবে না—আবার লক্ষ্মীর কৃপাও পুরোপুরি পাওয়া যায় না। এঁদের পরবর্তী পরিণাম—অনাহার মৃত্যু। নচিবের নিশ্চই হকার হবে না।

এর মধ্যে আবার অনেকেই চিত্রজগতে প্রবেশ ক'রে বেশ কিছু হাত্তা জিনিষ পরিবেশন ক'রে দর্শকের কাছে বাহবা নিতে চান। শুধু যৌন আবেদনমূলক একটা কিছু লিখে—নায়ক নায়িকার রূপ-লৌকর্য্যে তাকে ফুটিয়ে তুলে পয়সার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। হয়তো বিশেষ একশ্রেণীর দর্শক তৃপ্তি পান। কিন্তু মননশীল দর্শক (Intellectual audience) মাত্রেই নিরাশ হ'য়ে ফিরে আসেন—আর বলেন—"বাংলায় সাহিত্যিক নেই।"

সাহিত্যিক হ'ল স্বাধীন ইচ্ছা স্বাধীন ক্রিয়া ও বিবেকে বুদ্ধির অধিকারী। তাঁদের জানা উচিত—চরিত্রকে—ভাবকে কি ক'রে সুসমঞ্জস্য ভাবে বিকশিত ক'রে তুলতে পারা যায়। এ বিষয়ে তাঁর নিম্নস্তরে নামা উচিত নয়—স্বচ্ছ বিচার-বুদ্ধির দ্বারা বিকাশ লাভ করা উচিত।

সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে একটা ক্রমবিকাশের ধারা বিদ্যমান—সে পার্থিব জগতেই হোক আর অপার্থিব জগতেই হোক—ছন্দের বেলাই সত্য। সাহিত্য সৃষ্টির সময় প্রত্যেক সাহিত্যিকের মনে ঐশী শক্তির বিকাশ হয়। সাহিত্য হল স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া—এতে থাকবে নতুন সৃষ্টি তথা নিয়ে সৃষ্টির আনন্দ। আর এই আনন্দের মধ্যেই পাঠক খুঁজে পায় লেখকের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব বিকাশ।

কিন্তু এত গভীরতার নীচে আজিকার সাহিত্যিকগণ যেতে চান না। সাহিত্যের মূল্যের চেয়ে পয়সার মূল্য বেশী যেন।

অর্থ প্রত্যেকেরই প্রয়োজন সত্যকথা—কিন্তু প্রতিভার অপচয় ক'রে অর্থকে আঁকড়ে ধরার কোন মানে হয় না। তার কারণ সাহিত্যিকের প্রতিভাই হ'ল জনগণের প্রতিভূ। সমস্ত জাতির ভালমন্দের এক বৃহদংশে তাঁদের উপর নির্ভর করে। এখন প্রায়ই একটা কথা শোনা যায়—পেটে আগুন নিয়ে সাহিত্য করার কোন তাৎপর্য্য নেই। এ কথার জবাব হ'ল—সাহিত্যিকগণ তাঁদের প্রতিভার পরিচয় দিয়ে জনগণের উপর নিজেকে নির্ভর করবে—আর সেই অসামান্য প্রতিভার দৃষ্ট জিনিষ লাভ করে সাহিত্যিকগণকে বাঁচাবার দায়িত্ব নেবে পাঠকগণ নিজ হাতে।

কিন্তু আজিকার সাহিত্যিকগণ পাঠকের সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেছেন। এমন সব উদ্ভট সাহিত্য সৃষ্টি করছেন—পাঠকগণ তার রস উপলব্ধি করতে না পেরে সাহিত্যিকের প্রতিভার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে হতাশ হয়ে পড়েছেন।

অর্থাৎ সাহিত্যিকগণ পাঠকের রুচিকে অবজ্ঞা করে সাহিত্যের উপর এক অদ্ভুত experiment চালাচ্ছেন। এর পরিণাম যে কী ভয়াবহ তা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই বুঝতে পারছেন! সুতরাং সাহিত্যিকের ব্যবসায়ী মনোবৃত্তি—সঙ্কীর্ণ মনোভাবকে দূরে সরিয়ে রেখে উদার মনোভাব নিয়ে সৃষ্টি করতে হবে সাহিত্য। তার মধ্যে কোন দুর্বোধ্যতা বা কোন অশ্লীলতা থাকবে না—যা সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করে সমাজকে ভাঙনের তীরে নিয়ে না যায়।

এই দুর্বোধ্যতার experimentএর উপর আজকাল (Symbolism) ব্যবহার চলছে। এই সব করে অত্যাধুনিক কবিরা নিজের কুয়াশাচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যকে জাহির করছেন। চিন্তা করে দেখলে— দেখা যায় এর মূল্য খুবই নগণ্য—পরমাণুও অতি অল্প। সুতরাং পাঠক সমাজ কেন তার মূল্য দিতে যাবে?

এরা (অত্যাধুনিক) বলেন—মাটীর পৃথিবীতে বাস করে স্বর্গীয় কল্পনার জাল বোনার দিন আজ নয়। ফুল আর লতা নিয়ে কাব্য সৃষ্টি করার কাল চলে গেছে। মেনে নিলাম—জগতের পরিবর্ত্তন হয়েছে—আজকার ক্ষুধার্ত মানুষের মুখের কথা—মনের ভাষাকে কাব্যে রূপ দিতে হবে। খুবই ভাল কথা—কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে চাই—ক্ষুধার্ত মানুষের মুখের কথা কী দুর্বোধ্য? অর্থহীন?

হয়তো আমার কথায় অত্যাধুনিক কবিরা গোদা করবেন এমন কি অর্বাচীন বলতেও দ্বিধা করবেন না। কিন্তু যা সত্য—তাকে প্রকাশ করাও একান্ত প্রয়োজন বৈকি!

জগত প্রেম সাধনা চায়

শ্রীমতী হেমলতা ঠাকুর

বাংলা এলো উড়িষ্যায়
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর
পদধূলির প্রত্যাশায়।
ধূলি সে যে প্রেমের ধূলি,
ভেদের প্রাচীর দিল ভুলি
উচ্চ নীচে কোলাকুলি
ঘটলো প্রেমের তপস্যায়।

করলো প্রেমে সবায় শুচি
"জীবে দয়া নামে রুচি"
মিটিয়ে দিল বেদ পুরাণের
সকল বাণীর সমন্বয়ে।
মানব আত্মা অমূল্য ধন
বক্ষে ধরি জড় ও চেতন
প্রেমের বলে করছে গঠন
একটি মানব সম্প্রদায়।
জাতি ধর্ম্ম সমন্বয়
সব মানুষের প্রেমের জয়
একই অন্ন সবার জন্য
বাঁচবেনা কেউ অন্যথায়।
শান্ত জগত শান্ত জগত
শান্ত সকল দ্বন্দ্ব আপদ
দৃষ্টি মেলি, জগত পানে
প্রেমের সিন্ধু উথলায়।

জগত আমার বন্ধু আমার
তুমিই অসীম প্রেম পারাবার
তোমার সাথে মিলনে আমার
সকল সিদ্ধি সব সাধনায়।

বুদ্ধ খ্রীষ্ট শ্রীচৈতন্য
তোমায় ভালবেসে ধন্য
আপন আত্মা দিয়ে গেলেন
জগত বাসী জগত জনায়।

প্রেমে জগত জন্ম নিল
প্রেমে আত্ম বিলাইল
সেই সখে আজ জগত বন্ধু
মিলন হলো তোমায় আমায়।

একটি পাতায় একটি ফুলে
জাগলো যে প্রেম দুলে দুলে
একটি মানুষ ভাল বাসায়
ভরলো প্রেমে এই দুনিয়ায়।

তপে গো তার জগত আলো,
প্রেমের চোখে সবাই ভালো,
বুকের ঘরে জ্বল জ্বল
জ্বললো বাতি ঐ দেখা যায়।

P30214

সেবা

শ্রীমতী রূপপ্রভা ভাদুড়ী

সমাজের নানা স্তরে নানা ঘরে
বিক্ষিপ্ত রয়েছে যত জীবন ইতিহাস।
সেই সব অশ্রুসজল পাণ্ডুলিপি
বর্ত্তমান পৃথিবীর পানে চেয়ে ফেলে দীর্ঘশ্বাস।
তারা আজ পুরাতন অতীত ও মৃত;
কালের অতল তলে বিলুপ্ত বিস্মৃত।
আজ নূতনের অভিষেকে নূতন সমাজে,
আমাদের চতুঃপার্শ্বে চলে তার
গঠন মূলক কাজ।
মাতা কন্যা বধূদের পাশাপাশি
একই কর্ম্মস্রোতে,
জীবনের পূর্ণতার প্রচণ্ড আবর্ত্তে,
কাজ চলে অক্লান্ত উদ্যমে
নগরে সহরে গ্রামে গ্রামে,
নূতন সমাজ জাগে মানুষের সেবা আর শ্রমে।
অন্তঃপুর অন্তরালে এতদিন যে অপগণ্য প্রাণ,
আলস্যে বিলাসে ছিল নিমজ্জমান,
সেই সব অগণিত মূক প্রাণে জ্বালে কর্ম্মশিখা,
ছিন্ন করি সংস্কারের অন্ধ কুজ্ঝটিকা
আলো জ্বলে জীবনের যজ্ঞ বেদী মূলে
আলো জ্বলে মানুষের শুভেচ্ছায়
সত্যের মঙ্গলে।
গৃহহারা নিঃসহায়া অন্নপূর্ণা নারী
সমাজ শিক্ষার মূল পুরোভাগে আজি
আসন নিয়েছে আজ জীবনের রুগ্ন রৈক্ত ভুলে,
আপনার বিচ্যুত অধিকার
আনন্দে মস্তকে তুলে,
করেছে সাদরে বরণ।
স্নিগ্ধ মুখে হাসি ফোটে
অজ্ঞানের বুকে জাগে আশা;
মৌন কণ্ঠে ফোটে লক্ষ ভাষা।
শিক্ষা আর সংস্কৃতি উভয়ের যুক্ত সহযোগে,
নারী সমাজের বৃহৎ অংশ আজ
কর্ম্মরাজ্য আনন্দের সাম্য সুনির্ম্মলে।

ব্যর্থতা

শ্রীমতী তপতী মুখোপাধ্যায়

তেজপূর্ণ এ হৃদয় বীর্য্যময় এই দেহখানি,
বিসর্জ্জিতে অগ্নিমাঝে চিতাপার্শ্বে কে নামালি আনি।
প্রভাতেতে এই হাতে উঠেছিল অসির ঝঙ্কার,
সমরের উত্তেজনা হৃদয়েতে বলসিত ধার,
সহসাকি সেই বীর্য্য, সেই শৌর্য্য হারাইল সব।
চকল তরুণ হিয়া মুহূর্ত্তেতে হইল নিরব।
প্রাণদাতা যে তাহার পৃথিবীরে দিয়েছিল প্রাণ,
নিশিদিন ধরিত্রীর রূপে রসে তারি অবদান।
সকলি ব্যর্থ তাহা এ সৃষ্টির কিছু দাম নেই,
আশাভরা বীর্য্যময় দেহ যদি পুড়ে হবে ছাই।

Wilfred Owen's 'Futility' কবিতার ভাব গ্রহণে।

কালো মেয়ে

শ্রীমতী ডলি চট্টোপাধ্যায়

অচীন গাঁয়ে ছিল যে এক মেয়ে
ডাগর চোখে কালো দীঘির ছায়া
বাঁকা বঁধু বাঁকা কাজল ভুরু
গাঁয়ের ছেলে ছোড় আপনহারা।

শ্যামল বরণ কোঁকড়া কালো চুল
কটি বেড়ে বাঁধত আঁচল খানি
মাটির ঘরে দাবের প্রদীপ দিত
ভোরের আলোয় নিকোন উঠান খানি।

সিক্ত বসন নিটোল তনু ঘিরে
থরথরিয়ে কাঁপতো সাঁঝের আলো
নিরব হাসি চোখের ছায়ার নীচে
চিবুক পাশে তিলটি ছিল কালো।

শান্ত দিনের ঘন মেঘের ছায়ে
ছাওয়ার পরে বসে শ্যামল মেয়ে
উদাস আঁখি কারে খুজে ফেরে
পথের বাঁকে মাঠের পাশে চেয়ে?

হোতায় ডুবে কাজল দীঘির জলে
বৈঠা ঠেলে বেড়ায় গাঁয়ের ছেলে
মন যে টানে হরিণ কালো চোখ
খোঁপাতে যার দোলন চাঁপা দোলে।

দীঘির জলে তারই ছায়া নাচে
মেঘের বুকে তারই কেশের ছায়া
শালুক তারই সরল রাঙা মুখ
গাঁয়ের ছেলের পরাণ যারে যাচে।

কলসী কাঁখে আসে গাঁয়ের মেয়ে
সাঁতার কাটে দীঘির কালো জলে
বৈঠা ঠেলে আসে গাঁয়ের ছেলে
শালুক তুলে পরায় কালো চুলে।

বেড়ায় তারা বনের নিকুঞ্জ ছায়ায়
গল্প তাদের বকুল গাছের তলে
আকাশ লোটে তাদের চিকন হাসি
কাশের ফুলে তাদের খুসী দোলে।

সেদিন এল ভিন গেরামের ছেলে
শাঁখ বাজল হুলু দিলে কত
রাঙ্গা চেলী পড়ল গাঁয়ের মেয়ে
সজল চোখে মুখটি করে নত।

নৌকা নিয়ে আসে গাঁয়ের ছেলে
উঠলো তাতে ভিন গেরামের বর
চেলি পরে উঠলো গাঁয়ের মেয়ে
যাবে নাকি যেথায় তাদের ঘর।

আবার ফিরে আসে গাঁয়ের ছেলে
উদাস বাঁশী বাজায় আপন মনে
দীঘির জলে মেশে চোখের জল
বাতাস কাঁদে সে সুর শুনে শুনে।

বনের ছায়া যায়না তাদের কাছে
খোঁজে তাদের শাওন মেঘের মন
বকুল কেঁদে ঝরে ধূলোয় পরে
তাদের ডাকে দীঘির অতল জল।

অনুরাগ

শ্রীমতী করুণা চন্দ্র

হেমন্তের প্রান্ত-তটে হিমেলের আগন্তুক মন ;
নোতুনের কণ্ঠ-সুরে ভ'রে ওঠে শীতের হাওয়ায় ;
ফুলের শ্বাসে আনে, বুকে বুকে তারই আয়োজন
চোখে চোখে তারই ছবি কল্পনাকে দিগন্তে ধাওয়ায়।

কোথায় কোথায় যেন বাঁশী বাজে, এপার ওপারে ;
সুরের আগুন জ্বলে, ঘিলো বুঝি ঘরছাড়া ডাক ;
বধূর লজ্জিত কাঁখে কলসের ভীরু-অভিসার,
সূর্য্যাস্তের চোরা চোখে মেলে দিলো ক্লান্ত-অনুরাগ !

কীর্তিমান ভারত

শ্রীপ্রতিমা সরকার

বড় বড় কীর্তি গাঁথার মধ্যে যে উদ্দেশ্য নিহিত থাকে তাতে যত ক্ষুদ্র স্বার্থপরতার ইঙ্গিতই থাক না কেন তা মহত্ত্বেরই নামান্তর। তা নইলে আজ পৃথিবীতে যত সমাজ কল্যাণমূলক কাজ এবং স্থাপত্য শিল্পের সৃষ্টি হয়েছে তা মানব মনের চরম উৎকর্ষেরই ইঙ্গিত দেয়।

যখন আমরা ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে লক্ষ্ণৌয়ে এসে পৌঁছালাম তখন মনের মধ্যে নানা প্রভাবের প্রশ্ন উঁকি দিতে লাগল। মনে পড়ল কত পৌরাণিক কত ঐতিহাসিক ঘটনা ঐ লক্ষ্ণৌর প্রতি ইঁটে প্রতি ধূলিকণায় জড়িয়ে আছে ওতোপ্রোতোভাবে। তার সূত্র খুঁজে নেবার নেশায় মন উঠল মেতে।

ভারতের স্বাধীনতার প্রথম সূত্রপাত দেখা দিল লক্ষ্ণৌয়ের 'রেসিডেন্সিতে' সিপাহী বিদ্রোহে। যার কাহিনী আজও প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে বিরাজ করছে সেদিনের গুলির দাগ আর কামানের গোলার বিভৎসতার মধ্যে। ক্ষতিচ্ছ রেসিডেন্সি আজও মানব মনে জাগিয়ে রাখে সেদিনের অগ্রগতির ইতিহাস।

লক্ষ্ণৌয়ের ইমাম বাড়ীর ইতিহাস হল মানবতার পূর্ণ বিকাশ, যা না জানলে ইমামবাড়ীর সৃষ্টি কর্ত্রীকে জানা যায় না। জানা যায় না তাঁর সেদিনের মহত্ত্ব ও মহিমা। জানা যায় না সেদিনের দেশের অবস্থাকে আর সে যুগের সভ্যতাকে।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দের কথা। দেশের অবস্থা ভাল হচ্ছিল না। খাদ্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মাঠে নেই শস্য মানুষের উদরে নাই অন্ন। দুর্ভিক্ষের করালছায়া তাথৈ তাথৈ করে নেচে নেচে ছড়িয়ে পড়ছে সারাদেশে। মানুষ অন্নের অভাবে হল হন্নছাড়া। খুঁজে বেড়াতে লাগল 'হা অন্ন হা অন্ন'। নবাব আসফউদ্দৌলা এলেন ঘরের বাইরে ঘুরে ঘুরে দেখলেন সব। মনে মনে উঠলেন শিউরে প্রজার চরমতম দুর্দশায়। মন তাঁর উঠল কেঁদে! কি করবেন হাজার হাজার নরনারীর করুণ ক্রন্দনে। কি করে বাঁচাবেন সহায় সম্বলহীন নর নারীদের এই চরমতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে। শেষে অন্ধকারে দেখলেন আলো। মানুষ নারায়ণের দিলেন পবিত্র আসন। জানালেন নিজের সন্তানবতার কথা।

সে কোন প্রভাত! তার তারিখ সন মনে রাখার প্রয়োজন নেই তাই সেদিনটি নিয়ে নেই গবেষণা। প্রচার হ'ল আর্তের বন্ধু নবাব আসফউদ্দৌলা এক অট্টালিকা তৈরী করাবেন—যা হবে গঠন কৌশলের দিক দিয়ে অপরূপ। যেখানে একসঙ্গে প্রায় এক হাজার লোক বসে পড়বে নমাজ। শুরু হল বাড়ী তৈরী করা। দলে দলে লোক এল কাজ করতে। কাজ পেয়ে পেল পারিশ্রমিক। দিনে আনল চাল ডাল—তৈরী হল অন্ন-খেল পরমানন্দে। রাত্রে এল শ্রান্ত পরিবারের পরিজনেরা মজুরের কাজ করতে। কাজ পেয়ে পেল মজুরী। ইমামবাড়ী তৈরী হল। তার প্রাচীরের বেধ হল বার ফুট। প্রকোষ্ঠের মাপ ১৬১×৫২ ফুট।

হল ঘরের মধ্যে ওপরের দিকে যে চারিপাশে বারান্দা তৈরী করা হয়েছে তাতে বেগমরা বসে কোরান পাঠ শুনতেন। আজও তা অবিকৃত অবস্থায় বিরাজ করছে।

বাড়ীর গঠন কৌশল এক অদ্ভুত নৈপুণ্যের প্রমাণ দেয়। ওপরের অংশগুলি এরূপ ভঙ্গিমায় তৈরী যা 'গোলক ধাঁধার' সৃষ্টি করে। কোনপ্রকার কৌশল জানা না থাকলে সেখান থেকে বাহির হওয়া কঠিন। এই 'গোলক ধাঁধা' নিয়ে নানা প্রবাদ প্রচলিত আছে। কেউ বলেন—নবাবরা অন্তপুর বাসীর সঙ্গে খেলা করতেন। কেউ বলেন বিপদের সময় বেগমদের আত্মগোপনের সহজ ব্যবস্থা ইত্যাদি।

ইমামবাড়ীতে যে ঝাড় দেখতে পাওয়া গেল তা বহু মূল্যবান। কোন কোন ঝাড়ে ৬০—৮০ এমন কি ১২০ পর্যন্ত বাতি দেবার ব্যবস্থা আছে। সামনের হলটাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। মেজেতে সতরঞ্জী পাতা আছে। পরম পবিত্র স্থান। নমাজ পড়া হয়। পাখরার দল বাসা বেঁধেছে, স্থানে স্থানে। অবশ্য এখানেও ভেট দিতে হ'ল। ইমামবাড়ীর ওপরের 'গোলক ধাঁধা' অংশ দেখতে এই ফর্মনীর ব্যবস্থা।

ইমামবাড়ীর প্রবেশ পথ হল 'রুমি দরোয়াজা'। গ্রীক ও ইতালীয় স্থাপত্যশিল্পের অনেক সৌন্দর্য্য দেখতে পাওয়া গেল। বর্তমানে কর্তৃপক্ষ এখানে স্কুল খুলে দিয়েছেন।

নবাব আসফউদ্দৌলা আজ আর নাই। আছে তাঁর কীর্তি। যা তাকে অমর করে রেখেছে। এই অট্টালিকার প্রতি ইটে ইটে জড়িয়ে আছে চরম দুর্দিনে পরমতম মানব-প্রীতি। তাই লোক মুখে মুখে আজও চলে আসছে—

"যে সকো নাহি দেয় কোই,
উসকো দেয় আসফ উদ্দৌলা।"

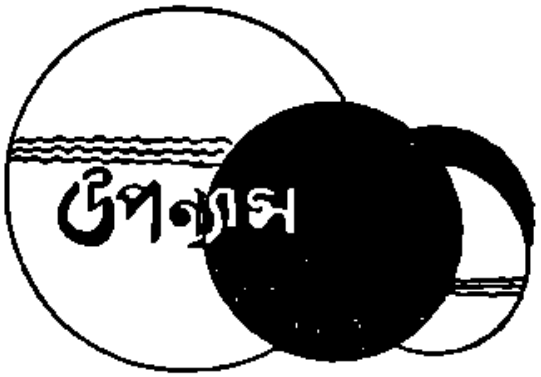

কৃষ্ণকলি

শ্রীকণপ্রভা ভাদুড়ী

[৩]

সেদিন সন্ধ্যাবেলা সোমনাথ বাবু পদ্মাসনে বসে আবৃত্তি করছিলেন, শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর :

কা তব কান্তা, কস্তে পুত্র
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্র"—

এমন সময় কল্পা তার একখানি পত্র হাতে নিয়ে এসে বললে—"বাবা তোমার চিঠি"—ধ্যান ভঙ্গ করে সোমনাথ বাবু বললেন, "তুই পড় মা, আমি শুনি"—তার খাম খুলে দেখল, তার মা লিখেছেন। পত্রের সারাংশ তার পাঠ করে পিতাকে শোনালো। রামনগরের জমিদার শ্রীযুক্ত নারায়ণ চৌধুরী সূর্যাকে দেখে অত্যন্ত পছন্দ করেছেন; তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীমান শঙ্করের সাথে সূর্যার বিবাহ দিতে চান। আপনার অনুমতির জন্য শীঘ্রই আপনার কাছে পত্র দেবেন। ছেলে মেয়ে উভয়েরই যদিও নিতান্ত অল্প বয়স; তথাপি শুভ কার্য বিলম্বে করার তাঁর মত নেই। বিবাহের পরে ছেলেকে উচ্চশিক্ষার্থে বিদেশে প্রেরণ করা হবে। কমলা দেবীর অত্যন্ত ইচ্ছা সূর্যার এখানে বিবাহ হয়; এখন সোমনাথবাবুর মত হলেই তিনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন।" পত্রপাঠ শেষ হলে তার পিতার মুখের পানে চাইল। "সূর্যার বিয়ে, এ যে আমি ভাবতে পারছি না তার,—তোর কি মনে হয়; এত বড় ঘরে, আমাদের কাজ করা কি সুখের হবে?" সোমনাথ বাবু বললেন। কিছুক্ষণ নীরব থেকে তার বললে,—"এতো তোমার ছেলের বিয়ে নয় বাবা, মেয়ের বিয়ে; ওরা নিজেরা যখন আগ্রহ প্রকাশ করেছে, তখন টাকা কড়ি ছাড়া বিশেষ কিছু নাও লাগতে পারে। আর বাবা, সুখ দুঃখ সব নিজ নিজ কপালে হয়। সূর্যার কপালে সুখ থাকলে ও ওই ঘরেই সুখী হবে"—

সোমনাথবাবু বললেন—"বেশ তবে তুই লিখে দে আমার নাম করে, যে আমাদের এ বিয়েতে কোনও অমত নেই"—

তারপর শুক্লা দ্বাদশীর এক মাধবী রাতে সূর্যার সাথে শঙ্করের বিবাহ হয়ে গেল। ফুলশয্যার দিন শঙ্করদের বিরাট বাড়ী লোকে লোকারণ্য হয়ে গেছে। বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে সুসজ্জিতা রূপসী সূর্যাকে দেখাচ্ছে ঠিক ইন্দ্রাণীর মত। রাত্রি জাগরণে অনভ্যস্ত বালিকা পুষ্প শয্যায় নিদ্রামগ্ন হয়ে রয়েছে। যদিও বাড়ীতে তখনও উৎসব পর্ব শেষ হয়নি। একটী ঘরে শঙ্করকে ঘিরে বসে তার সমবয়সীরা গ্রামোফোনে রেকর্ড বাজাচ্ছিল; এমন সময় কৃষ্ণা সেখানে ঝড়ের মত প্রবেশ করে বললে,—"শঙ্কর তোমার কাছে একটা টর্চ আছে?"

শঙ্কর বললে,—"আছে, কিন্তু তোমার কি দরকার?"

একটা দরকার আছে; তোমাদের পুকুর পাড়ে একবার যাবো আমরা কয়েকজন মিলে; সেখানে নাকি লাল হাঁস আছে?" কৃষ্ণা বললে। "তা আছে" শঙ্কর বললে,—"কিন্তু রাত্রে দেখার জন্য এত তাড়া পড়ল কেন?" অধৈর্য হয়ে কৃষ্ণা বললে,—"জানিনে যাও, তুমি দেবে কি না বল?" শঙ্কর গানের আসর ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—"এস, আমার সঙ্গে,"—ঘর থেকে বেরিয়ে তারা, বারান্দা অতিক্রম করে, সিঁড়ি বেয়ে চাতালার ছাদে এল। সেখানে একটী চিলে কোঠায় প্রবেশ করে, বহু অব্যবহার্য সামগ্রীর মধ্য থেকে একটী সিন্দুক খুলে টর্চ বার করে শঙ্কর কৃষ্ণাকে দিল। টর্চ হাতে নিয়ে কৃষ্ণার আনন্দ আর ধরে না। হাতে নিয়ে নানাভাবে নেড়ে দেখে, সে বললে, "আমায় এটা দিয়ে দেবে শঙ্কর?" শঙ্কর দেখল তার কালো চোখ দুটী আশায় কাঁপছে; ওর তারী মায়া হোল;

তারী ত একটা টর্চ সেটা চাইতে এত লজ্জা কিসের? সে বললে,—"হাঁ, তুমি নাও ওটা।"

টর্চ নিয়ে ঝুলা নাকাতে নাকাতে নীচে নেমে গেল। পনেরো বছরের কিশোর, শঙ্কর, পঁচিশ বছরের তরুণের মত ছায়ের আলিসা ধরে অন্ধকারের পানে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নীচে যে উৎসব মুখর যাদবী রাত্রি তার জন্ম অপেক্ষা করে আছে, সে কথা সে সম্পূর্ণ রূপে বিস্মৃত হয়ে জ্যোৎস্না উজ্জ্বল নক্ষত্র শোভিত আকাশের পানে চেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। সেখানে স্বর্ণময়ী হুরবৃন্দ, তারকা রাজির বিন্যাসের মধ্যে সে পুষ্করিণীতে সন্তরমানা লাল হাঁসের প্রতিচ্ছবি, দেখতে পেল কিনা কে জানে?

[৪]

তারপর কিছুদিন অতীত হয়েছে। শঙ্কর ম্যাট্রিকুলেশনে কঠিন টেক্কনলজি দিয়ে, প্রায় পাঁচ বছর বাদে স্বদেশে ফিরে আসে। ওর মনে বাসনা ছিল, নিজের দেশের গ্রামে একটী আইনীয় বস্ত্র উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার। কিন্তু সহসা দেশ বিভাগের জন্ম ওর সে আশা বাস্তবে পরিণত হয়নি। ও বাধ্য হয়ে কোলকাতার উপকণ্ঠে ঘুঘুরি নামক পল্লীতে, ওর পরিকল্পনানুযায়ী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। ওকে সাহায্য করার জন্ম এগিয়ে আসে ওর প্রিয় বন্ধু রঞ্জন। সেই কিশোর শঙ্কর আজ বয়সে তরুণ হলেও; তাঁর কৈশোরের সেই স্বপ্নবিলাস ভাবটী, আজও ওর সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। কাজ কর্মে অত্যন্ত উৎসাহী হলেও,সে সময়ান্তরে নিতান্ত একা থাকতেই যেন ভালোবাসে। একদিন রঞ্জন বললে, "শঙ্কর, আমি একটি ভালো বাড়ীর সন্ধান পেয়েছি; তুমি যেয়ে গিয়ে, মাসীমা আর বৌদিকে নিয়ে এস।" কয়েক বৎসর আগে শঙ্করের পিতৃবিয়োগ হয়েছে।

"মা কি আসবেন?" শঙ্কর চিন্তিত স্বরে বললে; "সুধাকে হয়ত পাঠিয়ে দিতে পারেন? কিন্তু মাকে একলা ফেলে ওকে নিয়ে আসা কি উচিৎ হবে ভাই?" রঞ্জন বললে,—"এখন ত না আসার কোনও কারণ দেখিনা। তবে ভিটের মায়া ছাড়তে না পেরে যদি তিনি একান্তই না আসেন তবে তুমি বৌদিকেই নিয়ে এস—কেন না, তুমি একজায়গায় থাকবে, তিনি, আর একজায়গায়, এটা আমার কাছে ভালো লাগেনা শঙ্কর; তুমি একবার যেয়ে যাওই না; দেখবে কেমন একলা আসতে পারো?" রঞ্জন কো হো করে হেসে উঠল। শঙ্কর সলজ্জ ভাবে বললে, "তুমিও চল ভাই, আমার সঙ্গে"—

রঞ্জন তার পিঠে হাত দিয়ে বললে, "সে কি হয় পাগল? দুজনে মিলে গেলে তোমার চেয়ে আমারই বেশী আনন্দ হোত; কিন্তু এদিকে কাজকর্মের ক্ষতি হয়ে যাবে। দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা কি রকম দেখছ ত? সকলেই সকল সময় যেন ক্ষেপে রয়েছে। এখন অতি সতর্ক হয়ে আমাদের কারখানা চালাতে হবে বুঝলে ভাই?"

শঙ্কর সম্মতি জানিয়ে বললে,—"আচ্ছা তবে আমি একবার দেশ থেকে ঘুরে আসি"—

আহারের পর বারান্দায় বসে একটী বৃদ্ধা হরিতকী সেবন করছিলেন। নির্জন দ্বিপ্রহর; পুকুর পাড়ে একটী পুষ্পিত বাতাবী লেবুর শাখায় বসে উদাস একটানা সুরে ডাকছে একটি ঘুঘু। তাঁর অদূরে অঙ্গনে মঞ্জরিত তুলসী মঞ্চের পানে চেয়ে বৃদ্ধা একটী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন। হায় তিনি যখন আর বেঁচে থাকবেন না; তখন তাঁর এই তুলসীগাছের কি অবস্থা হবে? প্রত্যহ প্রত্যুষে কেই বা তাঁর মূলে জল সেচন করবে; আর কেইবা, সন্ধ্যা বেলায় প্রদীপ জেলে তাকে বরণ করবে! তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই বিরাট প্রাসাদের উপরও মৃত্যুর যবনিকা ঘনিয়ে আসবে। এমন সময় শঙ্কর এসে তাঁর পাশে বসে ডাকলে, "মা" সচকিত হয়ে বৃদ্ধা বললেন,—"খোকা; তুই ঘুমোসনি? কি বলছিস রে?"

"আমি কেন এবারে এসেছি জান মা;" শঙ্কর বললে, "তোমার আর সুধাকে কোলকাতায় নিয়ে যেতে"—

বৃদ্ধা মনে মনে আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এই আতঙ্কের কালছায়াই বুঝি এতক্ষণ অলক্ষ্যে থেকে তাঁকে ভয় দেখাচ্ছিল। তিনি বললেন—"বৌমাকে নিয়ে যাবি সেত খুব ভালো কথা; আমারও ত তাই ইচ্ছা"—

"আর তুমি?" শঙ্কর বললে। "আমার কথা ছেড়েদে বাবা," বৃদ্ধা বললেন, "কবে আছি, কবে নেই,

তার ঠিক কি ; তার উপর মা মেয়ের অবস্থা ; আমার আর ভিটে ছেড়ে গিয়ে লাভ কি ?"

"সে কি কথা মা ?" শঙ্কর বললে, "তুমি না গেলে, আমি সুধাকেও নিয়ে যাবো না।" বৃদ্ধা ব্যথিত স্বরে বললেন,—"খোকা আমার কথাটা শোন ভালো করে ; আমি কোলকাতায় গেলে ; বাবুন চাকরেরা আমার গৃহদেবতার পূজায় জোগাড় করবে ; তুলসী তলায় প্রদীপ দেবে এটা কি তোর পক্ষে, মঙ্গলকর হবে ? তোর পিতা প্রপিতামহের পুণ্য স্মৃতি মাখা এই প্রাচীন বাস্তু ভিটে ; তারা কি আমায় মনে মনে অভিশাপ দেবে না ? তুই কি চাস্ বাবা, তোর দুঃখী মায়ের শেষ জীবন অভিশাপে জর্জ্জর হয়ে ওঠে ?"

মায়ের মুখের দিকে চেয়ে শঙ্কর বললে,—"আমায় ক্ষমা কর মা ; আমি এতটা ভেবে দেখিনি।"

অতি মধুর ভাবে মা একটুখানি হাসলেন ; ছেলের মাথায় সস্নেহে হাত দিয়ে বললেন,—"পাগল ছেলে, এখনও ঠিক আগের মতই আছে ; হাঁরে এই পাগলামী তরা মাথা নিয়ে তুই কি করে এত বড় বড় কাজ করিস, আমি ত ভেবে পাইনা ?" কৃত্রিম অভিমান ভরে শঙ্কর বললে,—"হয়েছে ; তুমি যে ছেলেকে কত ভালোবাসো সেটা খুব বোঝা গেছে। তোমায় এখানে ফেলে, আমার দূরে থাকতে বুঝি কষ্ট হয় না ?"

"বৌমাকে সঙ্গে নিয়ে যা বাবা, দেখবি মনে কোনও দুঃখ থাকবে না, আর আমিও তাতে সত্যিই সুখী হবো, তোদের সুখেই ত আমার সুখ খোকা"। শঙ্কর মনে মনে বুঝতে পারল, যে তার মায়ের মত পরিবর্ত্তন হবার নয়। নিজের সুখের জন্য তাঁকে শেষ জীবনে কষ্ট দেওয়াও ওর উচিৎ নয় ; তাছাড়া মায়ের আদেশ অমান্য করার ক্ষমতাও ওর নেই। অগত্যা এ যাত্রায় ওকে সুধাকে সঙ্গে নিয়ে যেতেই হবে; কিন্তু সুধার মনোভাব এখনও ওর জানা হয়নি। আর মা ভাবছেন শঙ্করের পানে চেয়ে ; এই ত সেদিনের কথা, এই ছেলেটী কত অসহায় ভাবে তাঁর কোলের মধ্যে শুয়ে থাকতো ; তাঁর সেদিনের সেই ছোট্ট কোল, আজ তাঁর ছেলের চারিপাশে যথেষ্ট বিস্তৃত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ; ছেলে তাঁর যেখানেই যতদূরে থাকনা কেন, তিনি সকল সময় উপলব্ধি করেন, তাঁর খোকা তাঁর কোলের কাছেই আছে।

ধীরে ধীরে অপরাহ্নের ছায়া দীর্ঘতর হয়। পুকুর পাড়ে যাতায়াতী লোকের কাছে মুখর ভাব আর শোনা যায় না। বাতাসে ভেসে আসে লক্ষ কোটা কৃষ্ণ কলির গন্ধ। উঠান আলো করে ফুটে উঠেছে অজস্র কৃষ্ণকলি ফুল। গাছের নীচে ঝরে পড়েছে অজস্র শুকনো ফুল আর পাতা। সেইদিকে চেয়ে মা আর ছেলে পাশাপাশি বসে আছেন ; যেন বিশ্বশিল্পির হাতে আঁকা একখানি চিত্র।

সেদিন রাত্রিবেলা নিজ কক্ষে প্রবেশ করে শঙ্কর দেখল, জানালার গরাদ ধরে সুধা নীরবে দাঁড়িয়ে আছে। ঠিক যেন একখানি ছবি ; শঙ্করকে দেখে সে এক হাতে মাথার শরীর আঁচল খানি তুলে দিল। শঙ্কর আশা করছিল, কৃষ্ণার মত সুধাও ওকে দেখে ছুটে কাছে আসবে ; কিন্তু সময়ে সঙ্কুচিতা সুধা তা এলনা। শঙ্কর ধীরে ধীরে, ওর নিকটে গিয়ে কাঁধে হাত রেখে, ডাকল,—"সুধা !"

সুধার সমস্ত দেহ মন আনন্দে থর থর করে কেঁপে উঠল। ও হাসিমাখা চোখদুটী শঙ্করের মুখপানে ক্ষণতরে তুলে ধরেই আবার নত করল। শঙ্কর বললে,—"এতদিন পরে এলুম গল্প করবে না ?"

সুধা ঘাড় নেড়ে বললে, "হাঁ"—শঙ্কর বললে,—"এস"—সুধা জানালার গরাদ ছেড়ে শঙ্করের দিকে ফিরতেই দুটী সবল বাহু তাকে সাবেগে আকর্ষণ করে নিজ বক্ষে ধারণ করল। তার কাণে কাণে কে যেন, মৃদুস্বরে বললে,—"এখন ঘুমোবে, না গল্প করবে ?"

ঘুম ! সুধা মনে মনে কেঁপে উঠল। এতদিন প্রত্যহই ত ও নিদ্রাহীন দীর্ঘ রাত্রি অতিকষ্টে যাপন করেছে ; আবার সেই বিরক্তিকর ঘুমের প্রসঙ্গ ! দুই হাতে শঙ্করের কণ্ঠ বেষ্টন করে ও বললে,—"না ঘুম নয় গল্প"—

"বেশ তবে চল ছাদে যাই ; একটা পাটী নিয়ে চল"—শঙ্কর বললে। শুক্লা দ্বাদশী রাত্রের চাঁদ, নারিকেল গাছের ঘন সারির পিছন দিয়ে কখন যে অস্ত গেল সেদিকে ওদের খেয়াল নেই। ওরা গল্প করছে ; বর্ত্তমানের আনন্দ

ভবিষ্যতের আশা; অতীতের নিরাশা; সবের মিশ্রণে তাদের অনুভূতি প্রগাঢ় বর্ণাঢ্যময় হয়ে উঠেছে; কাজেই বস্তু জগতের কথা স্মরণে থাকবার কথা নয় তখন তাদের। শঙ্করের ঠাকুর বাড়ীর পিছনে, হিজল বনের মধ্যে একসময় তীক্ষ্ণকণ্ঠে একদল নিশাচর পাখী রাত্রির তৃতীয় প্রহর ঘোষণা করতেই, তাদের অকস্মাৎ স্বপ্নভঙ্গ হোল। শঙ্কর বললে, "চল সূর্য্য, এবার নীচে যাই; তোর হতে খুব বেশী নেই"—উঠে বসে শ্রদ্ধা বসন সংযত করতে করতে সূর্য্য বললে,—"হাঁ। চল; মা আবার রাত থাকতে উঠেন; ঠাকুর বাড়ীতে যান"—

দিতলে নিজ কক্ষে এসে শঙ্কর শয্যায় শুয়ে পড়ল এবং অচিরে নিদ্রাময় হোল। সূর্য্যর চোখে কিন্তু ঘুম নেই। ও নিজ শয্যায় শুয়ে শুয়ে; কল্পনায় নানা রংএ রঞ্জিত করছিল; তাঁর জন্মভূমি কলকাতার দৃশ্যাবলী। অন্ধ পুলকে ওর সমস্ত মন ক্ষণেক্ষণে উত্তাল হয়ে উঠছিল; কতদিন পর ও আবার কোলকাতায় যাবে। কতদিন ও পিত্রালয়ে যায়নি। বহুকে পিত্রালয় প্রেরণ শঙ্করের বংশের নিয়মবিরুদ্ধ কাজ। বিশেষ প্রয়োজনে অবশ্য যাবার নিয়ম আছে। সেই বিশেষ নিয়মানুসারে যথাক্রমে, সূর্য্য তার স্নেহময়ী দিদি ও দাদুর মৃত্যুর পরে দুইবার পিত্রালয়ে গিয়েছিল। তারপর কোনও বিশেষ ঘটনা না ঘটায় ও আর শ্বশুরালয়ে ত্যাগ করেনি। কৃষ্ণাকে কত দীর্ঘ দিন দেখেনি; ছোট বোনটী না জানি, কতবড় হয়েছে? আর পিসিমা; কত ভালোই না বাসতো সূর্য্যাকে? আর বাবা, মা; সূর্য্যর চোখ ছলছল করে উঠল; মাতো স্বর্গে গেলেন, কিন্তু বাবা? কোথায় গেলেন তিনি? হায়, হায়, সুখ দুঃখের স্মৃতি জড়ানো শৈশবকাল, মানুষের জীবন থেকে কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে কি করে খসে যায়, কেউ জানতে পারে না—কিন্তু মনের যৌন্ গোপন গুহায় যে সঞ্চিত রেখে যায়, তার খেলা ঘরের দুর্লভ সামগ্রী, মানুষ জীবনে কোনও দিন তার কথা বিস্মৃত হয় না।

কোলকাতা যাত্রার আর বেশী দিন বিলম্ব নেই। সূর্য্যর সব গোছগাছ করা হয়ে গেছে। এখন গাড়ীতে উঠতে পারলেই হোল। শঙ্করের মায়ের কিন্তু কাজের আর বিশ্রাম নেই। কোলকাতায় চালের অত কষ্ট, অথচ এখানে শঙ্করের নিজের জমীতে কত ভালো ধানের ফসল হয়। সন্তান না খেলে, তিনি কোন প্রাণে সেই গোপাল ভোগ চালের ভাত মুখে তুলবেন? শঙ্কর তাঁকে বুঝিয়ে কিছুতে নিরস্ত করতে পারেনা, যে দেশের বাইরে চাল নেওয়াদেওয়া করা রীতিমত আইন বিরুদ্ধ কাজ। একবার ধরা পড়লে সোজা শ্রীঘরে চালান যেতে হবে। তিনি বস্তা বস্তা চাল গোপনে যাবেনই পুত্রের সঙ্গে। আরও কত যে খাদ্য বস্তু তার সীমা সংখ্যা নেই। মা নিজে হাতে যেন গুছিয়ে দিচ্ছেন। হায়রে মায়ের প্রাণ, সান্ত্বনা আছে, কিন্তু মতি নেই শুধু সন্তানের কল্যাণ চিন্তায়। [ক্রমশঃ]

কালান্তর

(গল্প)

শ্রীমতী অরুণা কর্ম্মকার

মহুয়া ফিরে এলো দীর্ঘ দিনের পর। শূন্য ঘরের সামনে থমকিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। নেই, কেউ নেই। একটি মাত্র তুফানের ধাক্কা সব কিছু ভেঙে চুরে ওলোট-পালট ক'রে দিয়ে গেছে। ঘরের দরজাগুলো হা-হা কোরছে, ধূলি মলিন মেঝের ওপর পশু-পাখির অসংখ্য পদচিহ্ন আঁকা।

কালান্তরের সাক্ষ্য নিয়ে ভাঙা ঘরটি দাঁড়িয়ে আছে আজও। মৃত-অতীতের শবদেহ, জীর্ণ বিকৃতিগ্রাস। মহুয়া অনেকক্ষণ নতমুখে অনিমেষে মায়া-ভরা ঘরখানার দিকে চেয়ে রয়েছে। তারপর খুঁটিতে হেলান দিয়ে ট্রাঙ্কের ভেতর থেকে একটি মলিন ফটোগ্রাফ টেনে বার করলো। ফটোগ্রাফের নীচে লেখা 'আমি আর মনু।'

ব্যথা, বেদনা আর ব্যর্থতার তার অনুভূতির আধারে কেবল আবর্তের সৃষ্টি হোলো। ঘরেতে কেউ নেই, সবই যেন হারিয়ে গেছে এই বিরাট পৃথিবীর লোক যাত্রার মাঝে। খুঁজেও পাওয়া আর যাবে না। আজ থেকে তা'র একক জীবনের বিস্তীর্ণ পথে যাত্রা সুরু। সংকীর্তির পুনরাবৃত্তি। বৈচিত্র্যহীন। আর কিছু করবার নেই।

অন্তরের দেবতা কাঁদতে পারে না। কথাও সে বলে না। শুধু প্রাণের বেদনা প্রাণেই গুমরে ওঠে। একটা আম গাছের মগডালে ব'সে একটা কাক একটানা রবে ডেকে চলেছে। সম্মুখে রৌদ্র-দগ্ধ পথ। উদাসীন বৈরাগী।

অর্থহীন ভাবে একটানা কত কি ব'কে যায় সে। কেউ কিছু তা'র, অর্থ বুঝতে পারে না। ঘোলা চোখ মেলে সে শুধু চেয়ে থাকে। একটা নৈর্ব্যক্তিক ঔদাসীন্যে সমস্ত শরীর মন আচ্ছন্ন হয়ে যায়। গ্রামের পড়শীরা তা'কে অনেক করে বোঝাতে লাগলো, কিন্তু মাঝে মাঝে কানে যায় অসংলগ্ন গুটি কয়েক কথার টুকরা। হয়তো ক্ষণিকের জন্য—এক মাহূর্তিক উত্তেজনায় তা'র জীবন যৌবনের দুই প্রান্তে কিসের শিখা জ্বলে ওঠে। হয়তো তার মনোজগতে কিসের একটা বিপ্লব ঘটবার আশঙ্কা হানা দিয়ে যায়।

দুঃখের পাত্রে বেদনার অশ্রু জল টলমল করে ওঠে। সহসা মনে পড়ে যায় জীবনের সুদীর্ঘ পথটি যে যন্ত্র বেলার ওপর দিয়ে চলে আসছে। ক্যাপা অন্তর আজ তাই তৃষ্ণায় আর্তনাদ কোরে উঠছে বুঝি।

সে চেয়ে দেখলো বর্তমান আর ভবিষ্যতের পানে। নেই, কোথাও এতটুকু ছায়া, নেই একটু শ্যামলিমা, একটু স্নিগ্ধতা, সর্বত্র উষর এক বিকট বালুবেলা। শুধু একক জীবনের পুনরাবৃত্তিময় ক্লান্তিকর অনুভূতি। কিন্তু তা ক্ষণিকের। সে উত্তেজনা পরক্ষণেই আবার নিবিকার শান্তিতে লয় পেয়ে যায়। তখন ঘোলা নিষ্প্রভ চোখ মেলে সে শুধু চেয়ে থাকে।

মহুয়া ক্ষুব্ধ মনে পথে পা দিয়ে সুরু করলো চলা। কি ভেবে আবার ফিরে আসে। অন্তর প্রেরণা জোগায় তার সংশয় জড়িত মনের দোদুলে। মন ঠাকা হ'য়ে যায়। দূরে বহু দূরে চলে যায় এক লাবণ্যবতী তরুণী মুবতী। বেণীবিলম্বিত দীরঘ অলকগুচ্ছ উন্নত বক্ষের ওপর দুলছে মৃদু মন্দ। কানের দোদুল্যমান হীরক দুল জোড়া উজ্জ্বল আলোক সম্পাতে চিক্‌চিক্ কোরছে। ওষ্ঠাধরে মধুমিক হাসির শুভ্র ইংগিত।

দীর্ঘায়িত নিমিলিত চোখের কোণে আর অতঙ্কিত ভ্রূবিলাসে এক অদ্ভিম আহ্বান থর্ থর্ কোরছে। চোখ ফিরাতেই দেখলো সে মহুয়াকে। এগিয়ে এলো তার দিকে। পদপ্রান্তে শোভিত অপরূপ চরণ, প্রতিটি পদক্ষেপে তা'র আভিজাত্যের ছাপ।

কমনীয় বাহু দুটি তুলে লীলায়িত ভঙ্গিমায় মহুয়া ছোট একটি নমস্কার জানালো। অতীত আর বর্তমান। তারই সন্ধিস্থলে একবিন্দু কালের ওপর দাঁড়িয়ে এক অপ্রমত্ত অপ্সরী রমণী। সব মিলিয়ে অপরূপ অনির্বচনীয়। অত্যাধুনিক আভিজাত্য সম্প্রদায়ের এই বুঝি রুচি! কথাটা ভেবে মহুয়া একটু মুসড়ে পড়ে।

সহসা একটা প্রচণ্ড কি যেন আঘাত লাগলো। এই অপ্সরী রমণীটির মনে কপালের শিরাগুলি দপ্‌দপ্ কোকে ওঠে এক মুহূর্তে। পায়ের নীচে মাটিতে একটা দীর্ঘস্থায়ী কম্পন সুরু হলো। ধীরে ধীরে নিজের মনেই নিজেকে সামলে নিলো সে। অনেক ইতিহাস, অনেক অনুশাসন আর ব্যথা সঞ্চিত হোয়ে রোয়েছে এর পেছনে।

সে ভুলে ছিলো তার শৈশব স্মৃতিকে, কিন্তু মহুয়ার এই অবস্থা দেখে সেই স্মৃতিটি যেন আবার ফুটে উঠলো। ভ্রূযুগলের ওপর কয়েকটা রেখা তা'র কুঞ্চিত হোয়ে আসে খানেক। ঠিক তারও তো এ রকম একক জীবনের ভিত্তিমূল হ'লে যাচ্ছিল। নিশ্ছিদ্র মেঘাবৃত কালো আকাশের কোণে কোণে বিদ্যুত-বহ্নি বিলিক দিয়ে ওঠে।

সে ভেবে নিয়ে—মহুয়াকে বললো—"আমায় মাপ করো ভাই!" জীবনের পথে তোমাকেও দাঁড়াতে হবে, মানুষের মতো মানুষ হ'য়ে বাঁচতে হবে। আমিই তোমায় পথ দেখিয়ে দেবো।

শিশুমঙ্গল সমিতির মাধ্যমে মহুয়া দেশের ও দশের

সেবার আত্মনিবেদন করলো অপরীর সহায়তায়। তা'র সেই লোহিত বেশর শুভ্র হিমস্থিত বাহুযুগ আর স্বর্ণ কঙ্কণের ঝনৎকার আর আভিজাত্যের সুরে বাজে না। সেও তারি সাথে সুর মিলিয়ে দিলো।

কালের সঙ্গে ঘুরে গেল অপরীর গতি। তার কপালের পাশের শিরাগুলি মিলিয়ে গেল, দু'হাতে টিপে ধ'রে থাকবার প্রয়োজন হোলোনা। তা'র হাসি আর মহানন্দের খুশীতে মন উত্তুলে উঠ্‌লো।

তখন শুধু দিন যায় রাত্রি আসে, কালচক্রের ঘূর্ণন থামতে হয় না। একই দিকে বহুরা আর সে।

নবান্ন

শ্রীপ্রভাবতী ভট্টাচার্য্য

চৈত্রের কাঠ-কাটা রোদে নিজেকে দগ্ধ করে কঠিন মাটীর বুকে কোদাল চালিয়ে যায় কৃষক। চলে বৈষয়িক ফসলের প্রস্তুতি। আগুন-ঝরা সূর্যের কিরণে ঝলসিত আকাশের দিকে তাকায় সে ক্লান্ত দৃষ্টি নিয়ে—কোথাও মেঘের রেখা পড়েছে কি-না।

পল্লীর কিশোরী মেয়েরা করে মেঘ রাজার ব্রত। গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে কৃত্রিম বৃষ্টি নামায়। সে সকল গানের মধ্য দিয়ে তারা মেঘের কাছে জানায় আকুল মিনতি এক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য। সে গানগুলো আজ আর সম্পূর্ণ মনে নেই। স্মৃতির খাতায় খুঁজে পেলাম ক'টা কলি তাই তুলে দিচ্ছি :—

কানা মেয়ারে ভাই—
ঘুটি ঘুটি জল দে
ছাপাটি খেলাই।
কানা মেয়ার ভাঙ্গা ঘর—
বিষ্টি নামে আড়াই পর।

বৃষ্টি নামে। কৃষকের শিশুরা কাঁপা কাঁপি করে বৃষ্টির জলে। কৃষাণীর মুখে ফুটে উঠে হাসি। কৃষকের উজ্জ্বল দৃষ্টি হতে ঝিকরে পড়ে আশার আলো। ক্ষেতে শুরু হয় হাল-চাষ। বুনে দেয় অঘ্রাণী ধানের বীজ!

তারপর আসে কাল বৈশাখীর ঝড়! শুধু প্রকৃতির বুকেই না কৃষকের জীবনেও। চাউলের মূল্য বাড়তে থাকে হু হু করে। জ্যৈষ্ঠের দাবদাহে কৃষক পরিবারে পড়ে করাল দুর্ভিক্ষের ছায়া।

আষাঢ়ের বৃষ্টিতে বেড়ে উঠে আমন ধানের চারা। আবার চলে রোয়া ধানের প্রস্তুতি আষাঢ়ের পঙ্কিল জমির উপর। হেমন্ত আরো কত দূরে—শ্রাবণ রাতে শুয়ে শুয়ে ভাবে কৃষক বধূ।

বর্ষার অঝোর বৃষ্টি ধারায় মেঘদূতের কলি মনে পড়েনা কৃষকের—সে আতঙ্কিত হ'য়ে ভাবে না জানি বান ডেকে ভাসিয়ে নিয়ে যায় ধান ক্ষেত। তাই ভোর হ'তেই ডিঙ্গি নিয়ে ছুটে যায় সে ক্ষেতে। বৃদ্ধ হাওয়ায় মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ধান গাছগুলো যেন ভরসা দেয় কৃষকে—না গো না বানের জলে ভেসে যাইনি। এই দেখো আজকে আরো কত বড় হ'য়ে উঠেছি। তোমার নবান্নের উৎসবে নিজেদের উৎসর্গ করে ধন্য হবার আশায় পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠি পলে পলে।

জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে উঠে আমন ধানের চারা ভাদ্র মাসে রোয়া ধানের চারা পুতে কৃষক। অনেকটা জাপানী পদ্ধতিতেই করা হয় রোয়া ধানের চাষ। তাই তিন মাসেই এর ধান পেকে যায়।

শিষের বুক চিরে নামে সবুজ ধানের গুচ্ছ। কচি ধানের দুধ খাওয়ার লোভে ছুটে আসে পক্ষপালের ঝাঁক!

জল-ভরা ক্ষেতের মধ্যে মাচা বেঁধে, তার উপরে বসে সারাদিন টিন বাজায় কৃষকের ছেলেরা। টিনের কর্কশ শব্দ শুনে পালিয়ে যায় শত্রু বাহিনী। এমনি করে মাসের পর মাস পাহারা দিতে হয় ধান না পাকা অবধি।

হেমন্তের বরণ-ডালা সাজাতে আসে সীমন্তিনী শরৎ

সুখময়ী। দিগন্ত মুখরিত করে বাজে আনন্দের বেণু। ধানের ভারে লুটিয়ে পড়ে গাছগুলো। পল্লী লক্ষ্মীর সবুজ অঞ্চলে ঝলমল্ করে সোনালি আভা।

সুদীর্ঘ প্রত্যাশার শেষে স্বর্ণ মুকুট মাথায় নিয়ে আসে হেমন্তের সুপ্রভাত। নতুন বরণ ধানের গায়ে মিলিয়ে যায় সোনালি রোদ। শুভদিনে ধান ক্ষেতে কাজে লাগায় কৃষক। প্রথম যে ধান কেটে আনে তাই তুলে রাখে কৃষক বধূ নবান্নের জন্য।

পাঁজি দেখে নবান্নের দিন ধার্য হয়। রাত্রি শেষে উঠে নতুন ধান আনে কৃষাণী। পিঠে তৈরীর জন্য করে নতুন চালের গুড়ো।

এল নবান্নের সুনির্দিষ্ট দিন। ব্রাহ্মণ, আত্মীয় পরিজন ও পাড়া-পরশীদের করা হয় নিমন্ত্রণ। বাড়ীর মেয়েরা আয়োজন করে ব্যস্ত সমস্ত হয়। নতুন ধানের চাউল, নতুন গুড় ও নতুন উঠা ফল দিয়ে সাজানো হয় নৈবেদ্য; চাউল বেটে, নারকেল ও খেজুর গুড় সহযোগে তৈরী করা হয় চাল-জল। এটি নবান্নের একটি বিশেষ উপকরণ। খেতেও অতি উপাদেয়। মহাসমারোহে রন্ধন হয় নানাবিধ ব্যঞ্জন। তা ছাড়া তৈরী হয় খেজুর গুড় দিয়ে নতুন চালের পায়স ও হরেক রকম পিঠে।

পুরোহিত এসে বসলেন পূজোর আসনে। বেজে উঠে কাঁসর-ঘন্টা উলুধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠে পল্লী। প্রথমতঃ ব্যস্ত পুরুষের পূজো হয়। তারপর ষড়েশ্বর শ্রীবিষ্ণুর পরে ভূস্বামী অর্থাৎ দেশের রাজাকে উদ্দেশ্য করে পূজো দেওয়া হয়। সর্বশেষে বাড়ীর কর্তা পূর্ব পুরুষদের নতুন চালের পিণ্ড দান করেন। এ হ'ল শাস্ত্র বিধিমতো নবান্ন উৎসব। পূর্বে পল্লীর প্রতি গৃহে এ ভাবে নবান্ন হতো। কিন্তু এখন আর এ রকম শাস্ত্রবিধি সম্মতভাবে সকলে নবান্ন করতে পারে না। তবে লক্ষ্মী নারায়ণের পূজোর মাধ্যমে আজও গ্রামে প্রত্যেক বাড়িতেই অনুষ্ঠিত হয় নবান্ন উৎসব।

শুধু হিন্দুদের মধ্যেই নয়, মুসলমান কৃষকেরাও এ সময় নতুন ধান উঠলে একটা উৎসব করে। তাকে বলে—দাওয়া বাড়া। ক্ষেতের ধান কাটবার সময় ধানশুদ্ধ খানিকটা জমি রেখে দেয়া দাওয়া বাড়ানোর জন্য। নির্দিষ্ট দিনে সব মজুরদের নিয়ে সকলে মিলে খুব আনন্দ করে সে ধান কেটে আনবে। তারই চাউল তৈরী করে সেদিনই রাত্রিতে তা দিয়ে তৈরী করবে মেয়েরা পিঠে পায়েস। তারপর আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও মজুরদের নিয়ে এক সঙ্গে সকলে মিলে আহার করবে

বাঙ্গালির প্রায় সংস্কৃতির মধ্যে নবান্ন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। পল্লীবাংলার মানুষ দুর্গা পূজোর মতই নবান্নের জন্যও দিন গোণে।

আমার মনে হয় গ্রামের মানুষ সম্বৎসরের আর কোন উৎসবেই নবান্নের মতো পরিপূর্ণ মন নিয়ে আনন্দ করতে পারে না। কারণ নবান্নের দিন তাদের ঘরে থাকে গোলা ভরা ধান দীর্ঘ দিন কঠোর পরিশ্রমের পরে ফসল ঘরে তোলা যে কী আনন্দ—তা একমাত্র কৃষক ছাড়া আর কেউ তেমনটি বুঝবে না। বিশেষ করে যে ফসল বাঙ্গালীর প্রাণের ধারক। তাই ধান কৃষকের কাছে কল্যাণের প্রতীক লক্ষ্মীস্বরূপা নবান্ন পল্লীবাংলার প্রাণ-প্রাচুর্যময় স্বতঃস্ফূর্ত উৎসব।

মহিলা সমাচার

শ্রীমতী রমা মিত্র

ডাঃ কল্যাণী বাগচী পি. এচ. ডি (বৃটেন)

শ্রীমতী কল্যাণী বাগচী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কৃতিত্বের সহিত এম-এস-সি, পাশ করিয়া বিদেশী গবেষণামূলক বৃত্তি লাভ করিয়া ১৯৫৩ সালে আমেরিকার যুক্ত রাষ্ট্রে গমন করেন। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া বি. এড্ ডিগ্রী লাভ করেন। তাহার পর ইংলণ্ডে শিক্ষা সম্বন্ধীয় মনঃতত্ত্ব বিষয়ে গবেষণা করিবার জন্য গমন করেন। তিনি উক্ত বিষয়ে বৃটেন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডক্টর অফ্ ফিলজফী ডিগ্রী লাভ করিয়া সম্প্রতি ভারতে ফিরিয়াছেন।

বিহারীলাল গার্হস্থ্য বিজ্ঞান কলেজ উদ্বোধন

গত ২২শে জানুয়ারী ১৯৫৭ তারিখে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শতবার্ষিক উৎসবের অঙ্গ হিসাবে আলিপুর ব্লেয়ার হাউস প্রাঙ্গণে ডাঃ জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ কলেজের উদ্বোধন করেন। চীনেমাটির ব্যবসায়ী, বাগবাজারের স্বনাম ধন্য মোহন ঠাকুরের দৌহিত্র স্বর্গীয় বিহারী লাল মিত্র মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বার্ষিক ৪৮০০০৲ আট চল্লিশ হাজার টাকা দানের ব্যবস্থা করিয়া যান। সেই অর্থে স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করেন। গৃহস্থ মেয়েদের সাংসারিক কাজ শিক্ষা করিবার এবং স্বাবলম্বী হইয়া জীবন যাপনের নানা পন্থা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রদান করা হয়। কর্তৃতঃ ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মহাশয়ের প্রচেষ্টা কুমারী জ্যোতিপ্রভা দাসগুপ্ত এম, ই, এস্, (লীড্) এই বিদ্যালয়ের কর্মভার নিযুক্ত হন। গৃহ নির্মাণে ৫,৮৮,০০০৲ ব্যয় হইয়াছে। ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় ইহার ভিত্তি স্থাপন করেন ১লা আগষ্ট, ১৯৫৫ এ।

১ম এশিয়ার লেখক মহাসম্মেলনে মহিলা

গত ডিসেম্বরের শেষে নতুন দিল্লীতে, কিং এডওয়ার্ড রোডস্থিত নব নির্মিত "বিজ্ঞান ভবন"এ সমগ্র এশিয়ার লেখক-লেখিকা, কবি, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিকগণের এক আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিমূলক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলন যেমন নূতন "বিজ্ঞান ভবন" ও তেমনি অভিনব। ইউ, এন্, এস্ কোর অধিবেশনের জন্য নির্মিত, আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সকল রকম সুখ-সুবিধা আরামদায়ক করিয়া গঠিত।

এই সম্মেলনে "লেখকের স্বাধীনতা", "এশিয়া শ্রেষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ধারায় ভারতের অবদান," "লেখকদের জীবিকা ও ব্যবসা" প্রভৃতি গুরুতর বিষয় আলোচনার সহিত কবি সম্মেলন হয়। এই অনুষ্ঠান উদ্বোধন হয় বাঙলা ভাষার বাঙালী মহিলা কবি রাধারাণী দেবীর কবিতা পাঠ দ্বারা। নোবিল প্রাইজ প্রাপ্ত মহাকবি র‍্যাভাম জুলজিয়া জুলজিত তুমিষ্ঠ উদবেকী ভাষায় কবিতা পাঠ করিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন। এই সম্মেলনে বাঙলার মহিলা কবি রাধারাণী, বাণী রায়, বিভা সরকার, বীণা চক্রবর্তী ও সুলেখা সান্যাল যোগ দিয়াছিলেন। পাকীস্থানের যেমন মুসিয়া আমান যোসেনারা বেগম, মালিবের মিসেস্ ই আর্ত্তামিয়ান ও কবি নাইজার মিস্ কিজিমা মুবেল ও কবি মিসেস মফিজা হুসেন হেলেনা ওবসন, সুইডেনের এডিটা মারিয়া, চীনের ঔপন্যাসিক মিস্ পাইলাং, উত্তর কোরিয়ার মিস্ কং সাং যোগদান করিয়া আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেন। তাঁহাদের ভাষণ সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী, ফরাসী, উদবেকী, চীনা, রাশিয়ান ভাষায় তখন তখনই অনুবাদ করিয়া হেডফোন দ্বারা—মস্কোর ওকাদানা, উজবেকীস্থানের মিসেস্ মফিয়ান, চীনের দুই চীন মহিলা ইন্টারপ্রিটারগণ।

প্রথম দিনের ভারতে বিভিন্ন ভাষার লেখক সম্মেলন হুমায়ুন কবির ও অন্যান্য সদস্যের সভাপতিত্ব করেন। কাকা কালেলকার, পণ্ডিত পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর, রাজাগোপাল আচারিয়া, ডাঃ রাধাকৃষ্ণ মুসেলিয়ার ভাষণ দেন। রাষ্ট্রপতি স্বয়ং সকল লেখককে প্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়ন করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শতবার্ষিকী কনভোকেশনে কৃতি মহিলা

ভুবনমোহিনী স্বর্ণ পদক শ্রেষ্ঠ মহিলা লেখিকা রূপে ১৯৫৬ সালের জন্য শ্রীমতী গীতা দেবীকে প্রদান করা হইল। শ্রীমতী পূর্ণিমা সেনগুপ্ত বিজ্ঞান ডি ফিল্ ডিগ্রী পান। বি, এ পরীক্ষায়—লীলা রায়ের "পদ্মবতী" উষা আন্তানী (লণ্ডনে) "নগেন্দ্র" রেবর্ণএর অনিমা বসু "প্রতাপ চন্দ্র" ও উষা দেব "পেয়ারী চাঁদ মিত্র" উইমান্স কলেজের পাখি চক্রবর্তী "প্রসন্ন কুমার" প্রেসিডেন্সীর অরুণা মুখার্জি ও সাবিত্রী ভট্টাচার্য্য পদক পান।

বি, এস্, সি পরীক্ষায়—কটকের জ্যোতি চক্রবর্তী 'বাসন্ত' 'যোগমায়' 'পাচকড়ি' দেবী প্রসাদ' 'শান্তিরাম' পদক গুলি পান। প্রেসীডেন্সীর নন্দা চট্টোপাধ্যায় ও ইলা মুখোপাধ্যায় স্বর্ণ পদক পান।

লীলা লেকচারার পদে অপর্ণা দেবী

১৯৫৭ সনের জন্য "লীলা লেকচারার" কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মহিলাকেই দিয়াছেন। স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষের কন্যার স্মৃতিতে যে লীলা প্রাইজ ও "লীলা লেকচার" প্রবর্তন সৃষ্টি করিয়াছে তাহা যেমন জনপ্রিয় হইয়াছে তেমনি মনীষীগণ অলঙ্কৃত করিতেছেন।

বর্ত্তমান বর্ষে নির্ব্বাচনী কমিটি দেশবন্ধুর কন্যা শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবীকে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

পূর্ব্বে এই পদে :

১৯২৫ সালে অনুরূপা দেবী (ভারতের নারী), ১৯২৭—কালিদাস রায় কবিশেখর (মধ্যযুগে বৈষ্ণব সাহিত্য), ১৯২৯—কিতীমোহন সেন (বাঙ্গলার বাউল), ১৯৩১—অবেন্দ্র কুমার গাঙ্গুলী, ১৯৩৩—ডাঃ শ্রীযুক্তা রমা চৌধুরী, ১৯৩৫—উপেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহিলা ডি, লিট

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে উর্দ্দু অধ্যাপিকা জাহানারী কবিতা নামের ১৯৪৪ সালে ডি, লিট ডিগ্রী পাইলেন।

শ্রীযুক্তা মীনাক্ষী ব্যানার্জি বি, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হওয়াতে ৪টী স্বর্ণ পদক পাইলেন।

লক্ষ্ণৌ ভাতখণ্ডে কলেজে কৃতি আসামের ছাত্রী

প্রাক্তন মরিস কলেজে কণ্ঠসংগীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কুমারী লক্ষ্মী নিয়োগী (জোড়হাট) ও পাকল বালা দেবী (যমলদৈ) কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। মীরা দাস (গৌহাটী) যন্ত্র পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে।

বই-এর কথা

১। **কবিতায় শতশ্লোকী গীতা**—পুষ্প দেবী প্রণীত।

পুষ্পদেবীর এই সর্ব্বজন সমাদৃত আদর্শ বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হোল এটি লেখিকার পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ার মধ্য দিয়েই প্রকাশ পেয়েছে লেখিকার অপূর্ব্ব রচনা শৈলী, মধুর ভাব গভীর ভাবানুভূতি ও অনবদ্য ছন্দঝঙ্কার মননশীলতার। কবিতায় শতশ্লোকী গীতা পড়ে সকলেই মুগ্ধ হবেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই পুস্তক ঘরে ঘরে প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। **ব্রতচারী সাথী**—ব্রতচারী প্রতিষ্ঠান সংঘ, সম্পাদক শ্রীবলাইচন্দ্র গোপ। মূল্য চয় আনা। বারাসত, চন্দন নগর হতে প্রকাশিত এবং ৯/৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট হতে মুদ্রিত।

স্বনীয় গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের ব্রতচারীর আদর্শ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত আলোচ্য সংখ্যা খানি। ব্রতচারীদের যে পঞ্চ নিয়ম, জ্ঞান, প্রেম, সত্য, ঐক্য ও আনন্দ, এই আদর্শবাদই 'ব্রতচারী সাথীর' প্রত্যেকটি লেখার মধ্যে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। এতে অভিনন্দন জানিয়েছেন ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, শ্রীসুকুমার সেন, ডাঃ যোগেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসৌরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য।

শ্রীনবী দত্ত, শ্রীবলাইচন্দ্র গোপ, শ্রীবনোদ বন্দ্য, শ্রীঅমুরতী ভট্টাচার্য, শ্রীনবনীহর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীসুপ্রীতি কুমার রায়ের রচনা সংখ্যাটিকে মনোজ্ঞ করেছে। গুরুদেব প্রবর্ত্তিত ব্রতচারীকে এরা স্বীয় রচনার মাধ্যমে জনসমক্ষে সার্থক ভাবে তুলে ধরেছেন।

এই পত্রিকার আমরা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

৩। **পঞ্চমী**—নির্ম্মল দত্ত সম্পাদিত। প্রকাশক ভারতী লাইব্রেরী, ৫ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২।

বাংলার পনেরো জন বিশিষ্ট লেখক-লেখিকার অপ্রকাশিত আধুনিকতম সুরুচিসম্পন্ন গল্প-সঙ্কলন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত। এতে লিখেছেন : দক্ষিণারঞ্জন বসু, আশাপূর্ণা দেবী, নরেন্দ্র নাথ মিত্র, প্রভাবতী দাসগুপ্তা, জ্যোতিকুমার, অন্নপূর্ণা গোস্বামী, হীরেন্দ্র নারায়ণ মুখার্জি, গোপালকৃষ্ণ রায়, অমিল নিয়োগী, অরুণ সরকার, নীহাররঞ্জন সিংহ, বাণী রায়, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, রবীন্দ্র কুমার সেন ও নির্ম্মল দত্ত।

৪। **সুবর্ণ-রেখা**—ভারতীয় সাহিত্যিক সঙ্ঘের কার্য-পরিষদের উদ্যোগে সর্ব্বভারতীয় পট-ভূমিকায় 'সুবর্ণরেখা' নামে যে সুবৃহৎ উপন্যাস রচনার কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে তাহাতে উক্ত সঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক ঔপন্যাসিক শ্রীসুধাংশু কুমার রায়চৌধুরীর অসাধারণ কার্যকুশলতা ও সাহিত্য সাধনার একনিষ্ঠতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

ভারতীয় সাহিত্যিক সঙ্ঘের ২০ জন ভিন্ন ভাষাভাষী সম্পাদকের সহযোগিতায় যে বিরাট উপন্যাস প্রকাশের আয়োজন হইতেছে তাহা অনুমান প্রতিখণ্ড ৭০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী এবং ১২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হইবে। ভারতীয় সাহিত্যিক সঙ্ঘের সূচনা হইতে তাহার ক্রমবর্দ্ধমান অবস্থা এবং উপন্যাসের উপাদান সংগ্রহের কাহিনী পরিশিষ্ট খণ্ডে থাকিবে। আসাম হইতে লেপ্‌চোধার এবং হিমালয় হইতে কন্যা কুমারিকা পর্য্যন্ত বিরাট অঞ্চলের অধিবাসীদের সামাজিক, রাজনৈতিক, কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, পল্লী ও সহর জীবনের ঘটনা বহুল বিচিত্র নায়ক নায়িকার কাহিনীতে পর্য্যবসিত থাকিবে। এই বিরাট উপন্যাসের প্রতিটি খণ্ড স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এক একটি বিষয়ে সীমাবদ্ধ। ইহা ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় বিভাগীয় সম্পাদক কর্তৃক অনূদিত হইয়া উপন্যাস আকারে প্রকাশিত হইবে। বিদেশী ভাষায় অনুবাদের চেষ্টাও চলিতেছে। ইতিমধ্যে শ্রীসুধাংশু কুমার রায়চৌধুরী 'ভারতীয় সাহিত্য ও সাহিত্যিক' বিষয়ে বিভিন্ন সভা সমিতিতে কতকগুলি বক্তৃতা দিয়াছেন। ৩৩ নং, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা-৬, অথবা ফোন: বড়বাজার ২০৩৯ ঠিকানায় যোগাযোগ করিলে বিশেষ জানা যাইবে। উপন্যাসখানি প্রকাশিত হইলে ভারতীয় সাহিত্যে সর্ব্ব বৃহত্তম উপন্যাস হইবে বলিয়া মনে হয়। আমরা লেখকের এই প্রশংসনীয় উদ্যমের জন্য ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাইতেছি।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি

দ্বাত্রিংশ বার্ষিক উৎসব—১৯৫৭

সমিতির দ্বাত্রিংশ বার্ষিক উৎসব সমিতি-ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ১৯শে জানুয়ারী শনিবার স্বর্গতা সরোজনলিনী দত্তের মৃত্যু বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে সকাল ৯ ঘটিকায় "প্রার্থনা সভা" অনুষ্ঠিত হয়। প্রার্থনা সভা পরিচালনা করেন শ্রীমতী সুষোনা দত্ত। উক্ত সভায় স্বর্গতা সরোজনলিনী দত্তের কর্ম্মময় জীবন আলোচিত এবং তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করা হয়।

১৬ই ফেব্রুয়ারী শনিবার, অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় "বার্ষিক সাধারণ সভা" অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমতী সুচরিতা হাকসার সভা-নেত্রীর আসন গ্রহণ করেন এবং শিল্প প্রার্থনা উদ্বোধন করেন। কলিকাতার পৌরপিতা শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। "বার্ষিক সরোজনলিনী বক্তৃতা" করেন শ্রীমতী মৈত্রেয়ী সেন। তিনি বলেন, "দেশ-বিদেশের নারী জাগরণ" বিষয়ে।

সমিতির কোষাধ্যক্ষ শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মাননীয়া সভানেত্রী, মাননীয় প্রধান অতিথি এবং উপস্থিত সকলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া এক ভাষণ দেন। ভাষণে তিনি বলেন যে, প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীর সমাজ উন্নয়ন কাজের সহিত এই সমিতির এক গভীর যোগাযোগ বিদ্যমান। আর্থিক কারণে পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল কাজ সম্পাদন করা সমিতির পক্ষে সম্ভব হইতেছে না। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি সর্ব্বসাধারণের প্রতিষ্ঠান। সর্ব্বসাধারণের নিকট সমিতির আর্থিক অভাব দূর করণার্থ তিনি আবেদন জানান।

সমিতির সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা মণিকা গুপ্তা সমিতির কার্য্যাবলীর এক সংক্ষিপ্ত বিবরণী সভায় পাঠ করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীসুরেশ চন্দ্র রায় তাঁহার ভাষণে বলেন যে, সমিতির প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত গুরুসদয় দত্তের দেশপ্রীতি বিষয়ে তিনি তাঁহার ছাত্র-জীবন হইতেই অবগত ছিলেন। প্রায় ৩১ বৎসর পূর্ব্বে স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দেবীর পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে তৎকালীন কতিপয় কর্ম্মনিষ্ঠ সহৃদয় ব্যক্তির সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ৺গুরুসদয় দত্ত এই সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। সুদীর্ঘকালের জন্য বক্তা এবং তাঁহার স্ত্রী এই প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত ছিলেন। স্বাধীনতা লাভের পরে দেশের নরনারীর উপর গুরুদায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে। নারী সমাজকে গুরুদায়ীত্ব বহন করিবার শক্তি দান করিতে সরোজনলিনী সমিতির দান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সমিতির উন্নতি কামনা করিয়া বক্তা তাঁহার প্রধান অতিথির ভাষণ সমাপ্ত করেন।

শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবী তাঁহার ভাষণে বিদেশীদের নারী জাগরণের ধারার সহিত আমাদের দেশের নারী জাগরণের ধারার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করেন এবং তিনি বলেন যে সংযম ও নিষ্ঠা এই দুটি বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াই আমাদের দেশের নারীসমাজকে প্রগতির দিকে অগ্রসর হইতে হইবে।

সভানেত্রী শ্রীমতী সুভদ্রা চাকুসার তাঁহার ভাষণে বলেন যে, কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি পল্লী এবং পল্লীর সমষ্টি নিয়াই আমাদের এই বিরাট দেশ। পরিবারের উন্নতি ও সৌন্দর্যের উপর নির্ভর করে পল্লীর উন্নতি এবং সৌন্দর্য—আর পল্লী যদি উন্নত ও সুন্দর হয় তাহা হইলে আমাদের এই বিরাট দেশও উন্নত ও সুন্দর হইয়া উঠিবে। পারিবারিক সৌন্দর্য ও শৃঙ্খলা বহুলাংশে নির্ভর করে মেয়েদের উপর। সেই মেয়েদের গঠন করিবার গুরুভার সরোজনলিনী সমিতি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বহন করিয়া আসিতেছে—ইহা দেশের গৌরবের বিষয়। সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির উন্নতি কামনা করিয়া সভানেত্রী তাঁহার ভাষণ সমাপ্ত করেন। সমিতির সহ-সাধারণ সম্পাদিকা শ্রীমতী মনীষা রায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

পুরস্কার বিতরণী সভা

১৭ই ফেব্রুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ৪॥ ঘটিকায় পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ কালিদাস নাগ প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। ডাঃ নাগ তাঁহার ভাষণে বলেন যে, এই সমিতির মত প্রতিষ্ঠান যদি টাকার অভাবে ঠিকমত কাজ করিতে এবং সম্প্রসারিত হইতে না পারে তাহা হইলে উহা সমগ্র বাঙ্গলা দেশের অপমান। এই বৎসর সরোজনলিনী দত্তের স্বামী পরলোক-গত গুরুসদয় দত্তের জন্মের ৭৪ বৎসর পূর্ণ হইবে। এই উপলক্ষে উপযুক্ত অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিবার জন্যও ডাঃ নাগ আবেদন জানান।

শ্রীমতী চিত্রলেখা সিংহ কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্য কৃতি ছাত্রীদের পুরস্কার ও কৃতিত্বপত্র দেন।

সমিতির অন্যতম সহ-সভাপতি শ্রীনিবারণ চন্দ্র ঘোষ সকলকে অভ্যর্থনা জানান এবং কর্ম-পরিষদের সদস্য শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ধন্যবাদ জানান।

মহিলা সমিতি প্রতিনিধি সম্মেলন

১৮ই ফেব্রুয়ারী সোমবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় মফঃস্বল সমিতির প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন হয়। উক্ত সম্মেলনে সভানেত্রীত্ব করেন শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী। ১৮টি মহিলা সমিতির প্রতিনিধি উক্ত সম্মেলনে যোগদান করেন। প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব মহিলা সমিতির কাজের সুবিধা অসুবিধা বিষয়ে আলোচনা করেন।

সভানেত্রীর ভাষণ

সভানেত্রী শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী তাঁর ভাষণে বলেন, আজকের এই সভায় আসার কথায় আমার মনে পড়ল 'আলো জ্বালানোর' কথা। সুইচ টিপে আলো জ্বালা নয়, প্রদীপ জ্বালার কথা।

যে কোনো উৎসবে, অনুষ্ঠানে, পূজা-পার্ব্বণে, দুর্গোৎসবে দেওয়ালীর দিনে আমরা ঘরে মায়ের মঙ্গল প্রদীপ জ্বালাই সবাই জানেন। প্রথমে একটী প্রদীপই জেলে তারপর সেইটী থেকে দরকার মত আমরা আরো প্রদীপ জেলে নিয়ে থাকি। ক্রমে বাড়ীর ঘরের সব আলোগুলি জ্বলে ওঠে নানাহাতে নানাদিকে।

১৯১৩ সালে এমনি একটী প্রদীপ জেলেছিলেন স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দেবী। সেদিন কলকাতা সহরের সমাজের চেহারা আজকের মত ছিল না। গ্রামে বা অন্য সহরের কথা ছেড়েই দিই। সেদিন সমাজের মানুষের অর্দ্ধেক আমরা সাধারণ মেয়েদের ঘর থেকে এক পা বেরুতে গেলে ডাকতে হোতো ঘোড়ার গাড়ী—তার জানালা বন্ধ করতে হ'ত, সঙ্গে থাকত পুরুষ সঙ্গী।

শিক্ষায়তনে যাবার জন্যও গাড়ীর ব্যবস্থা করতে হত। শিল্প, কলা বা জীবিকা অর্জনের দিকেও খুব কম সংখ্যায় মেয়েই যেতো—যারা যেতো তাঁদের বেশীর ভাগই হিন্দু ছিলেন না। কারুর মনে লেখাপড়ার কারুর বা সেলাই শেখার, কারুর বা গান শেখার সখ সাধ ও গলা আছে, কারুর ছবি আঁকার ঝোঁক আছে, তাদের কোনো আকাঙ্খা মেটান সম্ভব ছিল না সেকালে। বৈষ্ণব কবির ভাষায়—তাঁদের 'ঘর হতে আঙিনা বিদেশই' ছিল।

সেইদিন সেই সময়ে যে কয়েকটী শিক্ষিতা মহিলা দেশী অবলা বসু, কৃষ্ণভাবিনী দাস প্রমুখ কয়েকজন দেশের মেয়েদের কথা ভেবেছিলেন এবং দিকে দিকে নিজেদের সাধ্যমত প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে তুলেছিলেন স্বর্গীয়া সরোজ-নলিনী তাঁদের অন্যতমা। আমাদের দেশের বাঙ্গালী হিন্দু বিধবাদের মুখের ম্লান ছবি তাঁর হৃদয়কে বড় পীড়ন করে-ছিলো, তাই তিনি তাদের দুঃখ দূর করার জন্য নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ আরম্ভ করেছিলেন।

সহসা তাঁর কাজের মাঝে মহাকালের আহ্বান এলো তাঁর কাছে—তিনি ১৯২৬ সালে তাঁর কাজ তাঁর পরিকল্পনা তাঁর জীবনের সাধ ফেলে চলে গেলেন।

হয়ত সেদিন সকলেরই মনে হয়েছিল আর কিছু করা যাবে না, হবে না। প্রায়ই তো তাই হয় এরকম স্থলে।

কিন্তু অকস্মাৎ দেখা গেল পত্নী বিয়োগের শোকের দহনের ক্ষত উরত বহু ভূমি থেকে আর এক বিস্তৃত পরি-কল্পনার অঙ্কুর জেগে উঠ্‌ল গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের অন্তরে।

সরোজনলিনী বেঁচে থাকলে এটা কি রকম হ'ত বা হ'ত না তা বলা শক্ত—কিন্তু পত্নী-প্রেমিক হত মহাশয় স্ত্রীকে ও তাঁর কাজকে এমন করে একদঙ্গে বাঁচিয়ে রাখলেন আমাদের গ্রামে গ্রামে সমিতিতে সমিতিতে আজ যদি লোকে হত মহাশয়ের নাম ভুলেও যায় সরোজনলিনীর নাম তারা ভুলবে না। এই হ'ল একটী আশার প্রদীপ থেকে অসংখ্য দীপ জেলে নেবার একটী আশ্চর্য্য দৃষ্টান্ত।

এখন যাঁরা এখান থেকে পাশ করে বেরিয়ে গেছেন, যাঁরা আছেন, যাঁরা থাকবেন তাঁরা জানেন না দীর্ঘ চল্লিশ বছর আগে যে মহিলা এই পরিকল্পনা মনে ভেবেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর যিনি সেটাকে এমনকার এই আকার দিলেন তিনি নীরবে সমাজ-কল্যাণের কত বড় কাজ আরম্ভ করেছিলেন।

বাংলাদেশে আজকের নারীসমাজে আর অবশ্য সেদিনের অবরোধ নেই, অসুবিধা নেই, রাজনীতি ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ নাগরিক অধিকার আমরা পেয়েছি সোজা সরল পথ আজ আমাদের সামনে রয়েছে। কিন্তু আমরা পূর্বসূরিনীদের কাছে কত ঋণী তা যেন আমরা ভুলে না যাই।

শিল্প প্রদর্শনী

বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে সমিতি ভবনে এক শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। সরোজনলিনী শিল্প ও ট্রেনিং বিদ্যালয়ের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য এই প্রদর্শনীতে দেখান হয়। এতদ্ভিন্ন মফঃস্বল মহিলা সমিতি হইতে নিম্নলিখিত ১৮টি মহিলা সমিতি শিল্পদ্রব্য সহ প্রদর্শনীতে যোগদান করে—১। কাটিহার, ২। কাঁচড়াপাড়া, ৩। ভাঙ্গাপাড়া ৪। নৈহাটী রেলওয়ে, ৫। নৈহাটী সেণ্ট্রাল ক্লাব, ৬। হাওড়া রেলওয়ে, ৭। ব্যাটরা, ৮। বাঙ্গইপুর, ৯। গান্ধী কলোনী, ১০। নিমতা, ১১। হাজুড়ু, ১২। শালা বাগান, ১৩। শ্রীরামপুর, ১৪। চাকদহ, ১৫। সেনহিয়া ১৬। রাহুতা, ১৭। পুরী, ১৮। বিবেকনগর।

মহিলা সমিতিসমূহের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাজের জন্য শ্রীরামপুর মহিলা সমিতির সূচিশিল্পের কাজের জন্য শ্রীবীরেন্দ্রসদর দত্ত প্রদত্ত "সরোজনলিনী কাপ" পুরস্কার দেওয়া হয়।

সমগ্র প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ শিল্পদ্রব্যের জন্য সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের সূচীশিল্পের কাজের জন্য সমিতির সভাপতি ভারতের আইন সচীব মাননীয় শ্রীঅশোক চন্দ্র বিশ্বাস প্রদত্ত পদক পুরস্কার দেওয়া হয়। সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের তাঁত এবং কাপড় ছাপা কাজের জন্য শ্রীবীরেন্দ্রসদর দত্ত প্রদত্ত "গুরুসদয় দত্ত" কাপ পুরস্কার দেওয়া হয়।

প্রদর্শনী ১৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে ২৩শে ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত অপরাহ্ণ ৩টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত খোলা থাকে।

সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়

এই বিদ্যালয় পরিচালিত 'লেডী ব্রেবোর্ণ ডিপ্লোমা ক্লাস' হইতে গত ১৯৫৬ সালে ৩৭ জন প্রাথমিক, ৩৮ জন মাধ্যমিক এবং ১০ জন ফাইন্যাল ডিপ্লোমা পরীক্ষা দিয়াছে। ১৯৫৬ সালের লেডী ব্রেবোর্ণ ফাইন্যাল ডিপ্লোমা পরীক্ষায় সরোজনলিনী শিল্প বিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী প্রভাতী ঘোষ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া বিশেষ পুরস্কার পাইয়াছে।

সরোজনলিনী টীচার্স ট্রেনিং বিভাগ

১৯৩৪ সালে জুনিয়ার (টিচার্স) ট্রেনিং বিভাগ খোলা হয়। পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা বিভাগ জুনিয়ার ট্রেনীং উঠাইয়া দেওয়ায় ১৯৫৫ সন হইতে সিনিয়ার ট্রেনিং বিভাগ খোলা হয়। গত বৎসর এই বিভাগে ৪১টি ছাত্রী ছিল। তন্মধ্যে ফাইন্যাল পরীক্ষায় ৩৮ জন পাশ করিয়াছে এবং শ্রীমতী রাণু গুপ্ত সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে ১ম স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা ছাড়া ৮ জন ছাত্রী হাতের কাজে, ১০ জন সেলাইয়ে এবং ১ জন পাঠদান বিষয়ে Distinction পাইয়াছে।

মফঃস্বল মহিলা সমিতির বার্ষিক শিল্প পরীক্ষা

১৯৫৬ সালের বার্ষিক শিল্প পরীক্ষা (অন্যান্য বৎসরের ন্যায় মহিলা সমিতিতে অনুষ্ঠিত না হইয়া) নিম্নলিখিত ৮টি কেন্দ্রে গৃহীত হয়।

১। সমিতি ভবন, ২। মহেশ উচ্চ বিদ্যালয় নৈহাটী, ৩। শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ৪। রামলাল একাডেমী (বালিকা স্কুল) চাকদহ, ৫। তারাসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়, ব্যাটরা, ৬। হাইস্কুল ইন্‌স্টিটিউট্, কাঁচড়াপাড়া, ৭। বলরাম ইন্‌স্টিটিউট্, কাটিহার, এবং ৮। বিবেকাশ্রম, পুরী।

মহিলা সমিতির পরীক্ষার গ্রন্থ পরিচালনায় যে যে বিদ্যালয় সমূহের পরিচালক, শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, সমিতির কর্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ জানাইতেছেন।

১৭টি মহিলা সমিতি হইতে ৭১ জন জুনিয়ার এবং ৪৫ জন সিনিয়র পরীক্ষা দিয়াছে; তন্মধ্যে জুনিয়ার ৩২ জন এবং সিনিয়ার ২৬ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে।

CALCUTTA
GENERAL
LIBRARY
UNIVERSITY

৩২শ বর্ষ] বৈশাখ—১৩৬৪ [২য় সংখ্যা

নববর্ষে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

সন্ধ্যার কবরী-চ্যুত আলোকের মত পড়ে ঝরে
একটি আদুর পাতা জীবনের মৌন বালুচরে,
আজিকার বীথিকা মর্ম্মরে নব পল্লবে কুসুমে
দোলা লাগে পূবনের আবির্ভাবে। আধীর কুসুমে
মাখা বৈশাখী প্রথম উষা। কিরণ সিঞ্চিত নভে
বর্ষ বিদায়ের শেষে। দিকে দিকে আনন্দ সৌরভে
প্রমত্ত ধরণী। তুষারাঙ্কিত প্রান্তরের উপবনে
বিহগ কূজনধ্বনি। বর্ষে বর্ষে তোমারি অঙ্গনে
চিত্তচয়নের তরে আমন্ত্রণ পেয়েছিনু তব
বিলাস-বিহ্বল চোখে দৃষ্টি তুমি দিয়েছিলে নব
মধুসহচরী মোর।
মমতা-স্নেহের স্নিগ্ধ হাসি
ভুল করা বকুল তলায় মোরে দেখায়েছ আসি
হৃদয়ের বাঁশী বাজাইয়া দিয়েছিনু আলিঙ্গন
মোর দুটি কর প্রসারিয়া। উৎসবের আয়োজন
করেছিনু ধোঁয়ে। মালার গ্রন্থিতে বাধু! প্রাণখুলি
প্রেমপুষ্প দিয়েছ যে। অনিন্দিত মুখখানি তুলি
সোহাগে আবেশে মোর শুনায়েছ প্রণয়ের বাণী
আবেগ কম্পিত কণ্ঠে ওষ্ঠপুটে বিম্বাধর আনি
মিলন মুহূর্ত্তগুলি করেছ মধুর। অপূর্ণ লালসি অঙ্গে
যৌবনের প্রভাতের নবীনতা লয়ে নৃত্যরঙ্গে
বহায়েছ বাণীর মাধুর্য্য তুমি যদি ওঠে এসে
এমনি বরষে নব একদিন মোরে ভালোবেসে।
দূরছোতে নিত্য গাওয়া গীতি তব কানে যেন আসে
নিখিলের খেলা ঘরে তুমি কি আসিবে
মোর পাশে!

পঁচিশে বৈশাখের প্রস্তাব

শ্রীগোপালকৃষ্ণ রায়

তমসাচ্ছন্ন বিভাবরীকে অপসারিত ক'রে পঁচিশে বৈশাখের সূর্যোদয় সমগ্র জাতির কাছে সত্যি বরাভয়ময়। এই দিনে বাংলা তথা ভারতে ঘটেছিল মহামানবের শুভ আবির্ভাব। সব যুগে সর্বকালে—সকল দেশে এমনিতর মহামানবের আবির্ভাব ঘটে না। যে জাতি যে দেশ প্রেম ও পুণ্যে সৌভাগ্যবান্—সেই দেশে আর সেই জাতির মাঝে জন্ম গ্রহণ করেন মহামানব। আকাশের দিকে তাকিয়ে—প্রকৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হ'য়ে জড়িয়ে একমাত্র আমরাই বলতে পারি—"ঐ যে মহামানব আসে"। পঁচিশে বৈশাখ শরণীয় দিন—মহাপুণ্যময় এই দিবস। এই প্রভাতে সূর্য মহা কবিকে বরণ ক'রে নিয়ে চুম্বন এঁকে দিয়েছিল তাঁর ললাটে। দিগন্তরে জাগলি উঠেছিল—বিশ্ব প্রকৃতির মাঝে আনন্দের প্রীতি জড়িত হ'য়েছিল। মহামানবের সংস্পর্শে এসে সমগ্র মানবের অন্তরে অমৃতের ঊর্মি জেগে উঠেছিল। তাই আমরা রবীন্দ্রনাথের গান, তাঁর কাব্যে, তাঁর সাধনায় অমৃতের আহ্বান শুনেছি। কুসংস্কারের অক্টোপাশ ছিন্ন ক'রে জ্যোতির্ময় রূপে তিনি এলেন আমাদের মাঝে—শোনালেন অভয় বাণী—পৃথিবীকে দিলেন চিন্ময় আশ্রয়। নৈসর্গিক প্রতিভায় প্রভাবান্বিত করলেন যুগের মানুষকে। তাঁর এই প্রতিভা বিস্ময়—অবিচিন্ত্য। তাঁর ভাবধারায় আমরা অবগাহন করছি—তাঁর সাধনার অমল উজ্জ্বল কিরণে আমরা সংস্কৃতিসম্পন্ন রুচি জ্ঞানে বিকশিত হ'য়ে উঠ্‌ছি। আমাদের যা কিছু গর্বের—যা কিছু গৌরবের সবই তো আমরা পেয়েছি কবিগুরুর কাছ থেকে। তাই তো তিনি যুগস্রষ্টা কবি—তাইতো এই যুগ রবীন্দ্র যুগ।

আমাদের প্রাণ ও সংস্কৃতির মূলে উজ্জ্বলতম বিভায় বিকশিত এমন যে কবি—তাঁর জন্মদিনে প্রতি ঘরে ঘরে আনন্দের রোল তো উঠ্‌বেই—তাঁর স্মৃতি-তর্পণের জন্য জাতির মন তো আবেগে উচ্ছ্বসিত হবেই—আর হওয়াটাই তো স্বাভাবিক।

আজীবন রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের পূজা করেছেন—বঙ্গবাণীকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বিশ্বের দরবারে। রবীন্দ্র নাথ সাহিত্য যজ্ঞ ক'রে যে ভাব গুপ্ত ক'রে গিয়েছেন—আমরা তাঁরই জীবনাদর্শে উদ্দীপ্ত হ'য়ে সেই পথ ধরে এগিয়ে যাচ্ছি নব-নব সৃষ্টির প্রেরণায়।

কিন্তু এই সাধনা অতি দুরূহ—অতি দুষ্কর। বিলাস-ব্যসনে এ সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া যায় না—ত্যাগের মহান্ আদর্শে উজ্জীবিত হ'য়ে এগিয়ে যেতে হয়। এ সাধনা তীব্র সাধনা—এ সাধনা গণ্ডীবদ্ধ সীমায়িত সাধনা নয়। দেশ কালের মধ্যে বিস্তৃত ক'রে দেওয়াই এই সাধনার সিদ্ধি। তাই—যদি আমাদের সিদ্ধিলাভ করিতে হয়—তবে দুষ্কর হ'লেও এই মহাসাধনায় নিজেদের বিনিয়োগ করতে হবে। তাহলেই আমরা তাঁর স্মৃতিপূজার পবিত্র পরিবেশ গড়ে তুলতে সমর্থ হব। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের আলোকবর্তিকা আমাদের হাতে দিয়ে গিয়েছেন—হয়তো আমরা সেই বর্তিকা প্রজ্জ্বোলিত রাখতে অসমর্থ—তবু চেষ্টা করবো—বলব, "তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি"। এই কর্তব্য পালন করা একান্ত দরকার—ঠিক তেমনি রবীন্দ্র-নাথের স্মৃতি রক্ষা করাও একান্ত প্রয়োজন।

রবীন্দ্র জন্ম তিথিকে কেন্দ্র ক'রে আজকাল প্রায় প্রতি ঘরে ঘরে স্মৃতি পূজা হচ্ছে। কোথাও বা সপ্তাহকালব্যাপী আবার কোথাও বা পক্ষকাল ব্যাপী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। খুবই ভাল কথা। কিন্তু এই সপ্তাহব্যাপী—পক্ষব্যাপী যে আনন্দের সুর প্রবাহমান থাকে—তাতে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নাটক আর কাব্যালোচনাতেই পূর্ণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত স্মৃতির জন্যে কোথাও কী সপ্তাহব্যাপী—পক্ষব্যাপী আন্দোলন হচ্ছে? কোথাও নয়। কি সরকারী—আর কি বে-সরকারী সর্বক্ষেত্রেই উপযুক্ত স্মৃতি রক্ষার্থে সকলেই কেমন যেন উদাসীন। তাই বলি, শুধু নাচ-গান আর

বক্তৃতা করেই রবীন্দ্র স্মৃতিপূজা হয় না—তাঁর প্রতি জাতি হিসাবে আমাদের অনেক করণীয় কর্তব্য আছে।

আমি তাঁর সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবো না—তবে তাঁর লিখিত পুস্তক সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলব। রবীন্দ্রনাথকে আমরা খুবই আপনার ক'রে পেয়েছি—একান্ত কাছেও টেনে নিয়েছি। একটা কথা মনে জাগে তা সবিনয়ে নিবেদন করছি: আমরা ক'জন রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ করি? আর তেমনি সুযোগই বা আমাদের হচ্ছে কোথায়? আজকের আর্থিক দুনিয়া সকলের কাছেই দুঃসহ হ'য়ে উঠেছে। রবীন্দ্র সাহিত্য তাই অতি মূল্যে কিনে পাঠ করার মত ক্ষমতা দেশের বৃহদংশ লোকেরই নেই। তাই বলি, রবীন্দ্র-রচনাবলীকে কতগুলি খণ্ড ক'রে খুবই অল্প মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা কী উচিত নয়? আমি এই বিষয়ে বিশ্ব ভারতী তথা ভারত সরকারের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করি। রবীন্দ্র সমগ্র রচনাবলী পাঠ ক'রে তার সম্যক রস উপলব্ধি করতে পারলেও স্মৃতিপূজা অনেকটা সার্থক হয়।

গত ১৩৬২ "দেশ" সাহিত্য সংখ্যায় প্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্র রবীন্দ্র জন্মতিথিতে গ্রন্থ পার্বণ তিথি রূপে উদ্‌যাপিত করার জন্যে আবেদন জানিয়েছিলেন। আমার জানা নেই—সে আবেদনে দেশের কত অংশ লোক সাড়া দিয়েছিলেন। শতকরা ১ জন লোকও সাড়া দিয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের "গ্রন্থ পার্বণ" আবেদন বিফল হয়েছে। হওয়াটাই আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। কারণ আজিকার যুগে কোন শুভ কাজে আমরা যতটা সাড়া দেই—অশুভ কাজে তার চেয়ে অনেক বেশী মেতে উঠি। শ্রদ্ধেয় প্রেমেন্দ্র মিত্রের দু'বছর আগেকার আবেদন আজও আমি সকলকে স্মরণ করে দেখতে অনুরোধ করি। কারণ এই "গ্রন্থ পার্বণে"র মাধ্যমেই আমরা রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করতে পারবো—আর তাঁর স্মৃতিপূজা নিশ্চয়ই এই সব সপ্তাহকালব্যাপী উৎসবের চেয়ে প্রাধান্য হবে।

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিরক্ষা সম্বন্ধে আমি আর দু'একটি কথা বলেই প্রবন্ধ শেষ করবো। কিছুদিন আগে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান চৌরঙ্গী রাস্তার নাম পরিবর্তন ক'রে রবীন্দ্র সরণী রাখার এক মূল্যবান (?) প্রস্তাব নিয়েছিলেন! ভাবতেও কষ্ট হয়—রবীন্দ্রনাথের মত নৈসর্গিক প্রতিভাবান্ মহাপুরুষের স্মৃতির উপযুক্ত মূল্য নাকি একটি রাস্তার নামকরণে! জানিনা পৌরসভা তাঁদের প্রস্তাব সত্যিই কার্যকরী করবেন কিনা। তবে করার আগে আমি পৌর কর্তৃপক্ষগণকে বিশেষভাবে ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি। একটা মনুমেন্ট একটা রাস্তা বা একটা কলেজ রবীন্দ্রনাথের নামে সৃষ্টি ক'রে দিয়ে আমার মনে হয় জাতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি আমাদের অবিচার করা হবে।

এবার আমার নিজস্ব একটি প্রস্তাব সবিনয়ে পাঠকের কাছে নিবেদন করছি: যদি সম্ভব হয় তবে সাড়া দিয়ে প্রস্তাবটি কার্যকরী করার জন্যে আন্দোলন করতে পারেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগসূত্র নেহাৎ কম ছিল না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ 'কমলা লেক্‌চারার' রামতনু লাহেড়ী অধ্যাপক হয়েছিলেন। বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ রেখেছিলেন। তিনি তার আশুতোষকে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের একটি বড়রকম সঙ্কলন প্রকাশ করার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। একমাত্র রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সমাবর্তন উৎসবে বাংলা ভাষায় বক্তৃতা ক'রে মাতৃভাষাকে তৎকালীন রাজভাষার সম্মান দিয়েছিলেন। তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাছাড়া কবি নিজেই ছিলেন একজন জীবন্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

যাই হোক, আমরা "কলিকাতা" শব্দের কোন আভিধানিক অর্থ খুঁজে পাইনে। 'কলিকাতা' নাম সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ আছে বটে। তা যাই থাকুক আমার প্রস্তাব এই যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন ক'রে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় রাখলে কেমন হয়?

[প্রবন্ধটি সম্পর্কে সমস্ত সাহিত্য লেখকের]

বাঙ্গালী প্রীতি ও রবীন্দ্রনাথ

শ্রীমতী শিবানী বন্দ্যোপাধ্যায়

(প্রবন্ধ)

পঁচিশে বৈশাখ কবিগুরুর শুভ জন্মদিন। এই দিনটি সমগ্র বাঙ্গালী পরিবারের কাছে পুণ্যময় দিবস রূপে পরিগণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিজে বাঙ্গালী ছিলেন বলে এই দিনটি এতটা মর্য্যাদা সম্পন্ন হয়ে ওঠেনি—রবীন্দ্রনাথ একজন বড় কবি ছিলেন ব'লেও গৌরবান্বিত হয়ে ওঠেনি—রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালী মনো-জীবনের স্রষ্টা ব'লেই এই দিনটি পরম পুণ্যময় দিবস রূপে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পূজিত হচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলা ও বাঙ্গালীকে এমন ভাবে উপলব্ধি ক'রেছিলেন—যা তাঁর সৃষ্টিধর্মী মনে বহিঃপ্রকাশ হ'য়েছে বিভিন্ন কবিতা, প্রবন্ধ ও রচনাবলীতে। বাঙ্গালীর কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে রবীন্দ্রনাথ পুনরুজ্জীবিত করেছেন বললে হয়তো অত্যুক্তি করা হবে না—তবে তিনি যে এর কাঠামোকে দৃঢ়তর ক'রেছেন একথা অনস্বীকার্য্য।

বাংলাকে ভালবেসে রবীন্দ্রনাথ ভালবেসে ছিলেন বাঙ্গালীকে। বাঙ্গালীকে দুঃখ-দুর্দশা ও দুরবস্থার মধ্যে জীবন অতিবাহিত করতে দেখে তাঁর কবি মন কেঁদে উঠেছে। যখন নানাবিধ সমস্যা এসে বাঙ্গালীর মনকে ক্ষুব্ধ ক'রে তুলেছে—সমস্যায় জর্জ্জরিত ক'রে কর্ত্তব্য বিমূঢ় করে ফেলেছে—পরস্পরের প্রতি যখন বাঙ্গালী বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে—তখন মাতৃভূমির কাছে রবীন্দ্রনাথ প্রার্থনা জানিয়েছেন—এদের মানুষ করার জন্যে। তিনি গেয়েছেন :

"সাতকোটী সন্তানের হে মুগ্ধ জননী—
রেখেছ বাঙ্গালী করে মানুষ করনি।"

বাঙ্গালীকে মানুষ হ'য়ে বাংলার মর্য্যাদাকে বিশ্বদরবারে ক'রে দেওয়ার জন্যে কবির এই আকুতি—পরোক্ষ আঘাত!

বাঙ্গালীকে জাতীয় জাগরণে প্রথম উদ্বুদ্ধ ক'রেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র—"বন্দেমাতরম" মন্ত্রে। তার আগে হয় তো এমনি ক'রে বাংলাকে কেউ আহ্বান করেনি। কিন্তু বাঙ্গালী জাতি নিজের সত্তা সর্বপ্রথম পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারলো রবীন্দ্রনাথের মন্ত্র দিয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে ঘটেছিল বাংলার উদ্বোধন—আর রবীন্দ্রনাথের মধ্যে হ'ল অভ্যুদয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মন্ত্র ছিল—"বন্দেমাতরম"—আর রবীন্দ্রনাথের মন্ত্রের রূপ হ'ল 'রাখী মন্ত্র'—বাংলার মাটি বাংলার জল'! এই 'রাখী মন্ত্র' দিয়েই রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীকে অচ্ছেদ্য মিলন-সূত্রে বেঁধেছিলেন। আর বাঙ্গালীর ভাগ্যাকাশে এনে ছিলেন তিমির বিদার উদার অভ্যুদয়। রবীন্দ্রনাথের 'রাখী মন্ত্র' ছড়িয়ে পড়ল বাংলার আকাশে বাতাসে—সকলের কণ্ঠে কণ্ঠে,—

"বাঙ্গালীর পণ বাঙ্গালীর আশা
বাঙ্গালীর কাজ বাঙ্গালীর ভাষা
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান।
বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।"

আজ হয়তো আমরা বড় একটা কেউ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিনে—কিন্তু এর সারমর্ম নিয়তই আমাদের অন্তরের তন্ত্রীতে অনুরণিত হচ্ছে। এই সাম্য গীতি আমাদের সুরে ধ্বনিত না হলেও—প্রাণে চলেছে অবিরাম অনুপ্রাণনা।

পঞ্চাশ বছর পূর্বে এই মন্ত্র বাঙ্গালীকে উজ্জীবিত করেছিল—একতার আহ্বানে মাতিয়ে তুলেছিল—পঞ্চাশ বছর পরও আজিও এই মন্ত্র বাঙ্গালীর মনে স্পন্দিত হচ্ছে নিত্য নতুন ছন্দে। আর হচ্ছে বলেই রবীন্দ্র জন্মতিথিকে প্রতিটি বাঙ্গালী নিজের জন্মতিথি ব'লে উপলব্ধি করতে পারছে। কবির এই পুণ্যময় জন্মদিবস—সমগ্র বাঙ্গালীর

অন্ত দিবস। কারণ বাংলা ও বাঙ্গালীকে অনেক বার আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার করার গুরু দায়িত্ব তিনি বহন ক'রেছিলেন। ১৯০৫ সালে বাংলা বিভাগ কেন্দ্র করে যখন বিরাট বিপ্লবের লেলিহান অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল—আর তখন সেই বঙ্গবিপ্লবের প্রধান বিপ্লবী হ'য়ে দেখা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তখন বঙ্গবিভাগের প্রতিরোধের চেষ্টা হয়েছিল রাজনীতির মধ্য দিয়ে—রবীন্দ্রনাথ তাকে চালিত করলেন সঙ্গীত শিক্ষা আর সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। এক কথায় বাংলার সমাজ-জীবনে। কিন্তু আমরা হতভাগ্য বাঙ্গালী রবীন্দ্রনাথের এই অনন্ত দেশপ্রেমের পূর্ণ মর্য্যাদা আমরা দিতে পারিনি—বাংলাকে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দ্বিখণ্ডিত ক'রে বর্ত্তমান বাঙ্গালী জনোচিত কাজই ক'রেছি! অনেক দিন আগেই রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন বাংলা বিভক্ত হবেই—সেই সময় তিনি দুঃখ ক'রে বাংলা দেশকে সম্বোধন ক'রে লিখেছিলেন :

"এরা চাহেনা তোমারে চাহেনা যে—
আপন মায়েরে নাহি জানে।
মুখ লুকাও মা ধূলি শয়নে
ভুলে থাক যত হীন-সন্তানে॥"

অন্তর দিয়ে তিনি বাংলাকে ভালবেসে ছিলেন। বাঙ্গালীর দুঃখে তিনি বিমর্ষ হ'য়ে পড়তেন। আবার কখনো বা রাগ ক'রে ধিক্কার দিয়ে ব'লেছেন,—

"কে জাগাবে আজ, কে করিবে কাজ
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ ;
কাতরে কাঁদিবে মায়ের পায় দিবে
সকল প্রাণের কামনা—
একি শুধু হাসি খেলা প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছে কথা ছলনা।"

তবু "কথায় ছোট বহরে বড়" বাঙ্গালীর মন জাগল না। তাই কবির মন বেদনায় প্রকম্পিত হ'য়ে উঠল। তিনি ভাবলেন সমগ্র পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে বাঙ্গালীর যেন মিল নেই। তাদের তুলনায় বাঙ্গালী যেন অনেক পেছনে পড়ে আছে। পৃথিবীর মানুষের পদক্ষেপের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্তে কবি লিখেছেন :

জগৎ মাতানো সঙ্গীত তানে
কে দেবে এদের নাচায়ে ?
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দেবে এদের বাঁচায়ে—
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস
ভাঙ্গিবে জীর্ণ খাঁচা-এ ?"

বাঙ্গালীর দুঃখে তাঁর অন্তরে বেদনার বন্যা প্রবাহিত হত। তাই তিনি বাংলাকেই সম্বোধন ক'রে ব'লেছিলেন,

"পাপ পুণ্যে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি—তব গৃহ ক্রোড়ে
চির শিশু ক'রে আর রাখিও না ধরে।"

কিন্তু আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতি সহজেই ভুলতে পেরেছে কবির এই দুঃখবোধ। যাদের জন্তে কবির চিত্তে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল—তারাই আজ অতি সহজেই ভুলে গিয়ে আবার তেমনি সহজাত প্রবৃত্তিতে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষান্বিত হ'য়ে উঠেছে। পরশ্রীকাতরতা আর বিশ্বাস-ঘাতকতা—হিংসা বিদ্বেষে বাঙ্গালী আজ সর্ব জাতির অগ্রণী। হিংসা-দ্বেষ বিভেদের করাল মন্ত্রে দীক্ষিত হ'য়ে বাংলার উপর তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছে। বাংলা ধ্বংসের উন্মাদনায় উন্মত্ত বাঙ্গালী জাতি আজও বুঝতে শিখলো না কোন ভয়াবহ পথে তারা এগিয়ে চলেছে কোন্ সর্বনাশা অন্ধকারের দিকে এগিয়ে যেতে শক্তিক্ষয় করছে? এখনো সুযোগ আছে—কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলার সময় আছে—

"বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন
বাঙ্গালীর ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।"

রবীন্দ্রনাথের গানের আদর

শ্রীজয়দেব রায়

বাঙলাদেশে একদিন সঙ্গীতের কদর ছিল। গায়করা যেমন গাইতে জানত, শ্রোতারা তেমনিই শুনতে জানত। ধনীদের বাড়ীতে মজলিস্ বসত, ফরাসে তাকিয়া হেলান দিয়ে আলবোলা হাতে বাবুরা বসতেন, একটু দূরে সমঝদার শ্রোতারা কেউ পান মুখে, কেউ হুকা হাতে ঘিরে বসে থাকত, মাঝখানে আতর দানি আর লবঙ্গের মালার পাশে যেন ফুলের মালা গলায় ওস্তাদ তার তবলচী আর সারেঙ্গীওয়ালাকে নিয়ে আসর আলো ক'রে শোভা পেত। শ্রোতারা আর গায়ক ছিল একই সূত্রে বাঁধা।

কবি রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"পঞ্চাশ বছর আগে একদিন ছিল যখন বড় বড় গাইয়ে বাজিয়ে দূরদেশ থেকে কলকাতা শহরে আসত। ধনীদের ঘরে মজলিস্ বসত, ঠিক সমে মাথা নাড়তে পারে এমন মাথা গুনতিতে নেহাত কম ছিল না। এখন আমাদের শহরে বক্তৃতা সভার অভাব নেই কিন্তু গানের মজলিস বন্ধ হয়ে গিয়েছে। সমস্ত তালমানলয় সমে বৈঠকী গান পুরোপুরি বরদাস্ত করতে পারে—এমন মজবুত লোক এখানকার যুবকদের মধ্যে প্রায় দেখাই যায় না।"

গায়কের গাহিবার জন্য যে রেওয়াজ করতে হ'ত তার উচিত মূল্য তাঁরা শ্রোতাদের কাছ থেকে পেতেন—সেটা হয়ত অর্থের আকারে নয়, কিন্তু শ্রোতাদের পরিতৃপ্তিতে তাঁদের রসতৃপ্তি ঘটত। গুণী চিত্রশিল্পী একটী চমৎকার ছবি আঁকলেন, একজন রসিক দর্শক সেটা দেখে বললেন—"বাঃ" শিল্পীর শ্রম সার্থক হয়ে উঠল। শ্রোতাদেরও তেমনই গান শুনে যথাস্থানে কেরামাৎ দিতে হবে। তা না হলে তাঁদের গান যাবে থেমে।

সেদিন শ্রোতাদের গান শুনবার সময় ছিল অফুরন্ত, গান শুনবার প্রবৃত্তি ছিল তাঁদের গানের সুরের দোষ-গুণ বিচারের মুন্সীয়ানা তা-ও তাঁদের, ছিল! কবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন—"ঠিক কোনখানে সুর বা তালের কতটুকু অসম হচ্ছে সেটা তাঁরা অনেকেই জানতেন, সেই দিকে কান রেখেই তাঁরা গান শুনতেন। যারা আদর্শের সঙ্গে তাল-মান-লয় সম্পূর্ণ মিলেছে দেখলেই তাঁরা পুলকিত হয়ে উঠতেন। রাগিণীর যে সব জায়গায় সুরের গ্রন্থি, সেই স্থানটাতে যে সব গাইয়ে অনায়াসে সম্ভট পার হয়ে যেত তারাই বরমাল্য পেত।" কিন্তু আজ সে দিন নেই, আজ আর গান সাধনার বস্তু নেই, সহজে আসর মাত করার উপকরণ হয়ে উঠেছে গান।

এর জন্য দায়ী শ্রোতাদেরই অবহেলা। রবীন্দ্রনাথের গানের রসোপলব্ধির জন্য আজ তাই গায়ক ও শ্রোতার মধ্যে একটি সহজ আত্মীয়তা বোধ জাগ্রত হওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সুরকার রবীন্দ্রনাথ লালিত হয়েছিলেন সেদিনের সেই সব সমঝদার শ্রোতাদের সান্নিধ্যে, তাঁর গানের রসাবেদন ছিল বিশিষ্ট ধরণের। গান তিনি শুনেছিলেন, আর তা শুনেছিলেন সেকালের রসপন্থী সুরকারদের কাছে, রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, যদুভট্ট, বিষ্ণু চক্রবর্তী দিগোরী মোহন গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র, সর্বোপরি জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের সুর সাহচার্য তাঁকে বাণীদেবীর সাধনার সুকঠিন পথের দিশা দিয়েছিল।

ওস্তাদী সঙ্গীতের সুরক্ষিত দুর্গের সতর্ক পাহারায় সঙ্গীত ছিল বন্ধ। সুর তপীরথ রবীন্দ্রনাথ সুরধারাকে সেই দুর্গম শিখরের সুরকুলের আশ্রয় থেকে মুক্ত ক'রে সবলে পথকেটে আজ বাঙলা দেশের কাব্য রসিকদের অন্তঃস্থলে এনে দিয়েছেন। আজ তাই তাঁর প্রসাদে সুরের ধারা ঘরে ঘরে বয়ে গিয়েছে, কণ্ঠে কণ্ঠে আজ সুর ঢালা হয়েছে। সঙ্গীতের জগতে এভাবে তিনি যুগান্তর এনে দিয়েছেন—"আমার নিজের কবিত্বের ইতিহাসে দেখতে পাই—গান রচনা অর্থাৎ সঙ্গীতের সঙ্গে বাণীর মিলন সাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে।" কিন্তু তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণে তাঁরই কথা ও সুরের ছায়া অবলম্বনে রচিত

হতে লাগল রাশি রাশি পদ্য গান, ভবিষ্যতে হবে আরও। সঙ্গীতের কৌলীন্যে লাগল কালিমা, শ্রুতি হল তার আহত। রসিক শ্রোতা আর প্রবীণ গায়কের রস সুমধুর সম্বন্ধ হল বিচ্ছিন্ন।

সঙ্গীতের সমাদর গিয়েছে, বাণীদেবীর বীণাতারে বহুত কলকাকলীতে উদ্গীত গান আজ বহুজনের বহুমধুর কৃত্রিম ধ্বনিতে গীত হচ্ছে। একদল বলেন—তারই প্রয়োজন ছিল, সকলের সহজসাধ্য সুরে সহজ কথা নিয়েই গান হবে রচনা। যার যা খুশী সুরে গাবে গান, হবে মনোমত। কিন্তু সঙ্গীত যে কথাশিল্পের অনুগত, তার মধ্যে রয়েছে অন্তর্নিহিত রসের আবেদন তাকে যে রসোত্তীর্ণ হতে হবে। সঙ্গীতের উপর এই মূল্যবোধ রবীন্দ্রনাথই নিক্ষেপ করেছিলেন। তাই তাঁর গানেরও সেই দশা হয়েছে অবশ্য তাঁর গান কৃত্রিম জীবনযাত্রার অত্যন্ত গভীর মধ্যে কতকগুলি মেয়েলী রীতিবদ্ধ নরনারীর অলস আভিজাত্যের বাহন হয়ে—থাকুক তাও বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁর এক শ্রেণীর গানের সেই দশাই হয়েছিল এত দিন। রসিক সমাজ এককালে তাঁর গানকে তাই অবজ্ঞা করতেই অভ্যস্ত হয়ে ছিলেন।

গ্রামোফোন রেকর্ড সেই গণ্ডী থেকে তাঁর গানকে মুক্ত ক'রে—সর্বজনের মধ্যে প্রথম বিলিয়ে দিয়েছিল।

তারপর বৈষয়িক প্রয়োজনে তাঁর গানের একটা ব্যবসা গাঁথা হ'ল। সিনেমার অনুসঙ্গে প্রেমের দৃশ্যে অনভাবনীয় রূপে তাঁর গানকে বহুত মূল্যে বিক্রয় করা হ'ল। পাড়ার মোড়ে বিড়ির দোকানে শোনা গেল তাঁর গানের বিকৃতি। তাঁর গান শিখবার জন্য যে কোন আয়াস, কোন তালিমের প্রয়োজন নেই। এটাই বদ্ধমূল হয়ে গেল জনগণের মনে। এক এক ক'রে তাঁর অনেক গান রূপান্তরিত হ'ল, রীতি-রীতির পরিবর্তন হ'ল, প্রয়োজনানুসারে গানের ভাবের সৌকুমার্যের হানি করা হ'ল।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও এই আশঙ্কাই করেছিলেন, তাই তিনি লিখেছেন বলে গেছেন—"আমার গানের বিকার প্রতিদিন আমি এত শুনেছি যে আমারও ভয় হয়েছে যে আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা সম্ভব হয়ত হবে না। গান নানা লোকের কণ্ঠের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলেই গায়কের নিজের ভোগ-রুচির বিশেষত্ব গানকে নিয়তই কিছু না কিছু রূপান্তরিত না ক'রেই পারে না। ছবি ও কাব্যকে এই দুর্গতি থেকে বাঁচান সহজ। ললিত কলার সৃষ্টির স্বকীয় বিশেষত্বের উপরই তার রস নির্ভর করে। গানের বেলাতে তাকে রসিক হোক অরসিক হোক সকলেই আপন ইচ্ছা মত উল্টপাল্ট করতে সহজে পারে বলেই তার উপর বেশি নজর থাকা চাই। নিজের গানের বিকৃতি নিয়ে প্রতিদিন দুঃখ পেয়েছি বলেই সে দুঃখকে চিরস্থায়ী রবীন্দ্রনাথের গানের সেই আভিজাত্যকে আবার পুনর্জীবিত করতে ইচ্ছা করে না।" করার প্রয়োজন আছে। তাঁর গানই নিখিল ভারতে বাঙলার অকৃত্রিম পরিচয়; সেই সম্পদকে পরিচ্ছন্ন করে রাখার দায়ীত্ব আমাদের। এজন্য আজ আমাদের সচেষ্ট হতে হবে—

প্রথমতঃ তাঁর গান তাঁর সাহিত্য সাধনার অঙ্গীভূত। কবির সাহিত্য রস থেকে বঞ্চিত জনের পক্ষে তাঁর গানে অধিকার থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে যে রস তা কাব্য ভিত্তি, বাণী ও সুর উভয় মিলে অর্ধনারীশ্বর রূপ ধরেছে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রবেশোন্মুখ ছাত্রছাত্রীকে সাহিত্যের রসোপলব্ধির মধ্য দিয়েই আসতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ—কিন্তু সে সঙ্গে একথা ভুললে চলবে না যে, গানে সুরই মুখ্য। রবীন্দ্রনাথের সুর নানা উৎস হতে উৎসারিত। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের অনুপম কারুণ্যে প্রতিপালিত কবির অধিকাংশ গানের বনিয়াদই চিরাচরিত সুরধারায় গঠিত। তার গান গাইতেও যেমন শুনতেও তেমনি 'ক্ল্যাসিকাল মিউজিকের' কান থাকা চাই। দুঃখের বিষয় সঙ্গীতের সেই শিক্ষণ আজ অনেকেরই নেই।

তৃতীয়তঃ—কবি ছিলেন চিরকালই অভিনয় প্রবণ। তাঁর বহু গান নানা নাট্য সূত্রে গ্রথিত, এই সকল গান যখন স্বতন্ত্রভাবেও গীত হয়, তখনও তার মধ্যে অভিনয় প্রবণতা রূপায়িত হয়ে উঠে এবং রসসমৃদ্ধ সেই গানগুলির পক্ষে তাই স্বাভাবিক। গায়কদের গাইবার সময় সেই মূল আবেগকে সুপ্রকাশিত করা আবশ্যক।

চতুর্থতঃ—তাঁর এক শ্রেণীর গান হৃদয়াবেগ, বাহ্য যন্ত্রের

সমস্তের উপর যে গানগুলি নির্ভরশীল। সুনিপুণ তালজ্ঞ শিল্পী ছাড়া অনেক জটিল গান আর কেউ গাইতে পারেন না।

পঞ্চমতঃ—পল্লী সঙ্গীতের সম্পর্কে অনেকের ধারণা সেগুলির সুর সহজ। কবির বহু গান কীর্তন, বাউল সারি প্রভৃতিতে বাঁধা, এ গানগুলির সুরেও কবি নানা বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। তা সত্ত্বেও যাঁরা ঐ ধরণের গান গাইতে অভ্যস্ত নন, তাঁদের পক্ষে রবীন্দ্রনাথের এই অঙ্গের গানের, অনুশীলন সহজসাধ্য নয়।

ষষ্ঠতঃ—বিদেশী বিলাতী সুরের বহু গান তাঁর ভাণ্ডারে রয়েছে ইংরেজী অবয়ব তাঁর বহু গানের। তাঁর আর্লভবাকে তাঁর বহুগানের কথাগুলি ও ইংরেজী স্বরলিপিও করেছিলেন। তাঁর এ ধরণের গান গাইতে হলে বিলাতী সুরের জ্ঞান থাকা দরকার।

সপ্তমতঃ—রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল বৈশিষ্ট্য তার গীতিরীতি বা গায়কী। কথা, সুর, ছন্দ সবকে ছাড়িয়ে তাঁর গীতিরীতিই তাঁর গানের পরিচায়ক। এই গীতিরীতি ধীরে ধীরে গান গাইতে গাইতে আর শুনতে শুনতে গায়কের আয়ত্ত হয়। যতদিন না এই Style-এর সঙ্গে পরিচয় না হয় ততদিন তাঁর গান নিষ্প্রাণ, প্রাণহীন ব'লে মনে হবে।

সর্বশেষে—গায়কের কণ্ঠ সৌকুমার্যের কথাও উল্লেখ করতে হয়। অনেকে বলেন তাঁর গান বড়ই কোমল কণ্ঠের উপযোগী, তাই হওয়াই স্বাভাবিক। কবির গান তো মল্লযুদ্ধে তাল ঠোকা নয়,—প্রেমের গান তো লাউড স্পীকারে বক্তৃতা নয়, চাপা গলায় ধীর গতিতে মৃদুভাবে স্ত্রী কণ্ঠেই তাই তাঁর রমণীয়তর হয়ে ওঠে।

জন্মদিনে

শ্রীতপতী মুখোপাধ্যায়

"হে কবি শতায়ু হও" সৌম্য শান্ত স্বরে
কহিলেন মহাত্মাযে কত স্নেহ ভরে।
মোদের জাতির গর্ব্ব, গর্ব্ব এ ধরার
যাঁর সুর ছন্দ গান ঘরে ঘরাঘার

ব্যথা ক্লিষ্ট বুকে জাগে নব সুখরাশি
কয়েছিলে "বিশ্বজনে আমি ভালবাসি।"
রচি শান্তি নিকেতন ছুটাইয়া আঁখি
অন্ত দেশবাসী পথে কন ডাকি ডাকি

"আয় আয় জ্ঞান খুঁজে বৃথা ভুল পথে
আয় তোরা! দেখ দেখা পূর্ণ মনোরথে
হাসিমুখে খেলা মাঝে শিক্ষা নব নব
গানে সুরে পরিপূর্ণ মুক্ত ছাত্র সব

লভে শিক্ষা আনন্দেরই মাঝে"—
সবারে বিলায়ে শান্তি নিকেতন রাজে
নশ্বর মানব প্রাণ তাই কীর্ত্তি সনে
অমর হয়েছ তুমি মানবের মনে।

রবীন্দ্র কাব্যে শিশু

শ্রীঅরুণ সরকার

অনেকে বলেন, রবীন্দ্রনাথ দূর থেকে শিশুকে দেখেছেন। তাদের সুখ দুঃখে সহানুভূতিশীল হয়েছেন—তাদের দুঃখবোধে ব্যথিত হয়েছেন। তাদের দুরাশায় ভরেছেন আশা দান; কিন্তু অবনীন্দ্র নাথ নিজেকে দূরে দাঁড় করিয়ে রাখেননি। মেখেছেন শিশুদের কাছে এক আত্মাবোধ করে। অনেকের সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ আছে। কেননা রবীন্দ্রনাথ দূর থেকে শিশুকেই যদি দেখে থাকেন, তাহলে 'শিশু' 'কাবুলিওয়া,' 'ডাকঘর' 'মুকুট' এই সমস্ত কিশোর কিশোরীদের সাক্ষাৎ মিলত না বা তাদের প্রাণের অতল তলে নিজস্ব কোকোনদে যে মধু, তার স্বাদ পেতুম কি করে?

অবনীন্দ্র নাথের হাতের কাজে আর তার গল্প বলায় কোন তফাত নেই। সব যেন এক হয়ে গেছে। তাঁর আপন সত্তাটিতে শিশুরা ভর করে তখন তাঁর যেমনা তৈয়ারীতে শিশুর মনবিবেশ—গল্প লেখায় শিশুর চিন্তাধারা। এইখানে হয়ত কেউ কেউ মন্তব্য করে থাকেন রবীন্দ্রনাথ যা শিশু বলে লিখেছেন তা কিশোর সীমাকেও পেরিয়ে যায়—তার মধ্যে আছে সর্ব্ব বয়সের সংবেদনশীল মননশক্তির সাক্ষাৎ।

শিশুদের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন:

খোকার মনের ঠিক মাঝখানটিতে
আমি যদি পারি যাবা নিতে—

তার রবি শশী তারা
জানিনে কেমন যারা
সত্তা করে আকাশের তলে
আমার খোকার সাথে
গোপনে দিবসে রাতে
শুনেছি তাদের কথা চলে।

এখন কি আমরা আমার বলব রবীন্দ্রনাথ শিশুকে দূর থেকে দেখেছেন? না তা মোটেই নয়। আমরা দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ শিশু হয়ে গেছেন। তানইলে এ কথা চিন্তায় আসে না। শিশুর সঙ্গে রবি শশী কথা বলে! তারা সত্তা বলায় আকাশে খোকাকে ইসারা করে। এই যে শিশুর সঙ্গে একত্ম হয়ে যাওয়া এর তুলনা কোথায়? পরিণত বুদ্ধির মাপ কাটিতে যে পর্য্যন্ত মাপা যায় তদপেক্ষা আরও রঙ্গিন ক'রে অথচ রক্তমাখি রংমশাল তৈরী করতে পারেন, এমন যাদুকর কি রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না?

তিনি 'ছড়ার ছবিতে' ভূমিকায় বলেছেন,—

"এই ছড়াগুলি ছেলের জন্ত লেখা। সবগুলো মাথার এক নয়। বোলার চালিতে প্রত্যেকটি সমান সুগম করা হয়নি। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত জটিল যদি কোনটা থাকে তবে তার অর্থ হবে কিছু দুরূহ; তবু তার ধ্বনিতে থাকবে সুর। ছেলে মেয়েরা অর্থ নিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে ধ্বনি নিয়ে। তারা অর্থলোভী জাত নয়।"

"ছড়ার ছন্দ প্রাকৃত ভাষার ধরাও ছন্দ। এ ছন্দ মেয়েদের মেয়েলি আলাপ, ছেলেদের ছেলেমি প্রলাপের বাহনগিরি করে এসেছে।"

রবীন্দ্রনাথ ভূমিকাতেই ছেলেদের ছড়ার রূপ আর ভাষার সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। ছড়ার মধ্যে সুরের রেশ থাকে বলেই তা হৃদয়গ্রাহী হয়। এ সত্তা, উপলব্ধি, ব্যতীত তর্ক বা অন্ত উপায়ে জানা যায় না!

কবি যে বয়সে যা দেখেছেন তার মত হয়ে তিনি দেখেছেন। তা যদি না হতে পারতেন তা'হে এমন ক'রে নিখুঁত শিশু চিত্র আঁকতে পারতেন না। যে বয়সে যা কিছু লেখা হোক না কেন—তা সেই বয়সটির মত লেখা। তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি আকাশেতে যে মনের ও কল্পনার আভাষ ফুটিয়ে তুলেছেন—তা টেচিয়ে স্বীকার করবার নয়—তা মনে হৃদয়ঙ্গম করার মত।

"শিশু-কাল থেকে
আকাশ আমার মুখে চেয়ে একলা গেছে ডেকে।
দিন কাটত কোণের ঘরে—খেয়াল নিয়ে খেলা
কাছের দিকে সজাগ মুখ মেলা;
তাই সুদূরের পিয়াসাতে
অতৃপ্ত মন তখন ছিল। লুকিয়ে যেতেম ছাতে,
চুমী করতেন আকাশ ভরা সোনার বরণ ছুটী,
নীল অম্বরে ডুবিয়ে দিতেম ব্যাকুল চক্ষু দুটি!"

রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা সার্থক। 'ছেলেমেয়েরা অর্থ দিয়ে নালিশ করবে না, খেলা করবে খুশি দিয়ে। ওরা অর্থলোভী জাত নয়। তাই বেশ বুঝি তিনি 'ছড়ার ছবি' মধ্যে শুধু যে খুশি তুলেছেন তা নয়। তার মধ্যে একটা সহজ সরল অর্থও লুকিয়ে আছে। যাকে একটু খোঁজাখুঁজী, খোঁচাখুঁচী করলেই সে বেরিয়ে আসে হাসতে হাসতে।

'তত্তহরিতে' লিখেছেন—

হংকঙেতে সারা বছর আফিস করেন মামা,
সেখান থেকে এনেছিলেন চীনের দেশের জামা,
দিয়েছিলেন মাকে,
চাকার নিচে যখন তখন শিব-দিয়ে সে ডাকে,
নিচিনপুরের বনের থেকে ঝুলির মধ্যে ক'রে
তত্তহরি আনত ধরিত্ব করে।

তিনি 'যোগীনদা'র মারফত শিশুদের মধ্যে কিসের মোহে তাদের মাকে হাসির ছলে গল্প বলতেন—আর শিশুরাও বা কিসের আকর্ষণে সেখানে জমায়েত হত—'যোগীনদার' গল্প শোনবার জন্যে, তার রহস্য জানতে পারি। কাউকে 'মার্বেল' কাউকে 'সবেশ মার্কা' ছবি আবার কাউকে 'লবঙ্গুল' ঘুষ দিয়ে যোগীনদা শিশুদের জোগাড় করতেন। যোগীন দাদা-গল্প বলতেন—নানা দেশে ঘুরে এমন এক দেশে গেলেন সেখানে রাজপুত্র হারিয়ে গেছে। শেষে তাকে দেখে সেখানকার রাজকর্মচারী ভাবলে রাজপুত্র ফিরে এসেছে ভেবে, তাকে মোটামোটা জামা জুতো পরিয়ে—রাজপুত্র সাজিয়ে নিয়ে গেল রাজ-বাড়ীতে। মোটা রুটি আর ঘি। সহ্য হয় না—যোগীনদার। শেষে যোগীনদা পালিয়ে এল। শিশুর দল চেঁচিয়ে উঠল "কেন ফিরে এলেন?" যোগীন দাদা হেসে বললেন—"বাঙালী ছেলের ঘি রুটি সহ্য হয়?" রাত্রে শুয়ে শুয়ে চিন্তা করে শ্রোতারা যদি কায়েতের সব মেসের কথা ভুল হয় তা'হে যোগীন দাদার 'ভুলোমন-গোলা' গল্প মনে থাকলেই চলবে!

বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, 'ভূত পত্নীর' সঙ্গে 'সে' আর 'আবোল-তাবোলে'র সঙ্গে 'খাপছাড়া'র তুলনা করলে তৎক্ষণাৎ জাতের তফাৎ ধরা পড়ে: আগের বই দুটির বাহুল্য এখানে নেই, এরা ঢের বেশী সাহিত্যিক, ঢের বেশী সচেতন—এমন কি আজ সচেতন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক যে মহা কবি তিনি মাঝে মাঝেই উঁকি দিয়ে যান, আর তাঁরই হাতের নূতন কৌশল আমরা অভিজ্ঞ পাঠকরা চিনতে পেরে খুশী হই!"

সমালোচকের দৃষ্টিতে দ্বিমাত্রিকের কথা তুলেছেন বসু মহাশয়। কিন্তু আমার মনে হয়—সুরের এবং রসের ব্যাঘাত ঘটেনি ঐ দুটো বইতে। 'খাপছাড়া'য় যে শিশুরস ভেঙে রয়েছে তাতে গান থাকতে পারে কিন্তু তা এতই অল্প যে তাতে রসের নির্যাসকে ঠিক করতে পারে না। (এখানে গান বলতে প্রাপ্ত বয়স্কদের রসকে বলা হয়েছে)। শিশুরস যেমনটি হওয়া উচিত ঠিক তেমনটি পরিবেশিত হয়েছে।

'আবোল তাবোলের' বেলায় বলা যায় যে শিশু—যেন ট্রাই সাইকেলে চড়ে বেড়াচ্ছে আর—'খাপছাড়া'কে বলা যেতে পারে শিশু একটু বড় হয়ে, 'চেন লাগান ট্রাই সাইকেল' চড়ে বেড়াচ্ছে।

শিশু-সাহিত্যিকের মধ্যে অবনীন্দ্রনাথ অধিকার। রবীন্দ্রনাথকে শিশু-রসের রস-রসিক বলা যেতে পারে। তাঁর 'শিশু' সেই হাসি কান্নায় জড়িয়ে ধরা কবিতা, অমন হালকা চঞ্চল, গভীর আর সুদূর স্পর্শী। একাধারে পার্থিব আর অপার্থিব ভাবধারা—যার ভাব-চপলতা, ঢেউয়ের কানায় কানায় মন উঠে এসে আছড়ে পড়া, এমন দ্বিতীয় কোন লেখার কথা আমার জানা নেই। রবীন্দ্রনাথ যেমন গাছের—পাতায় ফলফুলবরণ—আলোর ছটার ঝকমকানিতে শাশ্বত প্রেমের অস্তিত্ব দেখেছিলেন—

তেমনি রাঙা হাতে রঙিন বেদনা দিয়েই বুনেছিলেন জগত সৃষ্টির কলরব মুখর ইতি কথা।

এইবার 'শিশু' থেকে কয়েকটি কবিতা আলোচনা করে শেষ করব আমার কথা। রবীন্দ্রনাথ শিশুকে এমন প্রশ্রয় দিয়েছেন যেখানে খোকা তার মাকে 'প্রশ্ন' করে বসল—আমায় আজ ছুটি দাও আমি অত কিছু চিন্তা করব।

তুমি বলছ দুপুর এখন নয়ে,
　　না হয় যেন সত্যি হল তাই,
এক দিনো কি দুপুর বেলা হ'লে
　　হিকেল হ'ল মনে করতে নেই।
আঁধার হ'ল মাদার গাছের তলা,
　　কালী হ'য়ে এল দীঘির জল,
হাটের থেকে সবাই এল ফিরে,
　　মাঠের থেকে এল চাষীর দল।
মনে করনা উঠল সাঝের তারা,
　　মনে করনা সন্ধ্যে হ'ল যেন,
রাতের বেলা দুপুর যদি হয়
　　দুপুর বেলা রাত হবে না কেন!

শিশু ও যে সংবেদনশীল—তার ছোট মনে বেদনা-বোধ ছড়িয়ে যেতে পারে এমন চিত্র নিখুঁত ভাবে আমরা দেখতে পাই 'ব্যাকুলে'। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ দেখতে চেয়েছেন প্রিয়জনের দুঃখে শিশু অন্তর সমব্যাথি হয়ে উঠে। বাবার চিঠি না আসায় মার চিন্তা শিশু অন্তরে সংক্রামিত হয়ে উঠল। তাই শিশু তার নিজের বুদ্ধি দিয়ে মাকে দিল সান্ত্বনা। জানাল তার কর্তব্যের বাকি পরা কাজের কথা।

শিশুদের আর এক দিক দেখিয়েছেন। সেখানে ছোট মেয়ে বাড়ীর সকলের ওপর রাগ করে দাঁড়িয়ে আছে। বাতাসে উড়ছে চুল! হাতের ফুল পায়ের কাছে পড়ে আছে ঠোঁট দুটি রাগে কখনও কাঁপে আবার কখনও বা উঠে ফুলে। গ্রীবা বাঁকিয়ে ঠোঁট বেঁকিয়ে থাকে। এ সহজ মূর্ত রবীন্দ্রনাথের 'অভিমানিনী'তে দেখতে পাই।

আবার রবীন্দ্রনাথ শিশু কবিতার মধ্যে অধ্যাত্মবাদের কথাও প্রকাশ করেছেন। এ এক অপূর্ব রচনা। হয়ত তিনি অধ্যাত্মবাদের কথা স্মরণ করে লেখেননি। কিংবা দেখা যাচ্ছে এমন রচনার স্রষ্টা হয়েছেন যেখানে পার্থিব অপার্থিবের প্রশ্ন জাগে। তিনি "সুখ দুঃখ" কবিতায় দেখিয়েছেন, রথের মেলায় যে সবচেয়ে সুখী হয়েছে সে এক ছোট মেয়ে। যার খুশী হওয়ার কারণ 'একপয়সার' তালের বাঁশি। তিনি দেখাচ্ছেন হাজার হাজার লোকের কোলাহলের মধ্যে যে সুর ভেসে বেড়ায় তাহল তালের বাঁশির সুর। এখানে কবি বলছেন—যেখানে প্রকৃত আনন্দ সে আনন্দ আপন অন্তঃ-করণ হ'তে জোরে পড়ে, সেই সুর সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত হ'য়ে থাকে। আবার যেখানে দুঃখ তা অতি সামান্যতম কারণেও হোক তা দুঃখ—সে দুঃখের বেদনা শত শত মানুষের অন্তরে আঘাত হানে। কেননা মানুষ সংবেদনশীল। এখানেই তিনি দেখিয়েছেন মানুষ কত কষ্ট করে—কত ঠেলাঠেলি ক'রে—ঠাকুরের দর্শন পাবার জন্যে আকুল আবেদন জানিয়ে দেবতার দর্শন পাচ্ছে—কিন্তু সে দর্শন অনায়াস হচ্ছে না কারণ যে শিশুটি তার মা কেনা 'এক পয়সা দামের লাল লাঠিটির দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে তার দুঃখ ও অপরিসীম। শত মানুষ দেবতা-দর্শন করতে যায়—তাদের নজর পড়ে ঐ ক্রন্দন রত ছেলেটির দিকে—তখন কি দেবতার দর্শন সুলভ হয়? তা কখনও হয় না। রবীন্দ্রনাথের শিশু-কাব্য এইখানেই সার্থক। শিশু কাব্যে—শিশু তার খোরাক পেলো যথারীতি। মন তার পুলকে উঠল মেতে আবার প্রাপ্ত বয়সে তার আধ্যাত্মবাদের ব্যাখ্যা খুঁজে পাবে ঐ একই কবিতায়।

তাই রবীন্দ্রনাথের শিশু-কাব্য শত শত শিশু মনে শতদল হয়ে ফুটে থাকবে চিরদিন।

'অভাবনীয়'

শ্রীপুষ্প দেবী

উপস্থিত সবচেয়ে পাওয়া শক্ত কি? কেউ বলবে চাকরী, কেউ বলবে ওষুধ অসুখ, বাকি সবাই সমস্বরে বলবে বাড়ী—কিন্তু আমি বলবো সবচেয়ে দুষ্প্রাপ্য হচ্ছে পুরাতন ভৃত্য। তাইই হারালুম। আপনারাই বলুন না এতে দুঃখ না হয়ে কি যায়? কিন্তু হারানোর পূর্ব মুহূর্ত অবধি আমি এর জন্য প্রস্তুত ছিলুম না। অনেকটা সিভার সিগারেটের বিজ্ঞাপনের মত। এখানে অবশ্য পুরাতন ভৃত্য কথাটি ঠিক খাটেনা যে সেদ সে রাঘুনি বামনী। অনেক অল্প বয়সের পর লোকটা দীর্ঘদিন ছিল কাজেই অভাবটা বেশী করে অনুভব করছি। কিন্তু আমি নিরুপায় সেই একটী প্রধান আছে না, দশচক্রে ভগবান ভূত—এও তাই।

ফ্লাট বাড়ীর বাসিন্দা আমরা। দুর্গাবি আমাদের ও পাশের মাদ্রাঠী পরিবারে কাজ করে। সে এসে সকালে ঘোর কলরবে ঘোষণা করলো, "তুমি যাই বল বৌদি ওদের বাড়ী আমি কাজ করতে পারবনা কি যে হাইমাঁই করে বলে" এমন সময় ঝড়ের মত মাদ্রাঠী গিন্নির প্রবেশ। এবং তন্নতন্ন খানিয়ে একখণ্ড তাঁর লেকচার অ্যাটেণ্ড করলেও সত্যি কথা বলতে কি তার এক বিন্দু বিসর্গও আমি বুঝতে পারিনি, কাজেই দুর্গা বেচারীর দোষ ধরা যায় না।

মনে পড়ে গেল কাল বিকেলের কথা। দারুণ গরমের মধ্যে ভাঁড়ার ঘর করতে গিয়ে দেখি বুদ্ধিমান হরিপদ গরমেতে চিনিতে র‍্যাশান এনেছে, তখন আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হল। একেতো র‍্যাশান গুছনো যে কী হ্যাঙ্গামার ব্যাপার তা প্রত্যেক গিন্নিই জানেন; এতি আগেকার কাল যে ইচ্ছামত খানিকটা মোটা খানিকটা সরুচাল আনিয়ে রাখলুম। বহুদিন চলবার চললো আবার ফুরুলেই আনানো হল। এ সাতদিন সাতটা ভিন্নের থলি নিয়ে লোক পাঠাও খানিকটা সরু চাল খানিকটা মোটা চাল খানিকটা আটা খানিকটা মসুর ডাল এক বিতিকিচ্ছি ব্যাপার। আবার আতপ চালও খানিকটা থাকবে, অবিশ্যি শুধু আতপ নয় সেদ মেশানো—মোট কথায় যত রকমে মানুষকে বিব্রত করে পারা যায়।

অবিশ্যি আমাদের কবিরাজ মশাই বলেন, দুরকম চাল, এক কাঁকরমণি এক পাথরমণি।

থাকগে যে কথা বলছিলাম হরিপদ তো র‍্যাশান এনে খালাস কিন্তু আমার অবস্থাটাও তো ভেবে দেখা দরকার। গৃহকর্ত্তার ডায়বেটিস বেচারা ভদ্রলোক চিনিতো দূরের কথা—গুড়ও খাননা। তাঁর জন্য গমই সম্বল অথচ এ চিনি মেশান গম নিয়ে কর্ত্তব্য কি? আর এই দারুণ বর্ষার গম ঘুরেই বা কর্ত্তব্য কি? ছাড়া কাপড় আর মাথার চুল তাই শুকুতেই তো প্রাণান্ত। তার ওপর শুকনো জিনিষ ভিজিয়ে কি আরও ঝামেলা আনব? এখানে এমনি পিপড়ের প্রাদুর্ভাব যে শুধু গম রাখাই দায় চিনি মেশালে তো কথাই থাকবে না। অথচ হরিপদকেই বা কি বলব? চিনির থলেটা ইঁদুরে কেটে মস্ত গর্ত্ত করে দিয়েছে। ওবেচারা ভেবেছে বাজার চিনি ছড়িয়ে আর কি লাভ? তার চেয়ে গমের থলেতেই থাক। বোধ হয় ডায়বেটিস আর প্যান্‌ক্রীয়াসের কথা ওর মনে আসেনি। আর সত্যি আমিও কিছু রোজ পাঁচসো করে থলে সেলাই করতে পারিনা। এমন অদ্ভুত ইঁদুর আমি জন্মে দেখিনি। কিছুতেই কি এদের অরুচি নেই? যখন সেই চিনি মেশানো গম দেখে আমার মেজাজ সপ্তমে চড়ে ঝাঁটিয়ে ওঠার উপক্রম তখন ছাদে এসে দেখি আমার মেয়ে তপু হেঁসে গড়াগড়ি যাচ্ছে।

খুব চোখ রাঙিয়েই বল্লুম, কী হয়েছে কী? সে তো উত্তরই দিতে পারে না হেঁসেই গড়াগড়ি খায় শেষে অনেক কষ্টে বললো, দুর্গাবি ছাত ঝাঁট দিচ্ছে আর মাদ্রাঠীদের বউ তাকে জিজ্ঞেস করছে কই আমার রাশান আনতে গেলেনা? দুর্গা বলে, আমার বর গেছে। মাদ্রাঠী বউ বললে, বললে কি বলছো? তোমার দেওরকা? দুর্গা তখন এরা বুঝি বরকে দেওরকা বলে, বলে, হ্যাঁ। এইটেই

হল তপুর হাসির কারণ। ব্যাপারটা বুঝে ফেলেই মেজাজ গরম থাকা সত্ত্বেও হেসে ফেলি। কাজেই বিস্ফোট বাধা অসম্ভব নয়। দুর্গাকে দুমাস ধরে কাজ করছে কি করে তাই বরং আশ্চর্য্য।

নানা বাজে প্রসঙ্গে আমরা আসল ঘটনা থেকে অনেক দূরে চলে গেছি। কথা হচ্ছিল দুর্গার মেজাজ সে দিন ভাল ছিলনা। যত ভালো মানুষই হোক্ না কেন না বুঝে উভয় পক্ষের চেঁচামেচি তো কোন পক্ষেরই সুখকর নয়।

এদিকে হবিতো হ সেদিনই নীচেও বিস্ফোট। হঠাৎ রান্না ঘরে হৈচৈ শুনে গিয়ে দেখি বামনী রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে চেঁচাচ্ছে। "দুড়ো ছেলে হাও অমন মুখে, মুখে আগুন পাঁচবার করে বল্লুম"—এদিকে ভাতের থালায় সামনে হরিপদর অবস্থা বরযৌ নতযৌ। উনি তো গোলমাল শুনে পায়ে চটি গলিয়ে যেদিকে কে যেন ডাকছে বলে কেটে পড়লেন। আমি তো কিছুতেই বুঝে উঠতে পারিনা ঘটনাটা কি? হঠাৎ স্বর্গ থেকে হোল পতন গোছের অবস্থা। সেদিন অফিস বন্ধ দিব্যি বেলা দিন বর্ষার কবিতা প্রসঙ্গে মেঘদূতের ভোটক ও মন্দাক্রান্তা ছন্দের আলোচনা হচ্ছিল।

এমন সময় হৈচৈ রব—কল্পনার স্বর্গ থেকে বাস্তবে নেমে এসে কিছুতেই যেন থেই পাইনা। একবার ভাবি বামনীর কি মাথা খারাপ হল? হরিপদকে মেরেমানুষ ভাবলো কি করে? আবার ভাবি হরিপদই বা এমন কি বলতে পারে? ১৮ বছর আছে এখানে ছেলেটি অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় নিরীহ গোছের ছেলে অকারণ একটা হৈচৈ করার মানুষ তো সে নয়?

এমন সময় দুর্গা বেরিয়ে আসে হয়জার পাশ থেকে বলে "চঃ আমি করবনি এমন চাকরী মনিব যা বলে সইব তাবোলে তোর পাপ মনি সইব কেন রে?" এ আবার কি ব্যাপার? ঘটনা ক্রমশ ঘুরোলো হয়ে ওঠে অনেক কষ্টে ঘটনাটার অর্থ উদ্ধার করি। বামনী নাকি প্রায়ই তরকারীতে নুন দিতে ভুলে যায় এবং চাখার ভার পড়ে আমার ছোট মেয়ে তপুর ওপর। কখনো বা হয়তো তার দাদার কাছ থেকে পাওনা চকোলেটটা সবে তপু মুখে পুরেছে এমন সময় হাতা নিয়ে সুশীলা এসে দাঁড়ায়, শুকতোটা একটু চেখে দেখতো দিদিমণি নুন দিয়েছি কিনা? মুখেতে চকোলেট ফেলে শুকতো চাকা যে মোটেই সহজ নয় তা সুশীলা বুঝতে পারে না অথচ একমিনিট দাঁড়াতে রাজী নয় সুশীলা। কাজেই বাধ্য হয়ে তপুকে মুখের চকোলেট ফেলে শুকতো চাখতে হয়।

তারপর দিনও প্রায় সেই ব্যাপার। রুটি আর অমলেট খেয়ে মেয়েরা স্কুলে যাচ্ছে এমন সময় সুশীলার আবির্ভাব একহাতা আঁলটে হলুদ গোলা জল নিয়ে সুশীলা এসে দাঁড়ায় দিদিমণি মাছের ঝোলটা একটু চেখে দেখনা নুনটা নুন হিসুম না তো?

একেই সকালে পরামাণিকদির (সেলাইয়ের দিদিমণি) প্রকাণ্ড গোলাপী মোটা-মোটার চাপ, তার ওপর মেজাজ মোটেই ভালো ছিল না। একে ক্যাটকেটে গোলাপী রঙ তার অদ্ভুত বিকট সাইজ অনেকটা একুবিডিনানের পেত্নির বিজ্ঞাপনের মত। এক্সলাইন ভুল হলে তিনবার ঘর খুলতে হবে। অথচ সব চেয়ে মিহি কাঁটায় বোনা চলছে। তার ওপর এই পেছু ডাকা। আবার গিয়েই আছে বেদাদিনীদির ব্যাকরণ ক্লাস। যতই মুখস্থ করে যাক্ না কেন ভুল ঠিক হবেই। তপু স্পষ্টাস্পষ্টি বলে দিয়েছে অমন যখন তখন সে চাখতে পারবে না। দুর্গা তখন মারাঠী দিদির সঙ্গে বকাবকি করে অত্যন্ত ধীর বিক্রমে সমস্ত রাগ শিলের ওপর দিয়ে বাটনা বাটছিল। এমন সময় তার পানখোকা ভরা মুখের ওপর কুটন্ত একটু ঝোল ছিটিয়ে সুশীলা বলে, দেখতো নুন দিয়েছি কিনা। দুর্গা বেচারী অত খেয়াল করেনি বলেছে হাঁ—ব্যাস এদিকে হরিপদ বলে কিনা বামুনদি আজ তরকারীতে নুন দিতে ভুলে গেছ আর যায় কোথায় সুশীলার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল দুর্গার ওপর।

"আ গেল যা ঘিয়ের কি তোর আড় নেই? ও মুখ পুড়ে যাক্—ও মুখে আগুন জ্বেলে যাও।" হরিপদ তো অপ্রস্তুতের একশেষ। সুশীলার সব ভালো কিন্তু ওর ভুল হলে বলার উপায় নেই মেজেঘেসে কেঁদে চেঁচিয়ে এক বিস্ফোট বাধাবে অনেক ঠেকে আমরা এ সময় অন্যমনস্ক থাকার ভাণ করি। অনেক সময় হয়তো ও নিজেই বলে

দেখেছ কি ভোলা মন। আর তুমিও তো কই বললে না যা? মনে মনে বলি বললে কি আর রক্ষে থাকতো? আজ বেশভিক দেখে হরিপদকে বলি কেন ছুনের কথা বলে তাই ওদব ঠেলে যেতে হয়। হরিপদ এতক্ষণ চুপ করে ছিল এবার বলে ওঠে "আমার খাবার কষ্টের কথা কি আমি বলেছি? বলুন বলেছি কোন দিন? আমি ভাবলুম এখন তো আর কেউ খাচ্ছি বললে একটু ছুন দিয়ে দেবে যাতে সকলের খেতে কষ্ট হবেনা। আমি পরের ছেলে"—সর্বনাশ এযে দেখছি কেউই সোজা কথা বলবে না পণ করছে বাধ্য হয়ে সুশীলাকেই বলি তুমিই তো গোলমাল বাধালে ছুন দিতে ভুললে তুমি আর দোষ হল দুর্গার। কেন ওকে কি চাখবার জন্যে মাইনে দিই আমি? ও চেখে ভুল বলুক—ঠিক বলুক তাতে ওকে কিছু বলা চলে না। অত বারবার চাখতে হয়তো তুমি চাখলেই পার? এবার গর্জনের সঙ্গে বর্ষণ সুরু হয় হাউ মাঁউ করে কাঁদতে কাঁদতে সুশীলা দুম করে কড়া নাড়িয়ে বলে—"না হয় গরীবই হয়েছি তাবোলে আমাদের জাত-ধর্ম নেই? বিধবা মানুষ তোমাদের ঐ প্যাজ মাছের রান্না কি করে মুখে দেব বলোত? চাইনা এমন চাকরী" বলে গর্ গর্ করে বেরিয়ে যায়। হরিপদ ভাতের থালা ছেড়ে উঠে পড়ে। পেছন ফিরে দেখি দুর্গাও নেই।

ছোট গল্প

শ্রীঅবনী নাথ রায়

প্রবন্ধ এবং কবিতার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি যতটা লক্ষ্যে পড়ে, তার চেয়ে ঢের বেশি চোখে পড়ে ছোট গল্পের ক্ষেত্রে। রবীন্দ্র নাথ এবং প্রভাত মুখোপাধ্যায় এই ছোট গল্পের ক্ষেত্রে আমাদের সাহিত্যে অগ্রদূত—কিন্তু আজ বলতে বাধা নেই যে সাম্প্রতিক যুগের ছোট গল্প ওঁদেরকে ছাড়িয়েছে। ওঁদের পরে প্রেমাঙ্কুর আতর্থী তার পরে কল্লোল যুগের শৈলজানন্দ, অচিন্ত্যকুমার, প্রেমেন্দ্র এবং প্রবোধ সান্যাল। ঐ সময়েই বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতি মুখোপাধ্যায় এবং মনোজ বসু। তার পর যাঁরা নাম করেছেন তার মধ্যে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্র মিত্র এবং হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় উল্লেখযোগ্য।

নরেন্দ্র মিত্র এবং হরি নারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে মধ্যে একটা তুলনামূলক সীমারেখা টানা যায়। হরি নারায়ণের মধ্যে প্লটের বাহাদুরি আছে—তাঁর বহু গল্প সবই প্লটের মনোহারিত্ব দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া। প্লট বাদ দিলে আর কোন বাহাদুরি চোখে পড়ে না। কিন্তু নরেন্দ্র মিত্রের গল্পে প্লট আছে কি না বোঝাই যায় না—এমন টেক্‌নিক দিয়ে গল্পের জাল বোনা। তিনি নিঃসন্দেহে বড় শিল্পী।

উপরের কথাগুলি মনে পড়লো সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নতুন একখানি ছোট গল্পের বই আমার হাতে পড়ায়। বইখানির নাম "রাগে আর অনুরাগে।" মানুষ যে বুদ্ধিবৃত্তির সমষ্টি নয় (a bundle of intellect) বরঞ্চ হৃদয়াবেগই (emotion) তার প্রাণ, এই বইখানি তার প্রমাণ। না হ'লে গল্প লেখক বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রিধারী, সরকারী বড় চাকরিতেও তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত—সুতরাং তাঁর হাত থেকে তাঁর বিদ্যাবত্তা এবং জ্ঞানের পরিমাণে প্রত্যাশা করা যেতে পারতো কতকগুলি নীরস পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ বার তথ্যসংগ্রহের অধ্যবসায়ে বিদগ্ধ সমাজ চমকিত হয়ে উঠতেন। কিন্তু তার বদলে তিনি লিখলেন কতকগুলি ছোট গল্প যার মধ্যে সহানুভূতি, পরদুঃখকাতরতা এবং মানুষের মনুষ্যত্বের প্রতি মমত্ববোধ সর্বপ্রধান। অর্থাৎ কি না তিনি তালবন, নীতি-দুর্নীতির চুল-চেরা বিচারের ভার অন্য পণ্ডিতের উপর ছেড়ে দিয়ে ইমোশানের পথ বেছে নিলেন যেখানে সৎ অসৎ নীতি-

কথার চেয়ে মানুষের মনের আদিম প্রবৃত্তি ভালবাসা বড় হ'য়ে উঠলো। বুকের মধ্যে এই দৃষ্টি না জাগলে আর যাই লেখা যাক ভাল গল্প কিংবা কবিতা লেখা যায় না।

কেমন ক'রে সেই কথাটা বলছি। ধরা যাক্ গ্রন্থকারের দ্বিতীয় গল্পটি যার নাম হৈমন্তী। অমীন্দ্র নাথ স্কুলের কলেজের মেধাবী ছাত্র ছিলেন কিন্তু সেই সঙ্গে ছিলেন অকপট আদর্শবাদী—যার অপর নাম আধুনিক ভাষায় দারুণ আন্‌প্র্যাক্‌টিক্যাল। কৈশোরে একদা একটি নীতির কথা শুনেছিলেন, গ্রামে গিয়ে শিক্ষকের ব্রত গ্রহণ কর, সেখানে নীরন্ধ্র অন্ধকার, সেই অন্ধকারের মাঝে যদি একটুখানিও আলো জ্বালাতে পারো, যদি একটি মাত্র ছাত্রকেও প্রকৃত শিক্ষা দিয়ে মানুষ ক'রে তুলতে পারো, তবে দেশের অনেকখানি কাজ করা হবে—ব্যস্, সেই অবধি ঐ নীতিকথাটি বীজমন্ত্র হয়ে রইল তাঁর জীবনে। নিজের জীবনে অনেক সম্ভাবনা ছিল কিন্তু কোনটাকেই তিনি আমল দিলেন না। করতে পারতেন বড় চাকরি—করলেন না। তিনি চাকরি নিলে গ্রামের ঐ প্রদীপ শিখাটি জ্বালাবে কে? বিবাহের দ্বারা জীবনের একটা মোড় ফিরিয়ে দিতে পারতেন—দিলেন না। সুন্দরী তরুণী প্রেমবিহ্বলা অ্যারিস্টোক্র্যাটিক মেয়ে পায়ের কাছে এসে ফিরে গেল। কারণ ঐ একই—তাঁর আদর্শ। ঐ আদর্শ আঁকড়ে পড়ে রইলেন। জীবনে এল দারিদ্র্য—সেই সঙ্গে তাঁর সাংসারিক প্রতিষ্ঠা সুদূর হ'য়ে গেল। তিনি যে একটা কিছু—তিনি যে অনেক ত্যাগ ক'রে বহু কষ্টিন অসাধারণ জীবন বেছে নিয়েছেন সে কথা লোকে ভুলে গেল। যারা কিছু করতে পারে না তিনি সেই বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো বাউণ্ডুলে শ্রেণীভুক্ত হয়ে গেলেন। বিবাহ ও করলেন একদিন ঐ আদর্শের তাড়নায় অর্থাৎ বিনতিকে অশীতিপর বৃদ্ধ বরের হাত থেকে বাঁচাতে। সব চেয়ে কঠিন আঘাত হল এই যে যাঁরা একদা তাঁর জীবনের উষাকালে ঐ সঙ্কল্পমন্ত্রের বাণীটি উচ্চারণ করেছিলেন তাঁরা নিজেরাই ক্রমশ সরে গেলেন ঐ ক্ষেত্র থেকে—কেউ চোরা বাজারের মহিমাময় 'লাল' হয়ে গেলেন, কেউ হলেন বেতা এবং তদনুরূপ প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন, কেউ হলেন মিনিষ্টার বা এমনি আর কিছু। কিন্তু অমীন্দ্র নাথ পড়ে রইলেন সেই গেঁয়ো মাষ্টার হ'য়ে—নিশ্চিন্ত বিংশ শতাব্দীর আলোকজ্জ্বল সভ্যতা থেকে অনেক পিছিয়ে।

একদিন অমীন্দ্রনাথের জন্ম তিথিটি বৃথা নিষ্ফলে এসে উপস্থিত হ'ল কিন্তু কেউ তাকে অভ্যর্থনা করবার নেই—কেউ সেই দিনটির তাৎপর্য স্মরণ করলো না। এমন কি নিজের স্ত্রী বিনতিও নয় যাকে তিনি জীর্ণ লোলুপতার গ্রাস থেকে রক্ষা করবার জন্যে নিজের আজীবনের সাধন কৌমার্য স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছিলেন।

এমন দিনে এল তাঁর একটি পুরাতন ছাত্র যার স্কুলের বেতন দিয়ে তিনি একদিন তার লেখাপড়া করবার সামর্থ্যকে সম্ভব ক'রে দিয়েছিলেন। হাতে তার অনেকগুলি নোট—মৃতা জননীর উপদেশ স্মরণ ক'রে গুরুর ঋণ শোধ করতে এসেছে। টাকা তিনি নিলেন না অবশ্য—ঐ টাকায় আর একটি দুঃস্থ ছাত্রের পড়ার ব্যবস্থা করবার উপদেশ দিয়ে ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু তাঁর মনুষ্যত্বকে স্বীকার করার আলোকে তাঁর জন্মতিথি সার্থক হ'য়ে গেল।

এমনই হয়। যাঁরা চিরাচরিত পথ থেকে সরে গিয়ে অনেক বড় হ'য়ে যান, সামাজিক ভাল মন্দর মাপকাটিতে মানুষ যখন তাঁদের আর বেড় পায় না, তখন মানুষ তাঁদের অস্বীকার করে, হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করে। কতকটা বিদ্বেষের আত্মসম্মান বজায় রাখার চেষ্টায়, কতকটা বুঝতে না পারার ফলে। কিন্তু কোথাও যদি এই মহত্ত্ব আশ্রয় না পায়, তবে এ বেঁচে থাকবে কোন চিত্তভূমির উপর? তাই সাহিত্যিককে তার নিজে হয় যুগে যুগে এই আদর্শ বাঁচিয়ে রাখবার—সমাজে এই আদর্শকে উঁচু ক'রে ধরে মানুষকে চিনিয়ে দেবার—সুধাংশু মোহন তাই করেছেন।

তাঁর তৃতীয় গল্পটিতেও ঐ দৃষ্টিভঙ্গীরই আর একটা দিক ফুটে উঠেছে—যার নাম দিয়েছেন ভোড়ী। এক বিরাট বনেদী এবং ধনী পরিবারের শেষ প্রতিনিধি মেজো বাবু—শেষ বলছি এই হিসাবে যে এই প্রকৃতির লোক এখন আর জন্মাচ্ছে না, শেষ হ'য়ে গেছে। এঁরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের একটি বিশেষ টাইপ—ইচ্ছা করলেই এই ধরণের লোক জন্মায় না বা এঁদের গড়ে তোলা যায় না। যে পারিপার্শ্বিকে এঁরা গড়ে উঠতে পারেন সে

পরিবেশ এখন লুপ্ত। এঁরা প্রেমে পড়েছেন, টাকা উড়িয়েছেন, মদ খেয়েছেন, বাইজী নাচিয়েছেন, শাল পড়েছেন টোলের পণ্ডিত রেখে, গান গেয়েছেন, ওস্তাদদের গান শুনেছেন, নতুন সুর তৈরী করেছেন, মিল বেয়ার ক্যাণ্ট ম্যাকমুদন পড়েছেন তখনকার দার্শনিক পণ্ডিতদের সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে—মোট কথা জীবনের কোন দিকে এঁদের বিমুখতা ছিল না বা কোন রস এঁদের কাছে অশেষ ছিল না। কিন্তু একটা কথা—কোন ছোট কাজ বা অন্যায় কাজ এঁরা করেন নি। নীচতা জিনিষটা এঁদের মনের আনাচে কানাচে কোথাও ছিল না। তাই এঁদের কথা বলতে হয়—নাতে প্রকৃতির আশ্চর্য্য উৎপাটনের নীতি অনুসারেই এঁরা একদিনে বিস্মরণের কোঠায় গিয়ে পড়তেন।

এমনই এক ছিয়াশী বছরের বৃদ্ধ মেজো বাবুর কাহিনী বর্ণনা করেছেন ঘরনী লেখক। যাঁর যৌবন হয়েছে অবলুপ্ত, অর্থ অপগত, সঙ্গীরা অপসারিত—কিন্তু তবু তিনি বেঁচে রয়েছেন তাঁর জীর্ণতা নিয়ে, অক্ষমতা নিয়ে—আর? আর মনোরম্য যৌবনের স্মৃতি নিয়ে। সেই ঘটনাশ্রেণী আজ নেই, সে যুগের আব্‌হাওয়া ও আজ নেই কিন্তু যে ঘটনাগুলি ঘটেছিল তা-ও কি মিথ্যে হ'য়ে গেছে? তার সাক্ষ্য মিলবে কোথায়? এর উত্তর তার সাক্ষ্য মিলবে সাহিত্যের বুকে। যার মধ্যে মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে তাকে সাহিত্য আশ্রয় দিয়ে বাঁচিয়ে রাখবেই।

মেজো বাবু একদা ভালবেসেছিলেন একটি খৃষ্টান মেয়ে মেরিকে। বিয়ে অবশ্য তাঁদের হয়নি—বাবা জোর করে মহাকুলীন বংশের মেজো গিন্নির সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন। মেজো গিন্নিকে তিনি কোনদিন অনাদর করেন নি—তাঁদের ছেলেমেয়েও হয়েছিল। কিন্তু প্রিয়াকে না পাওয়ার ব্যথা তিনি নিজের বুকে অনুভব করেছিলেন। সেই ব্যথা কাজে লাগলো অন্য একটা ক্ষেত্রে। তাঁর সেই দুরন্ত যৌবনের দিনে গানের আসরে তবলা বাজাতে এগিয়ে এসেছিল একটি কিশোর যুবক রসিক মোহন। বিখ্যাত ওস্তাদ কৈলাস খাঁয়ের সঙ্গে অবলীলাক্রমে সঙ্গত করেছিল। তাকে তিনি নিজের পরিবারে স্থান দিয়েছিলেন। এই রসিক মোহনই এখনো তাঁর বৃদ্ধ বয়সের সঙ্গী এবং শুশ্রূষাকারী। বাড়িতে ছিল তাঁর বিধবা একটি ভাগ্নি—নাম অনুরাধা। মেয়েটির মধ্যে ছিল সত্যিকারের গানের সুর—ঐ গানের সুত্র ধরে সে রসিকমোহনকে ভাল বেসেছিল। মেজো বাবু কোন প্রেমকেই অসম্মান করতে জানতেন না—তাঁর খেয়াল হল রসিকমোহনের সঙ্গে অনুরাধার বিয়ে দেওয়া হোক্—তৈরেঁায় সঙ্গে ঘোড়ীর মিল করে দেওয়া হোক। প্রস্তাবটা দিয়ে নিজে গেলেন শিকারে—শিকার থেকে ফিরে এসে বিয়ে দেবেন। ইতিমধ্যে কথাটা কানাকানি হ'তে দেরি হল না—লোকের গঞ্জনায় অনুরাধা জলে ডুবে আত্মহত্যা করলো। মেজোবাবু ফিরে এসে পাগলের মত হ'য়ে গেলেন। রসিকমোহন এই ঘটনার পর বিষাদ নিতে চেয়েছিলেন—মেজো বাবু ছাড়েন নি—বলেছিলেন একই সূত্রে বাঁধা দুই মন। নিজেই সংসার থেকে সরে গিয়েছিলেন—নদীর ধারে বাগানবাড়িতে আস্তানা গাড়লেন রসিকমোহনকে নিয়ে।

সংক্ষেপে এই হল গল্পের উপজীব্য। ঘটনা লিখলে হয়ত শুনতে বেশ মিষ্টি লাগে কিন্তু সংসারে এই ঘটনা (বা দুর্ঘটনা?) ঘটতে পারে কয়জন? মেজো বাবু তাদেরই মধ্যে একজন যাদের বুকের পাটা মস্ত বড় এবং যারা পরের ব্যথা নিজেদের বুকে অনুভব করতে পারেন। বিবাহ একটা সামাজিক প্রথা—সমাজকে বিশৃঙ্খলা থেকে বাঁচানোর একটা উপায়। কিন্তু প্রেম কি তার চেয়ে বড় নয়?

বইখানিতে সতেরোটি গল্প আছে কিন্তু প্রত্যেক গল্প সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করবার স্থান এ নয়।

লেখকের ভাষা সাবলীল, এমন কি মাদকতাপূর্ণ ও বলতে পারি সঙ্গে পদ্যের সুর বর্ত্তমান। একটু নমুনা দিচ্ছি:—"তাঁদের বংশের তখন জোর রমরমা, প্রকাণ্ড তাঁদের বিষয় সম্পত্তি, প্রচণ্ড তাঁদের শাসন, বিরাট তাঁদের বোলবোলা। যেন অনন্ত ধনধান্যের ধাঁটি ঘিয়ের কড়ায় ফুটন্ত বুদ্বুদে আভিজাত্য ফুটছে টগবগ করে। তাঁদের নীল রক্ত তখনো পাক্কা নীল, লাল শুধু ধমনীতে, মনে নয়, চালে নয়, চলনে বলনে নয়। শুধু মেজো বাবুই ছিলেন চলন্ত ব্যতিক্রম।" (৫৫ পৃঃ) রচনার প্রতিটি ছত্রে সুরুচির এবং শালীনতার সুর ধরা হ'য়ে আছে। সবচেয়ে

আমার ভাল লেগেছে বইয়ের গোড়ায় লেখকের নিবেদন-টুকু। সেখানে শেষ লাইনে তিনি বলেছেন" "আর আমার শুভ প্রণাম রইলো পথের এক প্রান্তে মাটি মায়ের ধূলোর পরে, যেখান দিয়ে দিন রাত্রি জীবন-দেবতার রথ চলেছে রাগে আর অনুরাগে।" এই ত আমাদের সনাতন ভারত-বর্ষের আদর্শ এবং ঐতিহ্য এবং ঐ কথা কয়টির মধ্য দিয়ে ঐ আদর্শের প্রতি লেখকের আন্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছে। জীবন-দেবতার রথ নিত্যই চলছে। প্রতিনিয়ত অনুরাগে, অনুকম্পায়, আশীর্বাদে, কল্যাণে কিন্তু সেটা চোখে পড়ার সৌভাগ্য সকলের হয় না। সেই সৌভাগ্যের দিক থেকে লেখকের "রাগে আর অনুরাগে" নাম পরিস্ফুট হয়েছে।

বৃন্ত-ঝরা

(গল্প)

শ্রীমতী কণা দেবী, ভারতী

'সুখের ঘরে দুখের বাসা'—এই প্রবাদ বাক্য সব সময় সত্য বলে মেনে নেওয়া যায় না। একটি জীর্ণ একতলা বাড়ীর মালিক, পুরোহিত হরিহর পণ্ডিতের ষষ্ঠ কন্যা হেনাকে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন এ কথা, মনে মনে নয় প্রকাশ্যে। প্রথম যৌবনে, কালিদাসের কাব্য-রসময় হরিহরের ভাবুক মন যখন রঙীন স্বপ্নে বিভোর, তখন জন্ম নিল তার প্রথমা কন্যাটি। বাপ সাধ ক'রে মেয়েটির নাম রাখলো উমা। উমার পরের বোনটির নাম হ'ল ক্ষমা। এ নামটাও নীরস নয়; কিন্তু তৃতীয়া কন্যার জন্ম হতে হরিহরের বড় দিদি খুবই বিরক্ত হ'য়ে তার নাম রাখলেন আন্না,—অর্থাৎ আব-না। বরাত! পরের বছরই 'ভাই-পো' দেখার সাধে ছাই দিয়ে এল চতুর্থী কন্যাটি। পিসিমা হতাশ হ'য়ে, ভাইঝির নাম রাখলেন—চায়না। কিন্তু চায়না বললেই চাওয়ার শেষ হবে এমন কোন আইন নেই। ক'বছর পরে এক শিশু এল, এবং সেও মেয়ে। এবার হরিহরের কলেজে পড়া নব্য যুবক ভালকটি ভাগ্নীর নাম রাখল—'ইতি।'

দেশের সামান্য জায়গা-জমী বিক্রী ক'রে অতি সাধারণ ঘরে উমা ও ক্ষমার বিয়ে দিতেই হরিহরের মাথায় বিরাট টাক পড়ে গেল। বরাত-দোষে মেয়েগুলি আবার মাতৃ-কুলের ঘন-ঘোর কালো রংটি নিয়েই জন্মায়। বিয়ের বাজারে কালো মেয়ে চালানো গরীবের কাছে যে কিরূপ দুরূহ কার্য, তা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। যাক, চায়না, আন্না ইতির রংটা পুরোপুরি মাতৃকুলের কাছ ঘেঁষে না যাওয়াতে এরা এক পৌঁছ কপো হ'য়েছে। ওদের বিয়ে কিছু দিন পরে দিলেই চলবে।

ঘর-দেনাগুলি হরিহর প্রায় মিটিয়ে এনে ফেলছেন; ঠিক সেই পরিস্থিতিতে যদি আবার কন্যা লাভ হয়, তবে কোন লোকের মন-মেজাজ ভাল থাকার আশা করা যায় না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, হরিহর, তার স্ত্রী সুষমা, ভগ্নী যোক্ষদা দেবী সবারই মন প্রসন্ন হ'য়ে উঠল নবজাত মেয়েটিকে দেখে। মেয়ে তো নয়;—এ যেন এক অঞ্জলি-ভরা তাজা জুঁই ফুল। দেখে চোখের পলক আর পড়তে চায় না। প্রতিবাসীরাও মুগ্ধ; বহুদর্শী যাঁরা, তাঁরা বললেন, এক পয়সাও লাগবে না এ মেয়ের বিয়ে দিতে। সেই মাসীই এসে অনেক কাব্য-কবিতার বই ঘেঁটে এর নাম রাখলো—'হেলেনা।' বিশ্ববিমোহিনী হেলেনার নাম শুধু রূপের জন্য সৃষ্টি হয়নি; এই নামের ছোঁয়া লেগে ভবিষ্যতে সার্থক, সুন্দর হ'য়ে উঠবে একটি 'ছোট নীড়,' এই ছিল তার আশা। বিজাতীয় নামের বিরুদ্ধে যোক্ষদা ঠাকুরাণীর কোন আপত্তি টিকলো না; শুধু ছাট-কাট দিয়ে তাকে নাম দাঁড়ালো—'হেনা।'

দিন কেটে যায়। খেলা ঘরের পুতুল খেলার মাঝ দিয়ে হেনাও একদিন বড় হ'য়ে উঠলো। তার সব

দিদিদের বিয়ে হ'য়ে গেছে। মেয়েটি তার রূপ সম্বন্ধে একটু বেশী মাত্রায় সচেতন। স্বাভাবিক রূপকে, একটু ঘসে মেজে আরো সুন্দর করে তুলতে কোন সুন্দরী মেয়ের ইচ্ছা ক'রে না? সাজতে হ'লে চাই—রঙীন শাড়ী, সিঁদুর, স্নো-ক্রীম। এ-সব কোথায় পাবে সে? কিন্তু তার আবদার না মানলে উপায় নেই। হরিহরের মেয়ের সাধ মেটাতে সাধ্যমত চেষ্টা করেন। গরীবের ঘোড়া-রোগ এ। তাই সংসারের খুটো গাছাটি নেড়ে, সংসারের উপকার করার মতিগতি হয় না তার। মার সঙ্গে মেয়ের ঝগড়া লাগে, মোক্ষদা ঠাকুরাণী গজ-গজ করেন। দারিদ্র নিরানন্দ পরিবেশের মধ্যে হেনা জীবন্ত; হাসে, গান গায়, অল্প দামের স্নো-পাউডারে নিজেকে সাজায়; সিল্কের শাড়ী না পেলেও সব-রঙা মিলের শাড়ীই যত্ন ক'রে পরে ঘুরে বেড়ায় রঙীন প্রজাপতিটি। রাতে ঘুমিয়ে হেনা স্বপ্ন দেখে—রাজপুত্র বর তাকে বিয়ে করতে আসছে, চতুর্দোলে চেপে। আর তাকে দেখে হরিহরের মনের কোণে ক্ষীণ আশা জেগে ওঠে সময়ে সময়ে। সত্যি কি মেয়েটা কারু সুনজরে পড়বে একদিন,—খুশী হ'য়ে, আদর করে সে বিয়ে ক'রে নিয়ে যাবে ওকে!

হরিহরের আশা ও হেনার স্বপ্ন বুঝি সার্থক হয়; তবে রাজপুত্র নয়, জমিদারের ছেলে। এই দিঘলকান্দা গ্রামজোড়া জমিদার, নরেন্দ্র নারায়ণ চলার পথে হেনাকে এক নজর দেখেই পুত্র বধূ করতে চাইলেন। শীঘ্রই শুভ লগ্নে মহাসমারোহে হেনার বিয়ে হয়ে গেল নরেন্দ্র নারায়ণের একমাত্র ছেলে দীপ নারায়ণের সঙ্গে। মেয়ের বাপের একটি পয়সা খরচ করালেন না জমিদার। বিয়ের পরদিন বেশ দামী বেনারসী ও জড়োয়া গয়নায় সেজে, সুন্দর সাজানো মটোর গাড়ীতে চেপে, হাজ-রাণীর মতই হাসতে হাসতে, শ্বশুর-বাড়ীর পথে চলে গেল হেনা। পথে অনাঘ্রাদিত আতি আতোর নিবিড় স্পর্শে মন কেমন হ'য়ে গেল তার। মন তার তখন একছুটে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিতে চাইল, সেই ভাঙা, একতালা বাড়ীটার যে কোন ঘরের কোণে। মায়ের অশ্রু-সজল মুখ, বোনদের স্নেহ-করুণা-মাখা দৃষ্টি, বুড়ী পিসিমার রাগ হ'লে গালাগাল, একে একে মনে পড়ে, চোখের জল ছল্-ছলিয়ে ওঠে। ক্রমে পথ ফুরিয়ে আসে। পল্লী-সহরে শ্বশুর-বাড়ীর প্রকাণ্ড সিংহ-দরজা চোখে পড়ে। আলোকময় বিরাট প্রাসাদ দেখে সে অল্পক্ষণ অতীতকে প্রায় ভুলে গেল। রূপ কথায় শোনা রাজপুরী বলেই মনে হ'ল ও-সব। নহবতখানার সানাই তখন পূরবীর সুরে আকাশ বাতাস মাতিয়ে তুলেছে। বহুচক্রের আলপনার ওপর সুন্দর ছোট্ট আলতা-পরা পা দু'খানি রেখে নববধূ দাঁড়ালো। মোটা-সোটা সুন্দরী গৃহিণী হীরের কঙ্কণ-পরা হাত নেড়ে বধূ-বরণ করলেন। এবার শাশুড়ীর বধূ-মুখ দেখার পালা। ঘোমটা তুলে ধরতেই উপস্থিত মেয়েরা দল এক মুহূর্ত নীরব থেকে কলরব করে ওঠেন—"চমৎকার বউ হয়েছে।" একটি জড়োয়া-নেকলেস বউএর গলায় পরিয়ে দিয়ে গৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন—তোরা থাম। রূপ ধুয়ে খাব? বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে বাপুর। কোথা থেকে একটা বাচ্চা মেয়ে ধরে নিয়ে এল; একে তৈরী ক'রে উঠতে উঠতেই আমার মরবার সময় হ'য়ে যাবে। তা'ছাড়া, গরীব বামুন-পণ্ডিত-ঘরের আচার ব্যাভার! কথায় আছে, সমান ঘর, সমান বর! একী? দারা রাত্তা কেঁদে-কেটে চোখ দু'টো ফুলিয়ে এনেছে দেখছি! আঃ—অমন বড় বড় চোখে সব দিকে তাকিয়ো না, বাছা! ঘোমটা খুললে চোখ নীচে নামিয়ে রাখতে হয়। হেনা ভয়ে চোখ বুজে ফেলে; আর তাই দেখে হেসে ওঠে তার সদ্য-বিবাহিতা ননদ—দীপালী। হেসে বলে সে—"ওমা,—বউ যে ভয়ে চোখ বুজে রইল' আহা, কথা শোন! তের-চৌদ্দ বছরের মেয়ে আবার বাচ্চা নাকি? তুমি স'রে দাঁড়াও, মা; আমি বউএর মুখ দেখব।" মাকে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে দীপালী এবং বউএর কানে খানিকটা মধু ও মুখে একটু সর চুকিয়ে দিয়ে বেশ সরল স্বরে বললো—"আমি তোমার ননদ হলেও অনেক বড়; তাই 'দিদি' বলে ডাকবে—কেমন? বেশ বউ তোমার হয়েছে, মা!" মুহূর্ত তেলভেটের কেসটি খুলে এক জোড়া চুড় বউএর হাতে পরিয়ে দিতে দিতে বললো দীপালী, শিখিয়ে পড়িয়ে নিলে আবার ক'দিন লাগবে ঠিক হ'তে।" দীপালীর কথাগুলি তারী ভালো লাগল হেনার। ভীরু চোখ তুলে, ঘোমটার ফাঁক দিয়ে

দীপালীকে একবার দেখে নিল। ভাবে—ঘরলোকের মেয়েরাও মিষ্টি সুরে কথা বলতে পারে! সেই মুহূর্তে দীপালীর সঙ্গে তার মিতালি হয়ে গেল মনে মনে। শাশুড়ীর চেয়ে দিদি-শাশুড়ী বুড়ীকে তার অনেক ভাল লাগল। কোকলা মুখে হেসে বুড়ী নাতবউকে কোলে বসিয়ে কত আদর করলেন। তাঁর সঙ্গে সে দু'চারটা কথাও বলেছিল। তাই দেখে পুরোণো ঝি—কুসুম মুচকি হেসে বললো—"অত কথা বোল না, বউ-রাণী! নতুন-বৌ কিনা; লোকে নিন্দে করবে।" হেনার বয়স কম হ'লেও, বুদ্ধি কাঁচা ছিল না। মেয়েটি বুঝে নিল, শুধু রূপের জোরেই সে এ-বাড়ীর বৌ হ'তে পেরেছে। এ-বাড়ীর উপযুক্ত হবার জন্য সব গুণই তাকে শিখে নিতে হবে। বুদ্ধিমতী মেয়ে, পরের দিন থেকেই শ্বশুরের বেতো-পায়ে হাত বুলিয়ে দেওয়া, শাশুড়ীর পাকা চুল বাছা ও দিদি-শাশুড়ীকে রামায়ণ শোনানো—এই কাজগুলি নিখুঁত ভাবে আয়ত্ত ক'রে নিয়ে, সবাইকে প্রসন্ন ক'রে তুললো। শুধু একটা দুঃখকে মনে মনে চেপে রাখত হেনা। বাপের বাড়ীতে বউ-পাঠানোর নিয়ম এদের নেই। 'মা, তোমাকে দেখতে খুব ইচ্ছা করে' বলে, পর পর দুখানা চিঠি লিখেও সে কোন উত্তর পেলনা কেন—তারী অবাক হ'য়ে ভাবে এ কথাও।

এই ভাবেই বছরের পর বছর কাটে। হেনা এখন আর কিশোরী নেই। শ্বশুর-বাড়ীতে সে প্রায় নিঃসঙ্গ; ননদ দীপালী থাকে তার শ্বশুর-বাড়ী; অসংসারী স্বামী তো ছিলে-ছাড়লে। সে সারাদিন এ-মহলে সে-মহলে আপন মনে ঘুরে বেড়ায়; ঘুম পেলে, মার্বেল-পাথরের মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে ঘুমোয়,—স্বপ্নে দেখে তাদের সেই ভাঙা বাড়ী, স্মৃতির পটে ম্লান-হ'য়ে-যাওয়া হারাণো দিনের আরো অনেক ছবি। ঝি'র ডাকে চমকে উঠে পড়ে; শাশুড়ী বকে রাগ করেন, বলেন—"ঘর দোর কী নেই, বাছা? ঝিয়ের মত যেখানে সেখানে শুয়ে ঘুমোও কেন?" সন্ধ্যা বেলাটা ভালই কাটে দিদি শাশুড়ীর ঘরে। কত ছড়া-গান শোনান বুড়ী, ঠাট্টা ক'রে বলেন—"এমন বধূ থাকতে বঁধু বনে, জঙ্গলে পক্ষ-পাখী শিকার ক'রে বেড়ায় দিন-রাত! পোড়া কপাল আমার! এবার বাড়ীতে এলে আঁচল, নয়তো ওই লম্বা বেণীতে বেঁধে ঘরে ভরে রাখবি। কেমন?" দীপ নারায়ণ প্রায় দিনই বাড়ীতে থাকত না। শিকারই তার জীবনের একমাত্র নেশা।

হেনাও ঠাট্টা করে বলে—"দেখলেই যে ভয় করে, দিদিমা! ওই বিরাট চেহারা, তার ওপর আবার ঘুঙুলে নাক তাকে কী!"

"ও কথা বলতে নেই; স্বামী হচ্ছেন শিব। স্ত্রীর চোখে স্বামী কী কালো ধলো হয় লো?"

তখন এই বাড়ীর পুরোণো দিনের এক গল্প বলেন, "বহুদিনের কথা, এই পরিবারের এক বৌ স্বামীর মৃত্যু শয্যার পাশে বসে স্বামীর সেবা করছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর এক-ঘণ্টা আগে সুস্থ বউটি হঠাৎ হার্টফেল করে মরে যান। সধবার মৃত্যু,—বড় ভাগ্যবতী নারী সবাই ধন্য ধন্য করল। এক সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীকে দাহ করা হল; আর চিতার ওপর তৈরী করা হল, একটি বড় মন্দির। ছাদে দাঁড়িয়ে ঐ—ঐ-দিকে তাকিয়ে দেখলে সতীপতি-শিবের মন্দির দেখতে পাবে।"

শুনতে শুনতে হেনার চোখে ঘুম নেমে আসে; ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে—প্রবাসী রাজ-পুত্রের নয়, রঙ্গিনী রাজ-কন্যার।

রাজ বাড়ীর খবর সহজে বাইরে বেরোয় না। দাস-দাসীদের মাধ্যমে এক-আধটু বদালো খবর মাঝে মাঝে বাইরের বাতাসকে সচকিত করে তোলে। সম্প্রতি ঐ বাড়ির একটা বন্দী কথা মুক্তি পেয়েছে। তা শুনে পাড়া-প্রতিবাসীরা বিস্ময় বোধ করে। জমিদারের ছেলের খুব অসুখ নাকি।

সত্যিই কুমারের বড় অসুখ। শহর থেকে বড়-বড় ডাক্তার আনা হচ্ছে; বাঁচবার আশা খুবই কম। সবচেয়ে বড় সংবাদ—জমিদারের কুলগুরুকে কাশী থেকে আনানো হয়েছে। দেবতার প্রসন্নতা লাভের যে কোন একটি সূত্রের সন্ধান যদি তাঁর কাছে মেলে। গুরুদেব—স্বামী বৈষ্ণবানন্দ একজন বড়-বড় তন্ত্র-সাধক। দীপ নারায়ণের স্ত্রীর কোষ্ঠী বিচার করে তিনি বলেছেন, বধূর জীবনে 'বৈধব্য যোগ'

আছে, তবে সেটা এতই সূক্ষ্ম ব্যাপার যে, সাধারণ জ্যোতিষীর চোখে তা ধরা পড়ারই কথা। মনে, হচ্ছে, এই বিয়ের পূর্বে কোষ্ঠী ঠিক ভাবে মিলিয়ে নেওয়ার বুদ্ধি কারো মনে উদয় হয়নি।' অতএব দীপ নারায়ণের মায়ের দৃঢ় বিশ্বাস হল, কোষ্ঠী না মিলিয়েই হতভাগা পণ্ডিতটা তার অলক্ষ্যে মেয়েকে এই ঘরে চালিয়ে দিয়েছেন। এখন কি করা যায়? গুরু বলেছেন, 'মৃগালাদি যজ্ঞ' করবেন তিনি। বড়ই কঠিন সেই যজ্ঞ; তবে করতে পারলে, সুফল-লাভ নিশ্চিত। যথা সময়ে মহা সমারোহে যজ্ঞ-ক্রিয়াদি শুরু হয়েছে; অপর দিকে চলেছে বড়-বড় ডাক্তারদের আনা-গোনা। আত্মীয় ও আত্মীয়-স্বজনের মুখে চোখে গভীর উৎকণ্ঠা এবং তীব্র কৌতূহলের ছাপ পাশাপাশি। অনিশ্চিত সংবাদ পাবার জন্য প্রতিবাসীদের দু'শ্চিন্তাও কম নয়। আর, হেনার অবস্থা দাঁড়িয়েছে, বলির পূর্বেকার ছাগ শিশুর অবস্থার মত। কপালে কৌটা, গলায় মালা, বেশ-ভূষায় অবস্থিতি; কিন্তু ওই সামনে যূপকাষ্ঠ—মৃত্যু ভয় ভরা। হেনাও যেন দেখছে তার চারিদিকে অদৃশ্য অকল্যাণ-মূলের সারি; অস্থির হয়ে ওঠে, স্তব্ধ হয়ে যায়। রোগীর ঘরে ঢোকার অধিকার, সে ছাড়া এ বাড়ীর সবারই আছে। বৌ নারায়ণ ওকে দেখলেই সভয়ে বলে—"ও রাক্ষসী। আমাকে খেতে এসেছে।" শাশুড়ী তার দিয়েছেন,—'ডাইনী দৃষ্টি দিয়েই সোনার চাঁদের এই অবস্থা করেছে। ঐ সর্বনেশে দৃষ্টি থেকে ছেলেকে রক্ষা করা মায়ের কর্তব্য।' তাই বউকে ছেলের ঘরে ঢুকতে নিষেধ করে দিয়েছেন। এ-বাড়ীর কেউ আর হেনার সঙ্গে ভালো ক'রে কথা বলে না; কেমন চোখে তাকিয়ে দেখে সবাই। কেবল দিদি-শাশুড়ী-বুড়ী তার ব্যথা ঠিক ভাবে বোঝেন এবং সেই ব্যথা কমানোর জন্য মিষ্টি কথাও বলেন মাঝে-মাঝে। হেনা তাই তাঁর কাছে ছুটে যায়, সময় কাটানো অসম্ভব হলেই।

আজ দীপনারায়ণের অবস্থা খুবই খারাপ। বিকালে ডাক্তার বাবুরা বলেছেন—"এ রাতটা কাটলে তবে"—চমকা হাওয়ার মত খবরটা চারিদিকে ছড়িয়ে যায়। এ-ঘরে পড়ে হেনা কোন্ অচেনা ভীষণ লগ্নের প্রতীক্ষা করে। শেষে মাঝরাতে সবর আর কাটতে চায়না। দিদিমার ঘরে যাবার জন্যে উঠে পড়ে সে; কিন্তু বেরিয়েই স্পষ্ট আলোয় দেখে—প্রাণহীন পাষাণ প্রতিমার মত দাঁড়িয়ে আছেন শ্বশুর—স্থির-দৃষ্টি তারই দিকে। বউমাকে দেখে তিনি কেঁদে ওঠেন এবং পাগলের মত এগিয়ে এসে তাকে ধরে বলেন—"মা, বউমা, সধবার যে পাওয়া গিয়েছিল, তোমার সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় থাকবে? এ কি হতে যাচ্ছে, মা?" প্রৌঢ়ের চোখ দিয়ে ঝর ঝর ক'রে জল ঝরতে থাকে।

হেনা একটু দাঁড়িয়ে থাকে—নিশ্চল, নিষ্পন্দ! তারপর ধীর স্থির স্বরে বলে—"আপনার কথা মিথ্যা হবে না, বাবা!"

"হবে না, হবে না, মা?"

"না"—দৃঢ় স্বরে বলে হেনা।

ওর মুখটি বেশ করে দেখে নিয়ে নরেন্দ্র নারায়ণ চলে গেলেন। হেনাও চুপি-চুপি, চোরের মত এসে, এ-বাড়ীতে একমাত্র আপন জনের ঘরে ঢুকলো। আফিং খোর বুড়ী দিদি-শাশুড়ীর ও চোখে ঘুম নেই আজ। হেনার পায়ের ভীরু শব্দ শুনে করুণাভরা স্বরে বলেন—"আয় বোন।"

হেনা বুঝতে পারে না কথা। ভয়-ভরা বললো—"আমি, দিদিমা।"

"আয়, একটু শো কাছে।"

হেনা পাশে বসলো নীরবে। বললো একটু পরে—"তোমার ঘুম পায়নি, দিদিমা?"

"ঘুম? হাঁ, পাবে। তুই শো, কাছে আয়।"

"আমি তোমার মাথার চুল টেনে দিচ্ছি। ঘুমোও তুমি।"

—হেনা বুড়ীর পাশে শুয়ে তার মাথার চুল টেনে দিতে থাকে। কিছু-পরেই হেনা বোঝে যে, দিদিমা ঘুমিয়ে পড়েছে। অমনি নাক ডাকলেই দিদিমা ঘুমিয়ে পড়ে, হেনা জানে তা। সাময়িক ঘুমে বাস্তবীকে ঘুম পাড়িয়ে হেনা নিজের চিরনিদ্রার ব্যবস্থা করতে চললো। বুড়ীর মাথার বালিশের নীচ থেকে তার বড় আফিং-এর কৌটোটি নিয়ে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে—ঢুকলো নিজের ঘরে। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সর্বনেশে দুর্যোগের মন কালো মেঘ মাথার ওপর থেকে যেন সরে গিয়েছে। ঘরে-বাইরে টানাটানি খেলায় মানুষ

হয়তো হয়েছে আরো। দীপ নারায়ণের অবস্থার ভোরের দিকে উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল। ডাক্তার বাবুরা আশ্বাস দিলেন—"আশু বিপদাশঙ্কা নেই।" রোগী শান্তভাবে ঘুমোচ্ছে। বাড়ীতে বেশ স্বস্তির ঢেউ বয়ে গেল। যজ্ঞের ব্যর্থ হোমাগ্নি ছেড়ে, বঙ্কিম চোখে উঠে এলেন ভৈরবানন্দ; শান্তি জল দিলেন সকলকে—গ্রহ শান্তি হয়ে গেছে। কেউ হাসে, কেউ কাঁদে আনন্দে। হঠাৎ শাশুড়ীর মনে পড়ল বউএর কথা। তিনি অমনি ছুটে গেলেন বউমার ঘরে। রুদ্ধদ্বার!—

কর্তা এলেন; শেষে গেল ঝীপালী, আরও কত কে।—"বড্ড ঘুম-কাতুরে মেয়ে; এত বেলাতেও মা আমার ঘুমুচ্ছে দেখ!" মধুমাখা কণ্ঠে শাশুড়ী বললেন। ডাকলেন আবার—"ও বউমা, দোর খোল, মা! সতী সাবিত্রী আমার! ওর বরাত ভাল বলেই তো ছেলে আবার ফিরে পেলাম।"

কিন্তু বউএর সাড়া মিলল না। ব্যস্ত হয়ে শ্বশুর ডাকেন—"বউমা।" ননদ ডাকে—"বৌদি" পরিচারিকারা "বউ রাণী" বলে ডেকে সারা। "ধরধরা কণ্ঠে শাশুড়ী বললেন—"ভেবে আর কেঁদে বাছা আমার বেহুঁশ হয়ে ঘুমোচ্ছে।"

নিপুণ গৃহস্বামীর মধ্যে প্রকৃত মানুষের প্রাণ ছিল। কি ভেবে তিনি উন্মনা—অস্থির হ'য়ে উঠলেন হঠাৎ। অবিলম্বে দরজা ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিলেন তিনি। খিল ভেঙে ঘরে ঢোকা হ'ল। ঢুকেই সবাই অবাক! বউ মেঝেতে শুয়ে। স্বপ্নের এক অপ্সরা যেন পড়েছে মাটিতে। তার সর্বাঙ্গে গয়না, পায়ে টকটকে আলতা, বিয়ের কনের মত সিঁথি-ভরা সিঁদুর—লাল বেনারসী পরনে। কিন্তু এ কী ঘুম! শাশুড়ী আদর ক'রে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে গিয়ে চমকিয়ে বলেন—"ওগো এ কী গো?" পাগলের মত চেঁচিয়ে উঠলেন নরেন্দ্রনাথ—"আমার মিথ্যাকে সত্য করতেই অত্যাচারিতা সীতা চলে গেছে; সিঁথের সিঁদুরনিয়েই গেছে সে!"

মাথার কাছে খোলা পড়ে আছে, আফিংএর কৌটোটা। কোন পথে গিয়েছে নারী তারিই কথা সে জানিয়ে দিচ্ছে স্পষ্ট ভাষায়। নরেন্দ্রনাথ শুদ্ধ, মূর্তি পাথরে পরিণত! তবু ডাকার ডাকা হল অবিলম্বে।—করার নেই কিছু; অনেক আগেই সীতার পাতালে-প্রবেশ সম্পূর্ণ হয়েছে।

ভৈরবানন্দ হেনার পাশে বসে তার মাথায় হাত রেখে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলেন, বললেন শেষে—"দেবী সাবিত্রী, নবরূপে স্বামীর জীবন আনলি, মা, ফিরিয়ে? মহামায়া, সবি তোর ইচ্ছা—ইচ্ছাময়ী!"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্বরে নরেন্দ্র নাথ বললেন শুধু—"মা হেনা ঝরেছে!"

চরম শোক বাণী আর পরম প্রশংসা বাক্যকে বিচলিত করলেও, হেনা এখন এ-সংসারি বাইরে। উপেক্ষার নির্মম বজ্রাঘাতে অকালে ঝরা হাসুহানা মাটিতে বিছিয়ে পড়ে রইল; আর তার অস্ফুট মৃদু অক্ষরের বেদনাকে নিয়ে আকাশ হল ভারাক্রান্ত।

আসল—সকল কান্নার ভেতর পরম শান্তিতেই হেনা ঘুমিয়ে থাকে। প্রভাত-সূর্যের এক টুকরো আলো জানলা দিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়ে ওর কপালে। সেই আলোর ছোঁয়ায় ওর সিঁথির সিঁদুর হল আরো লাল—ব্যর্থ আশার মর্ম বেদনা?

রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ছিটেফোঁটা

শ্রীসুধাকান্ত দে

১

রবীন্দ্রনাথের চারদিকে অনেক গল্প, অনেক কাহিনী ছড়ো হয়ে উঠেছে। যতটা পারা যায় এখন থেকেই এগুলি সংগ্রহ করে রাখা উচিত! এগুলির নিজস্ব একটা মূল্য আছে, তেমন ভাবে লিখলে বাংলার সাহিত্য-সম্পদ বাড়বে। অন্য দিকে, অনেক ছোট ঘটনার মধ্য দিয়ে মানুষ-রবীন্দ্রনাথ যেমন ভাবে ঝলকিত হয়ে ওঠেন, অনেক কথা বলেও তাঁকে তেমনভাবে প্রকাশ করা যায় না। উত্তরকালে তাঁকে চেনবার পক্ষে এগুলি সহায়ক হবে।

গল্প আর কাহিনী দুরকমের হতে পারে। কতকগুলি সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার ফল, অন্যগুলি অপর থেকে শ্রুত। অভিজ্ঞতার মূল্য বেশি হলেও শোনা-কথা, বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় ও বিশ্বাসযোগ্য লোকের মুখ থেকে শোনা কথার দামও কম নয়। দুরকমেরই দৃষ্টান্ত দিচ্ছি।

ক

তখনও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেনি। শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে ঘুরে এক আমগাছের তলায় একা একা একটি ছেলে একদিন খুব মনের সাধে গান গাইছে—

যদি বারণ কর তবে গাহিব না,
যদি সরম লাগে তবে চাহিব না।

ছেলেটি জানে না, কখন রবীন্দ্রনাথ পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন। তার কোন হুঁস নেই, সে আপন মনে গেয়ে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ সস্নেহে হাতখানি রেখে বল্লেন, ছোকরা, সারা জীবনে আমি কি আর কোন গান লিখিনি?

আমরা সহজেই কল্পনা করে নিতে পারি, ছেলেটি কেমন লজ্জা পেয়েছিল। কিন্তু কবির শাসনের ভঙ্গীটিও কি চমৎকার নয়?

খ

'প্রবাসী' পত্র তখন ২১০।৩১ কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট হতে প্রকাশিত হত। রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' নামক উপন্যাস প্রবাসীতে যখন প্রকাশিত হতে আরম্ভ হল, তখন ঐ অল্প-পরিসর গলির মুখে প্রবাসী কিনবার জন্য ব্যস্ত-ব্যাকুল জনতার ভীড় জমে যেত, এবং (তখন কিউ প্রথা জানা ছিল না) কখন কখন মারামারি পর্যন্ত হত। এর পরে আর কখনও কোন উপন্যাস বা লেখা সম্বন্ধে এরকম আগ্রহের কথা শুনিনি।

গ

বোলপুর শান্তিনিকেতন ফুটবল টীমের সঙ্গে খেলবার জন্য আমরা স্কটিশ চার্চেস কলেজের এক হোষ্টেলের ২২ জন অধিবাসী টীম হয়ে যাত্রা করি। আমরা যদিও খেলতে যাই, কিন্তু আমাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল কবিগুরুকে দেখা ও তাঁর কথা শোনা। গত বছর সে কাহিনী বলেছি। খেলাও আমাদের বেশ ভাল হয়েছিল। কোন্ পক্ষ জিতেছিল, এখন ঠিক মনে নেই। কিন্তু ৺নেপাল চন্দ্র রায় এবং আরও ২।৩ জনের উৎসাহ ও যত্নের কথা কোনদিন ভুলবার নয়। আর পিছনে জেগে ছিল সর্বদা গুরুদেবের স্নেহ-দৃষ্টি।

এই সম্পর্কে মনে পড়ছে মজার ঘটনা। ৺দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ঠিক করলেন একদিন মধ্যাহ্নে খাওয়া দাওয়ার পর আমাদের সকলকে কবির কাছে নিয়ে যাবেন। সেই কথামত দুপুর বেলা আমাদের দৌড় দীনেন্দ্রনাথকে অগ্রবর্তী করে অগ্রসর হল। গেটটা খুলে দীনেন্দ্রনাথ আমাদের একটু অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে গেলেন। অল্পক্ষণ পরেই তিনি মুখ কাঁচুমাচু করে এসে আমাদের কাছে এসে বল্লেন, এখন দেখা হবে না। পরে কখন দেখা হবে, জানিয়ে দেবেন। আমরা মনমুগ্ধ হয়ে ফিরে এলাম। পরে অবশ্য দেখা হয়েছিল। সম্ভবত আমাদের মনক্ষুণ্ণতা কবি বুঝতে পেরেছিলেন। কারণ, তার পরেই আমরা জানতে পারলাম, ঠিক ঐ সময়ে তিনি লিখছিলেন, —কবিতা কি গান, কি আর কিছু মনে নেই। লেখবার

তার এলে তিনি কোনরকম বাধা সহ্য করেন না, এক না ডাকলে তাঁর কাছে কারও যাবার হুকুম নেই।

৯

এক পৌষ উৎসবে শান্তিনিকেতনে গেছি। রাত্রিতে বসে গল্প করছি, এমন সময় আমাদেরই সহবাসী শিবনাথ এল। সে ছেলেবেলা শান্তিনিকেতনে কাটিয়েছিল, এবং ভাল গাইতে পারত। তার উৎসাহদীপ্ত মুখ আনন্দে উজ্জ্বল, আর সর্বাঙ্গে উত্তেজনা।

'কি ব্যাপার?'

"গুরুদেব একটা নূতন গান তৈরী করেছেন, এই মাত্র শিখে এলাম," বলেই তারে বিভোর হয়ে গাইতে লাগল।

'হেথায় কোন্ বসন্তেরই বাণী—"

এইরূপ উত্তেজনা, উদ্গ্রীবতা সে সময়ে পর্বদা দেখা যেত। কবিগুরুর গান এল মনে, লিখলেন, ডাক পড়ল দীনেন্দ্র নাথের, সুর দিয়ে গান বেঁধে রাখবার জন্য। সে রাত হটা হোক বা ভোর হটা হোক। তারপর সেই সুর-বাঁধা গান ছড়িয়ে পড়ল। যেন কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার। সেই আনন্দোজ্জ্বল ছবি ভুলবার নয়।

২

সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতার ব্যাখ্যা নিয়ে বেশ কিছু বড় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ঘরে গেল। 'শান্তি নিকেতনে' কবি নিজে এর একটা ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, ওটা ঠিক নয়। কবিতাটা আসল, ব্যাখ্যাটা নকল অর্থাৎ পরে ভেবেচিন্তে ঠিক করা। আসলে ও-কবিতার কোন ব্যাখ্যা নেই।

'কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে যে ব্যাখ্যা করছেন—
করলেনই বা, ওটা অগ্রাহ্য।'

কবির মতকে অগ্রাহ্য করি, এমন দুঃসাহস আমার নেই। শুধু তাই নয়। এই ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমার অনেক দিনের একটা কথা মনে পড়ে গেল। তখন আমরা কলেজ হোস্টেলে থাকি। তখনও রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র বা অন্য কবিতার ব্যাখ্যা বের হয়নি।

হস্টেলের সাহিত্যিক অগ্রবর্তী কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আমার প্রায়ই বিবাদ বাধত, রবীন্দ্রনাথের কবিতা নিয়ে। তারা বলত, রবীন্দ্রনাথের কবিতা বা গান তারি সুন্দর লাগে পড়তে বা গাইতে, কিন্তু তার মানে বুঝা যায় না। ফলে আমাকে বলতে হত, কোন কবিতা বা গানের অর্থ বোঝানি বল, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। একদিন ওরা ঠিক করল, আমায় জব্দ করবে। আমাকে ডেকে বল, 'সোনার তরী' কবিতাটির কি অর্থ হতে পারে, বল। আমি তখন আস্তে আস্তে তার ব্যাখ্যা করলাম, এবং সে ব্যাখ্যা কবিগুরু তাঁর 'শান্তিনিকেতনে' যে ব্যাখ্যা পরে করেছিলেন তার অনুরূপ। ওরা চুপ করে সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনল এবং পরে স্বীকার করল, হাঁ, এ ব্যাখ্যা হতে পারে। সুতরাং কবিগুরুর ব্যাখ্যার প্রতি আমার প্রাণের টান আছে।

বন্ধুরা কিন্তু ছাড়ল না। বল, এটাতে না হয় পার পেয়ে গেলে। কিন্তু 'ওগো শেফালি বনের মনের কামনা—'এ কবিতার অর্থ কি? এর অর্থ তুমি কোন রকমেই করতে পারবে না।

আমি একটুও না ভেবে বললাম, 'এর মানে ত সহজ। এখানে শেফালি-বনের কামনাটাকেই মূর্তিরূপে কল্পনা করে নাও। তোমরা ওয়ার্ডসওয়ার্থের ডিউটিকে আরও কত কিছুকে ব্যক্তি বলে কল্পনা কর। আর এটা এমন কি শক্ত?' এই বলে সমস্তটা পড়ে ঐ সুরেই ব্যাখ্যা করলাম। ওরা স্বীকার করল, আমার ব্যাখ্যা সমীচীন।

এই একটা ধারণা এককালে প্রচলিত ছিল এবং এখনও দূর হয়নি। যে কবিগুরুর অনেক লেখা দুর্বোধ্য, ধোঁয়া ধোঁয়া। কিন্তু একথা সত্য নয়। যিনি ছিলেন সারাজীবন সত্য ও সুন্দরের পূজারী, যিনি একটিও নিরর্থক কথা লেখেন নি, তাঁর লেখায় অস্পষ্ট অপবাদ দেওয়ার চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কি হতে পারে?

কৃষ্ণকলি

(উপন্যাস)

শ্রীকণপ্রভা ভাদুড়ী

(৫

কোলকাতায় এসে বাড়ী ঘর দেখে সূর্য্য সুখী হোল, কিন্তু মুস্কিল হোল, ওর অখণ্ড অবসর নিয়ে। শঙ্কর বললে,—"তোমায় স্কুলে ভর্ত্তি করে দোব সূর্য্য। এখন ছোট আছ, লেখা পড়া শেখো; ভবিষ্যতে কাজে লাগবে"—

সূর্য্য ত অবাক। হলোই বা শঙ্কর তার স্বামী, কিন্তু ও কিছুতেই স্বামীর বুদ্ধির তারিফ করিতে পারে না। ষোলো বছরের এত বড় ধাড়ী মেয়ে বই খাতা নিয়ে পড়তে যাবে; যাগো কি লজ্জার কথা? শঙ্করের পানে বড় বড় চোখ মেলে চেয়ে সে বললে,—"তুমি কি বলচো; আমার এখন লেখা পড়া শেখার বয়স আছে? ঘর সংসারের কাজ নেই?"

শঙ্কর বললে, "দুটী লোকের ঘর সংসারে কত কাজ থাকে সূর্য্য? আর থাকলেও ঠাকুর চাকর রেখে দেব। তুমি তৈরী হয়ে নাও স্কুলে ভর্ত্তি করে দেবো তোমায়"—"তুমি পাগল হলে না কি?" রাগে বিস্ময়ে সূর্য্যর কণ্ঠ দিয়ে আর স্বর নির্গত হোল না। দুম দুম করে পা ফেলে সূর্য্য নিজের ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল। সূর্য্যর বিদ্যার্জ্জনের প্রধান অন্তরায় যে তার অজ্ঞতা, ও বিবাহের ছাড়পত্র, সে কথা শঙ্কর বুঝতে পারে। তথাপি শিক্ষার আলোহীন জীবন কল্পনা করতে ওর কষ্ট হয়; সূর্য্য ওর স্ত্রী, ওকে সে এত ভালোবাসে অথচ তারই কাছে অবশেষে ওর মনের সাধ অপূর্ণ থাকবে; ভবিষ্যতের স্বর্ণোজ্জ্বল আশার অপমৃত্যু ঘটবে? অথচ কৃষ্ণা ত সূর্য্যরই সহোদরা। সে কেমন বুদ্ধিমতী, সপ্রতিভ মেয়ে; কেমন উদ্যমে লেখা পড়া শিখছে! না সূর্য্যর এ আবদারকে ও প্রশ্রয় দেবে না; কর্ত্তব্যের সামনে ওকে নির্ম্মম অভিভাবকের ভূমিকায় দাঁড়াতে হবে। সূর্য্যকে লেখাপড়া শেখাতেই হবে। অন্যমনস্ক ভাবে ঘরে প্রবেশ করে শঙ্কর দেখল, শয্যার ওপরে বালিসে মুখ গুঁজে সূর্য্য আকুল হয়ে কাঁদছে। শাঁখের মত সুন্দর সাদা হাত দুখানি দিয়ে সে বালিসটীকে আকুল ভাবে আঁকড়ে ধরেছে; কান্নার আবেগে তন্বী দেহখানি কাঁপছে; ঠিক যেন বৃষ্টির পর, বাতাসে কাঁপছে রজনী গন্ধার ঝাড়ে সদ্যস্ফুট পুষ্পগুলি। বাস্তবিক সূর্য্য রূপসী বটে। শঙ্করের ভারী মায়া হোল। আহা ওকে দুঃখ দিয়ে লাভ কি? সে ত্রস্ত পায়ে শয্যার নিকটে গিয়ে সূর্য্যর পিঠে হাত দিয়ে ডাকলো, এই "ওঠো, উঠে এস;"—সূর্য্য উঠলনা, আরও বেগে বালিসে মুখ চেপে রইল। শঙ্কর শয্যায় উঠে জোর করে ওকে তুলে বসালো। ওর অশ্রু আকুল লাল মুখখানি নিজের দুই হাতের মধ্যে তুলে ধরে বললে, "ছিঃ ছিঃ তুমি কি এখনও ছেলে মানুষ আছ যে, এমন করে কাঁদছ? শোন সূর্য্য, আমার দিকে তাকাও একটা কথা শোন"—

সূর্য্যর ক্রন্দনের বেগ উপশম হোল; কিন্তু সে চোখ তুলনা। নানা রকমে প্রবোধ দিয়ে তাকে শান্ত করে, অবশেষে শঙ্কর বললে,—"আচ্ছা, থাক তোমায় স্কুলে যেতে হবে না; তুমি বাড়ীতে আমার কাছে পড়ো, কেমন তাতে রাজী ত?"

সূর্য্য কোনও রকমে হেসে কেঁদে তাইতে সায় দিল। বিকেল বেলায় সূর্য্য তার নূতন সাজানো গৃহস্থালীর মধ্যে সম্রাজ্ঞীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছিল; রান্নার জন্যে পাচককে নানাবিধ আদেশ উপদেশ দিচ্ছিল। এমন সময় বাহির থেকে শঙ্করের আহ্বান শুনতে পেল, "সূর্য্য, শীঘ্র বাইরে এস"—

সূর্য্য ছুটে বাইরে বসার ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। পিঠের উপর লুটিয়ে থাকা আঁচল প্রান্তটী তুলে নিয়ে মুক্তে মাথার সিঁথীর উপর টেনে দিয়ে সে পিছন ফিরে চলে যেতে উদ্যত হতেই, বন্ধু হো হো করে হেসে উঠে বললে,—"ও বউদি চলে যাবেন না; বসুন, শুনুন, আমি যাচ্ছি আপনার একটী দেবর; অনুগ্রহ করুন"—

পর্দার বাইরে গিয়ে সুধা নীরবে দাঁড়িয়ে ভাবল, না এখানে এ রকম লজ্জা করা হয়ত শোভন হবে না। সকলে তার প্রতি অসন্তুষ্ট হবে। বিশেষ করে, শঙ্কর হয়ত এতে মনে দুঃখ পেতে পারে। সুধা ভীরু পায়ে নত চোখে, পুনরায় ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। রঞ্জন আনন্দে লাফিয়ে উঠে তার দিকে একখানি চেয়ার এগিয়ে দিল। শঙ্কর বললে,—"বস সুধা এর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই"—

সুধার কালো চোখে ত্রাসের ছায়া নিবিড় হয়ে উঠল। শঙ্করের পানে অপদৃষ্টিপাত করেই আবার সে চোখ নত করে বসে রইল। শঙ্কর মৃদুকণ্ঠে বললে, "ওর নাম রঞ্জন, আমার প্রিয় বন্ধু; তোমাকে দেখতে এসেছে; ওর সঙ্গে কথা বলো। না হলে বাড়ী গিয়ে তোমায় নিন্দে করবে"—

"শুনলেন ত বৌদি"; রঞ্জন বললে, "আপনার স্বামীর বন্ধু প্রীতিটা দেখলেন ত?"

ওর কথা বলার ভঙ্গী দেখে, সুধা খিল খিল করে হেসে ফেলে, ওর দিকে চকিত দৃষ্টিপাত করল। উৎসাহিত হয়ে রঞ্জন বললে,—"ক্রমে ক্রমে আপনি টের পাবেন বৌদি যে আপনার স্বামীটি একটি রত্ন।"

এবার শঙ্কর কণ্ঠস্বর কৃত্রিম করে বললে,—"রে পাপিষ্ঠ, কোনও হিন্দু রমণীর কাছে স্বামী নিন্দা করা কত অন্যায় তাকি তুই জানিস না?" এবার সুধা হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠে বললে,—"আপনাদের বন্ধুত্ব বেশ মজার ত?"

"মজার নয় বৌদি; রঞ্জন বললে,—দেখবেন এই বন্ধুত্ব আপনাকে একদিন অস্থির করে তুলবে"—

"সে কি রকম?" সুধা কৌতূহলে ভরা কালো চোখ দুটী মেলে রঞ্জনের পানে চাইল। রঞ্জনের চোখে কৌতুক টলমল করছিল। এমন সময় ভৃত্য এসে প্রশ্ন করলো, বাবুদের চা কোথায় দেওয়া হবে? বাইরে নাকি ঘরে?"

শঙ্কর বললে,—"ঘরেই দিয়ে যাও যখন"—

সঙ্গে সঙ্গে সুধাকে উঠতে দেখে, রঞ্জন বাধা দিয়ে বললে, "আপনি যাচ্ছেন কোথায়?"

"খাবারটা গুছিয়ে দিয়ে আসি" সুধা বললে।

"যখন বেশ বেশ গোছগাছে পাবে," রঞ্জন বললে,—"আপনি বসুন"—

"আমি কি শুধু বসেই থাকবো?" হতাশ হয়ে সুধা বললে।

"না, বসে থাকবেন কেন" রঞ্জন বললে, "চা এলে, স্বামীকে চা পরিবেশন করবেন; জানেন, ও উনি একটী নব্য বিলেত ফেরৎ"—

রঞ্জনের বাকপটুতায় সুধার লজ্জা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছিল। বিলেত সম্বন্ধে সুধা তার প্রতিবেশিনীদের কাছে অনেক রকম আজগুবী কাহিনী শুনেছিল। হঠাৎ সেই বিলাতের প্রসঙ্গ উঠতেই ও চকিত হয়ে বললেন, কেন বিলেত ফেরৎ হলে কি হয়?"

রঞ্জন শঙ্করের দিকে চেয়ে চোখ টিপে একটু হেসে বললে, তাও জানেন না? সেখানে শত শত সুন্দরী মেয়ে আছে; আপনার রূপ তাদের কাছে কিছুই নয়। তারা আপনার স্বামীকে কত যত্ন করে চোখ চা খাইয়েছে; আর তাদের হাতের চা; সে যেন অমৃত"—

দেখতে দেখতে সুধার মুখখানি মুদ্রিত পদ্মের মত ম্লান হয়ে গেল। শঙ্কর বললে, "ওকে কেন ক্ষেপাচ্ছিস মিছি মিছি বলুন?"

স্বামীর আশ্বাস বাক্যে মনে মনে ভরসা পেয়ে সুধা লজ্জিত হয়ে উঠল। সে বললে, "ছি! তুমিও যেমন আমি ওঁর কথা বিশ্বাস করছি নাকি?" এমন সময় চা খাবার নিয়ে ঘরে যখন প্রবেশ করতেই সকলেই চুপ করে গেল। শঙ্কর চা তৈরী করল, সুধা খাবার তুলে দিল। কিন্তু মুস্কিল হোল সুধার খাওয়া নিয়ে; যে সুধা কোনও দিন শ্বাশুড়ীর সামনে আহার করেনি; সে এই পুরুষদের সামনে বসে কি করে আবার গলাধঃকরণ করবে? হায় হায় দেশ ছেড়ে এসে তার একি দুর্গতি হোল? কিন্তু রঞ্জন নাছোড়বান্দা। শঙ্কর বললে, "আচ্ছা আমরা বাইরে যাচ্ছি তুমি একটু কিছু খাও নাহলে ও ছাড়বে না"—ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; সুধা একটা সিঙ্গারা নিয়ে মুখে তুলেছে অমনি পর্দার ফাঁকে একজোড়া দৃষ্টির সঙ্গে ওর চোখ মিলে গেল। সুধা চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল, "না ঠাকুরপো, এ আপনার ভারী অন্যায় কিন্তু"—রঞ্জন ঘরে ঢুকে

বললে, "তাহলে ক্ষমা করুন আর কখনও লজ্জা দেবেন না।"

এমন সময় মাঠ থেকে শঙ্কর চিৎকার করে বললে "এই সুধা শিল্পী তৈরী হয়ে এস। আজ সন্ধ্যার পর একটি গানের আসরে যেতে হবে। রঞ্জু তুই ও চল"—গান শুনতে সুধা বড় ভালবাসে। সে বললে "আমি এখনি আসছি"। সুধা উপরে চলে যেতে, রঞ্জু শঙ্করের কাছে ফিরে এসে বললে "আমায় আর এর মধ্যে কেন শঙ্কর?" সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে শঙ্কর বললে, "সুধার ঝুনো স্বভাব যেমন করেই হোক ছাড়াতে হবে। এ আমার মোটে ভালো লাগে না। "আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে"—রঞ্জু বললে।

কলেজ থেকে বেরিয়ে কৃষ্ণা ট্রামের জন্য ফুটপাথের উপর দাঁড়িয়েছিল। একটার পর একটা ঘর্ঘরীতি বাস, ট্রাম, আসছে যাচ্ছে, কিন্তু তাতে তিল ধারনের স্থান নেই। অগনিত জনস্রোত পথের দিদিগ সীমা, ধরে বয়ে চলেছে, কোন্ মহাসমুদ্রে গিয়ে যে এদের যাত্রা শেষ হবে কে জানে? সবলেই ব্যস্ত সকলেই চঞ্চল। ফকীর আমীর পাশাপাশি চলেছে, আরও চলেছে শঠ ও সাধু; কে কার বিচার কোরবে; কেউ এখানে কাউকে চেনেনা—প্রাণের সঙ্গে নেই কারো প্রাণের যোগ তথাপি, প্রত্যহ তারা পাশাপাশি পথ চলে। সেই বুকে লোহার শিকল গাঁথা মসৃণ পীচ বাঁধানো প্রশস্ত রাজপথের পানে চেয়ে কৃষ্ণা দাঁড়িয়েছিল ট্রামের আশায়। হঠাৎ তার সামনে একটী গাড়ী এসে থেমে গেল। কৃষ্ণা চকিত হয়ে দেখল, গাড়ী থেকে নামছে রঞ্জু। শঙ্করের সূত্রে তার রঞ্জুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। ওকে দেখে কৃষ্ণা মনে মনে বেশ খুশী হয়ে উঠল। রঞ্জু নিকটে এসে বললে। দাঁড়িয়ে আছেন বাসের জন্য নিশ্চয়? "হ্যাঁ ঠিকই ধরেছেন "কৃষ্ণা বললে, চলে আসুন আমার গাড়ীতে, রঞ্জু বললে, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আমায় একবার ওখানে যেতে হবে"—কোথায়? কৃষ্ণা প্রশ্ন করল। রঞ্জু বললে, কাশীপুরে তোমাদের বাড়ী থেকে আরও কিছু দূরে গঙ্গার ধারে—

তাহলেও আমি আপনার চলতি পথের যাত্রী হলুম—কৃষ্ণা গাড়ীতে উঠে বসল। রঞ্জু বললে, "বাইরে এসে বসুন তা না হলে কথা বলবার সুবিধা হবে না; দেখছেন ত আমার গাড়ীতে আমি নিজেই ড্রাইভার—এটা কিন্তু বিনয়ের ছলে আত্মপ্রশংসা করা হোল রঞ্জুদা—কৃষ্ণা বললে। গাড়ীতে ষ্টার্ট দিয়ে রঞ্জু বললে, "সে আপনি যা খুশী বলুন, আমি কিন্তু একটা সত্য কথা বলেছি মাত্র"—

কোলাহল মুখর শ্যামবাজার অঞ্চল দিয়ে গাড়ী ছুটে চলেছে। তার ভিতরে পাশাপাশি বসে আছে; রঞ্জু আর কৃষ্ণা; পথের উড়ো হাওয়ায় কৃষ্ণার এলোচুল উড়ছে; শাড়ীর আঁচল উড়ছে, কখনও বা কোণও অসতর্ক মুহূর্তে গিয়ে স্পর্শ করছে রঞ্জুর কপোল চক্ষু এবং হাত। রঞ্জুর সেদিকে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। ষ্টিয়ারিংএর উপর হাত ঘুরিয়ে পায়ের নীচে লোহার যন্ত্র চেপে ধরে, সে আপন মনে গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছে।

বাগবাজারের মোড়ে ট্রাফিক বন্ধ। সারি সারি গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। রঞ্জু গাড়ীর ষ্টার্ট বন্ধ করে সেই লাইনের পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে পথের ভীড়ের মধ্য থেকে, একটী শীর্ণ শিশু বক্ষে ধরে; একটী বছর সাত আটেকের বধূ গাড়ীর সামনে এসে তার কর প্রসারিত করে দাঁড়াল। অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে বললে,—"মা কিছু ভিক্ষা দিন"—

বধূটীকে উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করে কৃষ্ণা বললে,—"তুমি ভিক্ষে করতে বেরিয়েছ কেন, তোমার কি কেউ নেই?"

"যে থাকার তাকেই কাল-রোগে ধরেছে মা"; বধূটী বললে,—"তাইতো পেটের দায়ে আমায় ভিক্ষা করতে হচ্ছে। আমায় কিছু দিন মা, আপনি রাজরাণী হবেন"—

রাস্তার ট্রাফিক তখন খুলে দিয়েছে;—একটী দুটী করে গাড়ী চলতে সুরু হয়েছে। রঞ্জুকে গাড়ীতে ষ্টার্ট দিতে দেখে কৃষ্ণা ক্ষিপ্রহাতে পার্স খুলে একটী সিকি বার করে বধূটীর হাতে দিয়ে বললে,—"তোমার স্বামীর কি অসুখ করেছে?"

কৃতজ্ঞতার আনন্দে বন্ধুটী কেঁদে ফেলল ; আহা, কতদিন সে এমন মিষ্টি কথা শোনেনি, দয়া পাওয়া ত দূরের কথা ; অনাহারের সঙ্গে শুধু যুদ্ধ করা আর লোকের ঘৃণা আর কটূক্তি লাভ করা এইত তার বেঁচে থাকার পরম সম্বল। মুখের ঘোমটা ঈষৎ অপসারিত করে ছলছল চোখে সে বললে,—"আমার স্বামীর মুখে রক্ত ওঠা ব্যামো হয়েছে মাসো ; এই রোগের জন্য তার চাকরীটাও গেল ; তিনটে পেটের সম্বল নিয়ে, আমি এমনি ভিক্ষে করে দিন চালাচ্ছি"—

রঞ্জনের গাড়ী তখন ভীড় কেটে টালা ব্রীজের ওপর এসে পড়েছে। কৃষ্ণার কানের মধ্যে শুধু বাজছে তখন, রক্ত ওঠা ব্যামো, সে কি যক্ষা ?"

রঞ্জন মুখ ফিরিয়ে বললে,—"হ্যাঁ কৃষ্ণা দেবী, যক্ষা ; যক্ষাকেই ওরা ওই রকম করে বলে"—

হঠাৎ কৃষ্ণা বিরক্ত হয়ে বললে,—"পৃথিবী ভরা এই দারিদ্র আর বর্বরতার মধ্যে আপনার এই ভদ্রতা আমার চোখে বড় রূঢ় লাগে"—

রঞ্জন ত চমকে উঠল ; পায়ের নীচে চেপে ধরা ব্লাচটা আর একটু হলে ছেড়ে দিয়েছিল বুঝি, এর মধ্যে তার যে অভদ্রতা কিসে প্রকাশ পেল, বুঝতে না পেরে সে, মৃদু স্বরে বললে,—"কেন আমি কি করেছি ?"

আপনি ওই কৃষ্ণা দেবী বলা ছাড়ুন, দেবীদের অবস্থা একটু আগে রাস্তায় দেখলেন ত ?" কৃষ্ণা বললে।

"ওঃ এই কথা"; রঞ্জনের মুখে হাসি ফুটল, সে বললে,—"তার আগে আপনি সম্বোধনটাও চাড়তে হয় ?"

নিশ্চয় ছাড়বেন বৈকি ! কৃষ্ণা বললে,—"আপনাদের সম্মানের ঠেলাতেই ত আজ আমাদের এই অবস্থা !"

"কোথাকার জল, কোথায় গড়ালো ! মনে মনে খুশী হয়ে রঞ্জন বললে,—"তোমার মতই যে দেশের সকল মেয়ের মত তা তুমি জানলে কি করে ?"

একটী অনাত্মীয় পুরুষের মুখে তুমি সম্বোধন শুনে, কৃষ্ণার মনে মনে প্রথমে খুব লজ্জা করতে লাগল। কিন্তু পলকের মধ্যে লজ্জা ঝেড়ে ফেলে মনে দৃঢ়তা এনে বললে,—"জানি, আমি একথা ত বলিনি ; জানবো এবং জানাবো, এই আমার কথা"—

"তোমার মত সকলে মানবে　　রঞ্জন বললে,—

"মানবে নাই বা কেন ?" কৃষ্ণা বললে,—"সমবয়সী, সহকর্মী, সহযাত্রী, পুরুষ নারী প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে সমান ব্যবহার কোরবে ; সমান চোখে দেখবে, একজন অপরকে কৃত্রিম সম্মান দেখিয়ে ঘুরে রাখবে ; না অকৃত্রিম অসম্মানে, নীচে নামিয়ে রাখবে ; এর মধ্যে দিয়ে কেউ কারো মনের স্পর্শ পেতে পারেনা ; বাহিরের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারেনা ; আসল কথা মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে পারে না, সকলের মনের সঙ্গে একটা অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র স্থাপিত না হলে, আমরা ত ইচ্ছা থাকলেও একে অন্যের হিত করতে পারবো না ?"

"তোমার যুক্তি খুবই মহৎ কৃষ্ণা" রঞ্জন বললে ; "কিন্তু তুমি এটা সব মানুষের মধ্যে প্রচার করবে কি করে ?"

"ব্যবহার দিয়ে, "কৃষ্ণা বললে,—মায়ের মত মধুর ব্যবহার দিয়ে, সকলের মনের সংশয় ঘুচিয়ে দেবে। দোকানে গিয়ে বিনীত স্বরে বলবে,—এই শাড়ীটা দেখি, বাবা ; বাহুন, দেখি দাদা ? তোমরাও বলবে,—অপরিচিতাদের উদ্দেশ্যে, দিদি না হয় বোন্ না হয় মা"—

"ঠিক বলেছ" রঞ্জন বললে, "মার থেকে বোন বললেই কম বয়েসের মেয়েরা খুশী হয় বেশী। তোমার এই মতটা ত বেশ সুন্দর কৃষ্ণা ; একে এখন থেকে কাজে লাগাতে হবে কি বল ?"

নিশ্চয়, "কৃষ্ণা বললে,—দেশে যদি সাম্যবাদের সৃষ্টি করতে চাও, আর সেই ভিখারী বউটীর পাশে, তোমার মাকে না হয় আমাকে কল্পনা করতে যদি তোমার কষ্ট হয়, সেই কষ্ট দূর করতে চাও, তবে এই মত গ্রহণ করা এ ছাড়া আর অন্য কোনও পথ নেই। আগে সকলকে মনে মনে এক হতে হবে। মত এক হলে পথ এক হবেই হবে। রঞ্জনদা প্রেম চাই, প্রেম মানুষের প্রতি মানুষের নির্মল প্রেম জাগিয়ে তোলাই আজকের দেশকর্মীদের প্রধান ও প্রথম কাজ হোক। আজকের মানুষ ক্ষমতার লোভে, অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পৃথিবীটাকে, ক্রমশঃ রসাতলের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ; দেখতে পাচ্ছনা ?"

"দেখতে পাচ্ছি বইকি ; "রঞ্জন বললে,—কিন্তু তোমার

মত এমন অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করিনি এটা সত্য কথা। আজকে তুমি আমার সেই দৃষ্টি খুলে দিলে। আমাদের মতে মতে, পথে পথে, এক হয়ে মিলে গেল"—

খুশী হয়ে কৃষ্ণা রঞ্জনের দিকে চেয়ে মধুর করে একটু খানি হাসল।

কৃষ্ণাদের সেই পুরাণো দৈনন্দিক বাড়ী। আর্থিক প্রয়োজনে গৃহের সমস্তটা ভাড়া দিয়ে, সামান্য দুইখানি ঘর নিয়ে তরু আর কৃষ্ণা থাকে। সেই অতি পরিচিত দলবে বংএর বাড়ীখানির সামনে এসে, কৃষ্ণা বললে,—রঞ্জনদা তুমিও নাবো আমার সঙ্গে পিসিমা তোমায় দেখলে খুব খুশী হবেন"—

"কিন্তু আমার হাতে যে আজ মোটে সময় নেই; রঞ্জন বললে, কিছু মনে কোরনা লক্ষ্মীটী কাল, কাজ সেরে এই সময় ঠিক আসবো; পিসিমাকে তুমি আমার হয়ে বোলো, কেমন?" কৃষ্ণা ম্লানমুখে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। একটুও দেরী না করে, রঞ্জন গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল।

গৃহে প্রবেশ করে, কৃষ্ণা নিজের ঘরে গিয়ে বইখাতা রেখে; কল ঘরে গেল স্নান করতে। স্নানান্তে ফিরে এসে দেখল, তরুর সন্ধ্যাহ্নিক সারা হয়ে গেছে। তিনি ঘরে সন্দেশের ছাঁচ তৈরী করছেন। কৃষ্ণাকে দেখে উল্লিত স্বরে বললেন,—"আজ এত দেরী হোল কেনরে?"

"আগে খেতে দাও, তারপরে বলছি"—বলে কৃষ্ণা তাঁর পাশ ঘেঁষে বসে পড়ল। একটী রেকাবীতে কয়েকটী সন্দেশ ও খানিকটা চিঁড়ে ভাজা নিয়ে তরু ওকে দিলেন। বললেন,—"আমি ভেবে ভেবে মরি; কি জানি পথে কিছু বিপদ ঘটল নাকি, কিছুই বুঝতে পারিনা"—

কৃষ্ণা সন্দেশ খেয়ে জল খেয়ে, চিঁড়ে ভাজার থালাটা কোলের উপর নিয়ে আরাম করে বসে বললে,—"তোমায় কত দিন না বারণ করেছি—পিসিমা, তুমি সামান্যতে অত ভয় পেওনা; আমি যখন চাকরী নিয়ে বিদেশে চলে যাবো, তখন তোমার যে কি হবে, আমি কিছুতে ভাবতে পারিনা"—

তরুর মুখে ফুটে উঠল স্নেহের সকরুণ হাসি। তিনি বললেন, "খুব হয়েছে, তোমাকে আর চাকরী করতে হবেনা; আমার আর সুখে দরকার নেই। এখন ভালোয় ভালোয় একটা ভালো ঘর বর পেলে, আমি শান্তিতে মরতে পারি"—

কৃষ্ণা জানে তার বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলে তরুকে সহজে আর থামানো যাবে না। তাই সে প্রসঙ্গান্তরে যাবার জন্য বললে,—"জানো পিসিমা আজ আমার দেরী হোল কেন? প্রথমে কলেজ লাইব্রেরীতে বসে কিছুক্ষণ বই পড়লুম; তারপর, ফেরবার সময় রাস্তায় হঠাৎ রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তার গাড়ীতেই ত বাড়ী এলুম"—

তরুর মুখখানি আনন্দোজ্জ্বল হয়ে উঠল। রঞ্জনকে তিনি মনে মনে অত্যন্ত পছন্দ করেন, ওর সম্বন্ধে কৃষ্ণাকে নিয়ে মনে মনে তিনি একটা গোপন আশাও পোষণ করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় রঞ্জনের নাগাল তিনি পান না। মাসান্তে যদি তার একবার দেখা পান, তাই যথেষ্ট; তাও সময় যদি সঙ্গে নিয়ে আসে তবেই। আজ সেই রঞ্জনের কথা শুনে তাই তিনি অত্ত খুশী হয়ে উঠলেন। তিনি বললেন,—"তা রঞ্জনকে বাড়ীতে নিয়ে এলিনা কেন; কতদিন দেখিনি ওকে? ভারী সৎ ছেলে!"

"বলছিলাম পিসিমা নাববার জন্য; "কৃষ্ণা বললে,—কিন্তু ওরানক কাজের তাড়া আছে সেই জন্য নাবতে পারলেন না; বলেছেন কাল সন্ধ্যার সময় আসবেন, তোমার সঙ্গে দেখা করতে"—

"তা বেশ বেশ, "তরু বললেন,—রাত্রে খাবার কথা বলেছিস ত?"

কৃষ্ণা মুখ ভার করে বললেন, "আমার অতশত মনে ছিলনা বাপু; নিজের বিয়ের জ্বালায় প্রাণ যাচ্ছিল ত অন্যের কথা ভাববো কি করে?"

তরু তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, "থাক থাক তোকে আর ভাবতে হবেনা; আসতে যে বলেছিস এই যথেষ্ট। এলে আমি না খাইয়ে ছাড়বো না"—

তরুর সন্দেশের ছাঁচ তোলা তখন হয়ে গিয়েছিল; তিনি বললেন, আমি এগুলো ঘরে তুলে রেখে আসি, তুই ততক্ষণে তোর চিতে কাঁটা নিয়ে আয়; আমি হাত ধুয়ে এসে তোর চুলটা বেঁধে দিই"—

"আসছি পিসিমা" বলে কৃষ্ণা পাশের ঘরে চলে গেল।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তরে গেছে। কৃষ্ণা রাত্রির ঘোর অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন। ঘরের সম্মুখের দালানে মাদুর পেতে বসে আছেন তরু। তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে কৃষ্ণা। দালানের নীচে উঠানে টবে রাশি রাশি ফুটে উঠেছে কৃষ্ণকলি ফুল। তার স্নিগ্ধ মধুর গন্ধে স্থানটী ভরে উঠেছে। কালো আকাশে ঝক্ ঝক্ করছে রাশি রাশি নক্ষত্রমণ্ডলী। আকাশে আর মাটিতে যেন, কেমন একটা করুণ শুব্ধতা থম্ থম্ করছে। ভাড়াটেদের বাড়ীতে, রেডিও বাজছে, ছেলেরা পড়ছে, মেয়েরা গান গাইছে; গিন্নীরা বাগ করছে; কর্ত্তারা পলেটিক্স করছে; তুমুল কোলাহলে ওদিকটা মুখরিত। এদিকে কিন্তু তার মোটে ছোঁয়াচ লাগেনি। কৃষ্ণার দিকে চেয়ে তরু ভাবছেন, দেখতে দেখতে দিনগুলো কোথায় চলে যাচ্ছে, হায়, একটা দিনকেও একটু থামির জন্য ধরে রাখা যায় না। এই ত সেদিনের এই কৃষ্ণার তিনি ছাড়া আর কোনও অবলম্বন ছিল না।

কিন্তু আজ সে বড় হয়েছে; তাঁর বক্ষ হতে অজ্ঞাতে কখন ঝরে পড়েছে সেই কৃষ্ণকলি, এখন এই চ্যুত পুষ্প-মুকুল তিনি কার হাতে দেবেন, এই চিন্তাই তাঁর আজ প্রধান হয়ে উঠেছে। দিতে হবে তিনি জানেন, তবু দেবার কথা মনে হলেই, তাঁর বুকের ভিতরটা কেমন যেন টন টন করে ওঠে; চোখ দুটোতে জল ভরে আসে মনে হয় তাঁর যেন নিদারুণ অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে, অন্তত সে মৃত্যু। তপ্তশ্বাস কৃষ্ণার মুখের দিকে তরু নির্নিমেষে চেয়ে থাকেন অশ্রু ছল ছল চোখে অন্ধকারের মধ্যে তিনি যে কি দেখতে পান তা তিনিই জানেন।

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

মন্টেসরী কৃতি বঙ্গ রমণী—শ্রীমতী নন্দরাণী বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, বি-টি, ডিপ্লমা মহোদয়া ধরানগর পৌরসভার কমিশনার, বেথুন কলেজের অধ্যাপিকা। তিনি সম্প্রতি বিলাতে মিস্ চাইল্ডের রেকর্ড হইতে মন্টেসরী ট্রেনিং লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সম্প্রতি সত্ত ব্যারিষ্টার পরীক্ষায় লণ্ডনের মিডিল্ টেম্পল হইতে সনদ প্রাপ্ত পরিত্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহ হওয়ায় এখন নন্দরাণী বন্দ্যোপাধ্যায় রূপে খ্যাতা।

অধ্যাপিকা কীর্ত্তনীয়া শ্রীমতী শোভনা চৌধুরী—

শোভনা দেবী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কীর্ত্তন বিষয়ে প্রথম মহিলা গ্র্যাজুয়েট হইয়া বি, মিউ উপাধি পাইয়াছেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীতের অধ্যাপিকা নিযুক্ত হইয়াছেন।

লীলা লেকচারার শ্রীমতী অপর্ণা দেবী :—

বর্ত্তমান বর্ষে ১৯৫৭ সালের জন্য শ্রীমতী অপর্ণা দেবী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের লীলা লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছেন। স্বর্গীয় রথেন্দ্র মোহন ঠাকুর মহাশয়ের দানে এই পদ সৃষ্টি হইয়াছে। পূর্ব্বে ১৯৪৫ সালে শ্রীমতী অনুরূপা দেবী, ১৯৪৭ সালে শ্রীকালিদাস রায় কবিশেখর, ১৯৪৯ সালে শ্রীক্ষিতীমোহন সেন, ১৯৫১ সালে শ্রীঅর্দ্ধেন্দু কুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ১৯৫৩ সালে শ্রীমতী ডাঃ রমা চৌধুরী, ১৯৫৪ সালে শ্রীউপেন্দ্র নাথ গাঙ্গুলী লীলা লেকচারার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচনে জয়ী লোকসভার মহিলা সভ্যা

দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচন ১৯৫৭ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্ব্বাচন বলে লোকসভার জন্য বাঙ্গলার ৩৬টী

সদস্যের জন্য বাঙলা হইতে নিম্নলিখিত তিন জন মাত্র মহিলা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীমতী রেণুকা রায়—পূর্ব্বে সভা ছিলেন বিগত প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচন দ্বন্দ্বে শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চাটার্জ্জি (বিপ্লু সভা) মহাশয়ের নিকট পরাজিত হইয়া—পশ্চিম বঙ্গ রাষ্ট্রের গত মন্ত্রীমণ্ডলীতে তিনি পুনর্ব্বাসন দপ্তরের ৫ বৎসর মন্ত্রী ছিলেন। তিনি লণ্ডনের বি-এস-সি, উপাধিধারী, ১৯৪৩ সালে নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসাবে কেন্দ্রিয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যা হন। ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশে অনেক রাষ্ট্রে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং ১৯৪৯ সালে সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সভায় ভারতীয় প্রতিনিধি ছিলেন।

শ্রীমতী ইলা পাল চৌধুরী বেশবিদেশে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তা ও সুবক্তা মহিলা। একাধিকবার সমগ্র ইউরোপে ও জাপান পরিভ্রমণ করিয়াছেন, ফরাসী, ইংরাজী ও নেপালী ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট দখল আছে আছে। তিনি বহু নেপালী গ্রাম্য সঙ্গীতের তর্জ্জমা করিয়াছেন, এবং দেশী ও বিদেশী সঙ্গীতে পারদর্শিনী।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী—জন্ম ১৯১১ তিনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ১৯৩৮ সালে বিশ্বযুবা কংগ্রেসে একমাত্র মহিলা প্রতিনিধি রূপে আমেরিকায় যান। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ১৯৪০—৪২ সালে ব্রিটিশ সরকার তাঁহাকে অন্তরীণ করিয়াছিল। গত প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনে তিনি লোকসভার সদস্যা হন। মেয়েদের সম্পত্তিতে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী প্রাণপণে সমর্থন করেন। তিনি কম্যুনিষ্ট সমর্থিত দলে প্রার্থীরূপে বসিরহাট কেন্দ্র হইতে লোক সভায় পুনর্নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায় মহিলা সভ্যাগণ :—

দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচনে পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার মোট ২১৬ জন সভ্যের মধ্যে আট জন মাত্র মহিলা কংগ্রেস দলের, কম্যুনিষ্ট দলের ১ জন মাত্র এবং লোকসেবক দলের ১ জন মাত্র মহিলা সভ্যা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। প্রজাসমাজতন্ত্রী, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর, এস্, পি, বঙ্গীয় দলের একজনও মহিলা নির্ব্বাচিত হন নাই। নির্ব্বাচিত সভ্যার মধ্যে কংগ্রেস দলের শ্রীমতী অরুণি খান জন্ম ১৯২৩ নাড়াজোলের রাজা দেবেন্দ্রলাল খাঁর পুত্র অমরেন্দ্রলাল খাঁর স্ত্রী; (মেদিনীপুর কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত)।

শ্রীমতী আভালতা কুণ্ডু বর্দ্ধমান কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত জন্ম ১৯২৯ সাল চুচুড়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণীতে এম্-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা তিনি ও তাঁহার স্বামী বিমল কুণ্ডু দুই জনই বর্দ্ধমান রাজ কলেজের অধ্যাপক।

শ্রীমতী ডাঃ মৈত্রেয়ী বসু—কলিকাতার কোর্ট কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ১৯৪৯ সালের নির্ব্বাচনেও তিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-বি, ও জাপানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উপাধি লাভ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি প্লেকতার হন এবং তিন বৎসরের জন্য গৃহে বন্দী থাকেন। তিনবার তিনি আন্তর্জ্জাতিক শ্রম সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন।

শ্রীমতী পূরবী মুখার্জ্জি—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা ভাষায় কৃতি এম্-এ উপাধিধারী গত নির্ব্বাচনে বাকুড়া হইতে কংগ্রেস তরফে নির্ব্বাচিত হইয়া উপমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন।

শ্রীমতী অনিমা হোড়—জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীমতী তুষার তুণ্ড—গড়বেতা হইতে, শ্রীমতী সুধারাণী দত্ত—রায়গড়, শ্রীমতী মায়া বানার্জ্জি কাবতীন হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

কম্যুনিষ্ট দলের ৪৩ জন নির্ব্বাচিত সভ্যের মধ্যে কেবল এক জন মাত্র মহিলা সভ্যা—শ্রীমতী অনিন্দুবালা সেন কালীঘাট কেন্দ্র হইতে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতিছাত্রী, বাগ্মী ও দক্ষ সমাজকর্ম্মী হিসাবে তাঁহার খ্যাতি বহুজন বিদিত।

শ্রীমতী লাবণ্য প্রভা ঘোষ—পুরুলিয়া কেন্দ্র হইতে লোক সেবক সঙ্ঘের প্রতিনিধি রূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তিনি পুরুলিয়ার বিখ্যাত জন সেবক শ্রীঅতুল চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পত্নী।

———

সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতি

নতুন মহিলা সমিতি

বাণী মন্দির মহিলা সমিতি

নৈহাটী বিজয় নগর (উদ্বাস্তু) কলোনীতে বাণীমন্দির মহিলা সমিতি ১৯৫৭ সালে স্থাপিত হয়। উক্ত সমিতি পরিদর্শনান্তে সমিতির শিল্প শিক্ষিকার বেতন বাবদ আংশিক সাহায্য ও বয়স্কা শিক্ষা ক্লাস পরিচালনা করা মঞ্জুর করা হয়। সমিতিতে নিয়মিত শিল্প ও বয়স্কা শিক্ষা ক্লাস পরিচালিত হইতেছে।

রাণাঘাট মহিলা সমিতি

রাণাঘাট বেলওয়ে কলোনীতে মহিলা সমিতি স্থাপিত এবং ১৯৫৭ সনে কেন্দ্র সমিতির সহিত সংযুক্ত হয়। পরিদর্শনান্তে সমিতির শিল্প শিক্ষিকার বেতন আংশিক বেতন বাবদ সাহায্য মঞ্জুর করা হয়।

মহিলা সমিতির বার্ষিক উৎসব ও শিল্প প্রদর্শনী

কাঁচড়াপাড়া ও ভাটপাড়া

দ্বিতীয় বার্ষিক বেল সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে কাঁচড়াপাড়া ও ভাটপাড়া মহিলা সমিতিদ্বয়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় গত ১৩ই

সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত মহিলা সমিতি সমূহের ১৯৫৬ সনের বার্ষিক শিল্প পরীক্ষা কয়েকটি কেন্দ্রে গৃহীত হয়। নৈহাটী মহেন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং তাঁহার সহকর্মীগণ নৈহাটী কেন্দ্রের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। ছবিতে ঐ কেন্দ্রের পরীক্ষার্থী এবং পরিচালকবৃন্দ।

এপ্রিল হাইওয়্যার ইন্‌স্টিটিউট হলে এক শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। কেন্দ্র সমিতির অন্যতমা সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা শেফালী চৌধুরী উক্ত প্রদর্শনীর শিল্প দ্রব্য সমূহের তত্ত্বাবধান বিচার করেন। ১৪ই এপ্রিল কৃতী ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়।

হৈহাটী (রেলওয়ে) মহিলা সমিতি

দ্বিতীয় বার্ষিক রেল সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষে হৈহাটী রেলওয়ে মহিলা সমিতি কর্তৃক গত ১৫ই এপ্রিল রেল ইন্‌স্টিটিউট হলে শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রীদের উপাধিপত্র ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমিতির ছাত্রীবৃন্দ কর্তৃক নৃত্য ও নাটিকা অনুষ্ঠিত হয়। শিয়ালদহ বিভাগীয় অধিকর্ত্তার পত্নী মাননীয়া শ্রীযুক্তা সুধাইয়া প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন ও পুরস্কার বিতরণ ও সভানেত্রীত্ব করেন।

চাকদহ মহিলা সমিতি

গত ২০শে এপ্রিল চাকদহ মহিলা সমিতির তৃতীয় বর্ষ সমাপনান্তিক সম্মেলন চাকদহ রামলাল একাডেমী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির মহিলা সমিতি সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অমিতা চৌধুরী সভানেতৃত্ব করেন এবং বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা ও পশ্চিম-বঙ্গের নারী সংগঠনের অন্যতমা নেত্রী ডাঃ কুলদেশু গুহ প্রধানা অতিথিরূপে উক্ত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে সমিতি কর্তৃক শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

দেবী আসরের রবীন্দ্র-জয়ন্তী

গত ৩১শে বৈশাখ শ্রীসুলেখা মুখোপাধ্যায়ের বাসভবনে শুচি স্নিগ্ধ পরিবেশের মধ্যে দেবী আসরের রবীন্দ্র অনুষ্ঠান-দিবস অনুষ্ঠিত হয়। ধূপ ধূনার সুগন্ধে—পুষ্প মাল্য শোভিত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি, সভা মঞ্চকে আলোকিত করে তুলেছিল। প্রথমে উষা ভাদুড়ীর উদ্বোধন সঙ্গীতের পর আবৃত্তি করেন শ্রীশেফালী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপ্রভাবতী ভট্টাচার্য। কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী অর্পণ করেন শ্রীকণিকা ভাদুড়ী। গীটারে রবীন্দ্র সঙ্গীত বাজান শ্রীবিবস্বত মুখোপাধ্যায় শ্রীপ্রবীর ঘোষ ও শ্রীঅঞ্জলি মুখোপাধ্যায়। ভাবময় নৃত্য করেন শ্রীঅলকানন্দা সোমাদী। সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন শিশু শিল্পী সোমা মুখোপাধ্যায়। শ্রীমধুচ্ছন্দা ভাদুড়ী ও শ্রীতারা দেবাদ্ভি। বাঁশী বাজান কণিকা ভাদুড়ী। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রীমতি দেবী। এই সভা সুষ্ঠুরূপে পরিচালনা করেন শ্রীসুলেখা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসতীদেবী মুখোপাধ্যায়।

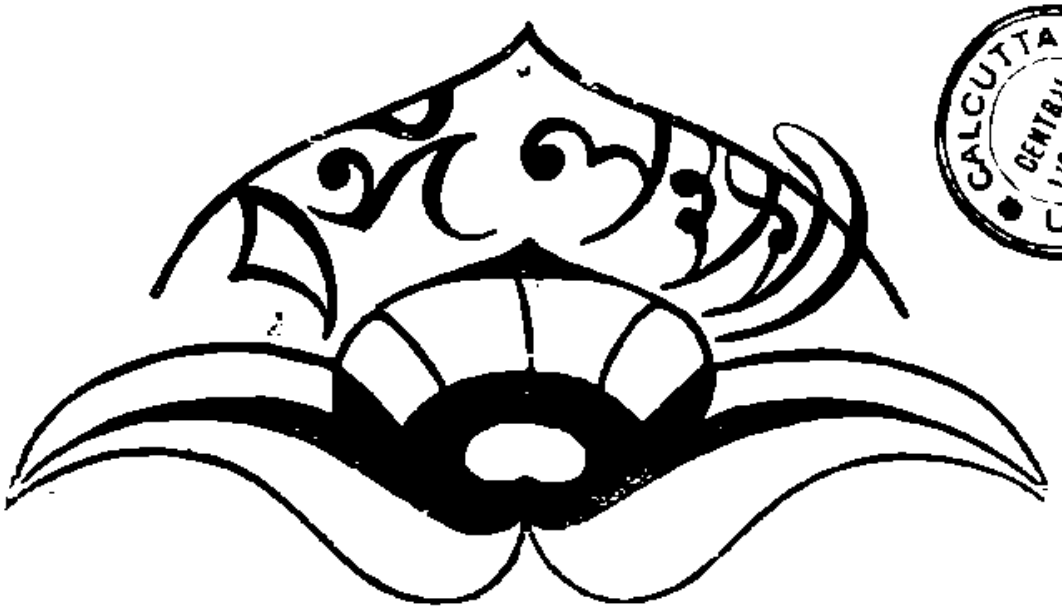

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৩য় সংখ্যা] শ্রাবণ—১৩৬৪ [৩য় বর্ষ

মাতৃমূর্ত্তি

শ্রীপুষ্প দেবী

আতে নয়নে যাঁর অমৃতের ধারা পড়ে ঝরে,
মাতৃ মহিমার দীপ্তি ললাটেতে আঁকা থরে থরে।
সন্তান স্বাচ্ছন্দ তার ক্লান্তিহীন দুটি হাত যাঁর,
বাৎসল্য প্লাবনে ভরা প্রাণ-খানি মূর্ত্তি করুণার।
অমৃত রূপিনী সে যে মাতৃত্বের অপূর্ব্ব মহিমা,
জ্যোতির্ম্ময়ী রূপ তবু স্নিগ্ধতায় ভরা গরিমা।
পুত জন্মভূমি সম, স্বর্গ সম আনন্দ দায়িনী,
আশীষ পরশে যাঁর দূরে যায় সর্ব্ব দুঃখ গ্লানী।
অমৃত ও পরমায়ু বিতরি সে প্রসন্ন নয়ানে,
সহজ স্বচ্ছন্দ স্নেহে সন্তানেরে কোলে টেনে আনে।
হেরি সন্তানের মুখ, অন্তরের লেখা পাঠ করে,
ভুল বুঝিবার ভয় যাঁর কাছে নাই কণ তরে।
মা নামে সার্থক তাঁর অন্য সবে মিছে বিড়ম্বনা,
অন্তরের মা ডাক লইতে মায়ও চাই প্রচুর সাধনা।

——

নারী-দরদী দ্বিজেন্দ্রলাল

ডাঃ কৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্য সরস্বতী।

বাংলার 'ঘুম-ভাঙানে' মহান্ কবি, জাতীয়তার এক নিদাধান্ পুরোহিত দ্বিজেন্দ্রলাল, কোন দিক না দেখে, সারাজীবন কল্যাণব্রতী বিপ্লবের শঙ্খ বাজিয়ে গিয়েছেন। অন্যায় যেখানেই মাথা তুলুক না, তাঁর ক্ষুরের শর গিয়ে বিঁধেছে তাকে। শাসক মুক্তি পায়নি, সমাজ মুক্তি পায়নি, মুক্তি পায়নি—অপূর্ব, বিরাট সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্ব। প্রকৃত কল্যাণব্রতী বিপ্লবী ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তা কাকে বলে তিনি জানতেন না। রাজভক্ত অভিজাতের রাজানুগত দেওয়ানের ছেলে এমনি অসাধারণ পৌরুষ-সম্পন্ন না হলে কী অমন উত্তপ্তশিরে জীবন কাটাতে পারতেন? মনীষী গুরুদাস দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনের অন্তি সত্যকে প্রকাশ করেছিলেন ক'টি কথা ব'লে—"যাকে যিনি যথার্থ ভালবাসেন, ভক্তি করেন, মা ব'লে ভাবতে জানেন, তিনি কি নিজের একটু নিন্দার ভয়ে মাতৃমন্দিরকে কলুষিত হ'তে দিতে পারেন?"

মায়ের প্রতি এই ভক্তি-ভালবাসা মাতৃজাতির প্রতি দরদ ছাড়া আর কিছুই নয়।

মাত্র আট বৎসর বয়স থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল গান ও কবিতা লেখা শুরু করেন। তাঁর অমর সৃষ্টি—'আর্য গাথা—১ম ভাগ' তাঁর ছাত্রাবস্থায়, ১২ থেকে ১৭ বৎসর বয়সে লেখা। গানের অভাব ঘোচানোর উদ্দেশ্যে এই বই লেখা হয়নি, তা লেখা হয়েছিল—আঁধারের স্বপন ঘুচিয়ে পাষাণের ঘুম ভাঙাতে। এই অল্প বয়সে দেশমাতৃকার দুঃখ তিনি জীবনের শেষ ক্ষণ পর্যন্ত অনুভব করেছেন, বিপ্লবের বাণী ছড়িয়েছেন, অভিযাত্রীদের যুগিয়েছেন চির-যৌবন অনুপ্রাণনা।

আর্য—হিন্দু বিধবার দুঃখে কাঁদলো কবির মর্মবীণা ঐ বয়সেই—

কেঁদ না রে অনাথিনী কেঁদ না রে আর।
পারি না হেরিতে অশ্রু আর নয়নে তোমার।
নত অবনত মুখে, নীরবে মনের দুখে,
দারুণ অনলদাহ হৃদয়েতে অনিবার।
ভাতিত স্বর্গীয় শোভা যে চারু আননে,
জ্বলিত ত্রিদিব-জ্যোতি যে যুগল লোচনে,
বিশুষ্ক সে মুখ হেরি, সে নয়নে অশ্রুবারি,
নিরখি উথলি হয় যায় শোক পারাবার।
সাজিতে নবীন বেশে ভূষিত রতনে,
বাঁধিতে চিকুরদামে আনন্দে, যতনে;
আজি মলিন সে বাস, আলুলিত কেশপাশ,
পারে না হেরিতে মাতঃ হায় হায় নয়নে আমার।
কেঁদ না রে অনাথিনী, কেঁদ না রে আর।

এ ভাববিলাসী কবির কল্পনাসুন্দর কাব্য নয়; এ আমাদের নারী-সমাজের এক বিরাট অংশের বাস্তব চিত্র। আর, কৈশোরে দরদ দেখিয়েই কবি নীরব হননি, পরিণত বয়সে 'আলেখ্য'তে লিখেছিলেন—

যতখানি কেঁটে যাক্
যতখানি দেখতে পাক্'—
ধূ ধূ করছে জীবন-মরুভূমি—
মহাশূন্য, রুদ্ধ সে যে,
জ্বলছে অগ্ন-কারী তেজে,
অগ্নি নিয়ে খেলা করছে বায়ু;
নাই ক বারি, নাই ক তরু,
কেবল বালু, কেবল রুক্ষ;
—শুষ্ক তপ্ত দীর্ঘ পরমায়ু।

তারপরই বলছেন—

হায় রে মানুষ! বিধির কৃত্য
চোখের সামনে দেখ্‌ছি নিত্য,
তবু আমরা চক্ষু বুজে থাকি;
খোসামোদের মদ্দির খুলে,
মিথ্যার কৃষ্ণ নিশান তুলে,
উচ্চৈস্বরে "বহাল" ব'লে ডাকি!

যার নিয়ে মাতামাতি করতেন না কবি, ঘরই ছিল তাঁর বাইরের পথপ্রদর্শক। যাকে তিনি প্রকৃত পক্ষে ভালবাসতে পেরেছিলেন বলেই, মাতৃভূমিকে—মাতৃজাতিকে দিতে পারলেন আন্তরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহ। গ্রেট-ন্যাশনালিস্ নিয়ে লণ্ডনের লিংকন্স্ ইন্ কলেজে যখন কবিবিদ্যা অধ্যয়ন করছিলেন, তখনই ১৮৮৪ সালে, এক বৎসরের মধ্যেই কবি বাবা ও মাকে হারালেন। এই মা-হারানোর ব্যথা তাঁকে কথাচ্যুত করতে দিয়েছিল। সম্ভবতঃ মাতৃভূমি ও মাতৃজাতির অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট অনুভব করেই তিনি ঠিক ছিলেন, নিজের দুঃখ দিয়ে সেই দুঃখ যতদূর সম্ভব ঘোচাতেই করলেন যাত্রা শুরু।

প্রেসিডেন্সী কলেজে যখন এম-এ পড়ছিলেন, তখন কলকাতায় গড়ের মাঠে—প্রথম ইডেন স্যানিটারি এগ্‌জিবিশন হয়। ১৯০৩ বৎসর বয়স্ক দ্বিজেন্দ্র এক সন্ধ্যায় সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে প্রদর্শনী দেখতে গেলেন—কয়েকটা গোরা-সৈন্য দু'টি ভদ্রমহিলার সঙ্গ নিয়েছে, তাঁদের অপমান করতে চাইছে বারবার। স্ত্রীলোক দু'টি যেন অস্থির হ'য়ে উঠেছেন দেখে দ্বিজেন্দ্র বন্ধুদের বললেন, ঘুষোর মহড়া করতে চাইলেন; কিন্তু বন্ধুরা রাজী গেল। দ্বিজেন্দ্র একাই এগোলেন মাতৃজাতির সম্মান রক্ষা করতে। বাঙালীর ঘুসি সাহেবদের নাক দিয়ে রক্তের গঙ্গা ছুটিয়ে দিল। কিন্তু তিনি একা এবং দুর্দান্ত শত্রুর সংখ্যা অনেক। তবু, জয় হ'ল তাঁরই। রক্তাক্ত সৈন্যেরা শেষে তাঁর সঙ্গে হ্যাণ্ড-শেক্ ক'রে ক্ষমা চেয়েছিল।

একবার এক বন্ধুকে বলেছিলেন কবি—"আমার বিশ্বাস কি জান, ভাই, যতদিন আমাদের বাল্য-বিবাহ প্রথা, শুধু এই প্রথা কেন—সামাজিক অনেক প্রথাই উঠে না যায়, অর্থাৎ সময়ানুরূপ সংস্কৃত না হয়, ততদিন পলিটিক্যালি এক হওয়া অসম্ভব।" নারীকে নিয়ে নারীর তথাকথিত ভাগ্যবিধাতারা যে-সব ঘৃণিত খেলা খেলেন, তারই বিরুদ্ধে এই বিপ্লববাণী। বিলেতী মোহে হিতাহিত না ভুলে হিন্দু-সমাজকে সংস্কৃত করার পক্ষপাতী ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। দারিদ্র্যের ফলে বয়স্থা কুমারীদের সম্বন্ধে 'স্বনারী'তে লিখেছিলেন—"যে দেশে বালবিধবা ব্রহ্মচারিণী দেবীর অভাব নেই, সে দেশে যোগ্য পাত্রাভাবে অক্ষম দরিদ্র পিতার কুমারী কন্যা যেন যে দু-চার বছর ব্রহ্মচর্য পালন ক'রে পিতৃগৃহে বাস করতে পারবে না, এ ত বোঝা যায় না। লোকনিন্দা? লোকনিন্দার কথা কেন বল? আগে সমাজের সবাই শিক্ষিত হোক, তারপর তাদের কথার না হয় বিবেচনা করা যাবে। যদি কুমারীরা ব্রহ্মচর্য পালন করতে পারে না, এই তোমার মত হয়, বালবিধবারাও পারে না। তবে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত কর।" মতাকে প্রকাশ করতে কবি একটুও ইতস্ততঃ করলেন না।

পণপ্রথায় তিনি সমর্থক ছিলেন না। তিনি নিজেই তার প্রমাণ। কলকাতার বিখ্যাত ধনী ডাক্তার প্রতাপ মজুমদারের বড় মেয়ে (১২) সুরবালাকে তিনি বিয়ে করেন এক পয়সাও না নিয়ে এবং জীবনে স্ত্রীকে কিছুই নিতে দেননি বাপের কাছ থেকে। তবে বলতেন—"ছেলেদের জন্য সব রেখে মেয়েকে কিছু দিয়ে বিয়ে করা অন্যায়।" স্ত্রীধন হিসাবে মেয়ে বাপের কাছে কিছু পাক, এই ছিল তাঁর মত। তাঁর মতই তো বর্তমানে অনুসৃত হ'তে চলেছে?

মেয়েদের অবরোধ প্রথাকে দ্বিজেন্দ্রলাল বলতেন জাতীয় অমঙ্গল; আবার, বিলেতী কায়দায় মেয়েদের নাচানোও জাতীয় মঙ্গল নয়—ব'লে গেছেন। বাল্য-বিবাহ ও বিলিতী আদর্শে 'কোর্টশিপ্' উভয়ই বিদ্রূপের ঘৃণার বিষয় ছিল।

স্ত্রীকে তিনি সত্যিকারের ভালবাসা দিয়েছিলেন। বিদেশী বন্ধুদাতের পর লিখেছিলেন—

"আজ যেন রে প্রাণের মত
কাহারে বেসেছি ভাল;
উঠেছে আজ নূতন বাতাস,
ফুটেছে আজ অরুণ আলো!

১৬ বৎসর পরে স্ত্রী-হারা কবি লিখলেন—

যতখানি দেখা যায় ধূ ধূ করে শুধু
অসীম বারিনিধি!
অহো—কি মনুষ্য-জন্মই তোমার এ বিশ্বে
তৈরের করেছিলে বিধি!

বিধবা ও বিপত্নীক উভয়েই ব্রহ্মচর্য পালন করবে, নিজের

এই মত। দশ বৎসরব্যাপী বিপত্নীক-জীবনে তিনি তা অনুসরণ ক'রে গিয়েছেন। ভাল পোষাক পরেন নি, গায়ে সাবান মাখেননি। সংসারে ছিলেন শুধু 'ঘণ্টু' ও মায়া'র জন্যে। বলতেন—"আমার জীবনের উজ্জ্বল অধ্যায় শেষ হ'য়ে গিয়েছে। এখন এ জীবন কেবল যাপন করা মাত্র। পুত্রকন্যা যদি না জন্মিত, তা হ'লে হয়তো একদিন সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে যেতাম। ঘণ্টু-মায়ার মায়া ত্যাগ করা শক্ত তাদের জন্যই আমো বাস্ত আছি।"

আজীবন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের লোক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল। তিনি যে ছিলেন জাতির আদর্শ পুরোহিত ও প্রকৃত বিপ্লবী কবি।

তাঁর বিপ্লবী জীবন ছিল নিত্য-অনুষ্ঠ; তাই সনাতন প্রতিষ্ঠাতেও কঠোর আঘাত হেনেছে।

মহর্ষি বাল্মীকি সব কুলকে বললেন—'শ্রীরামচন্দ্র তোমাদের পিতা; তাঁকে প্রণাম কর!' নারী-দরদী বিপ্লবী কবি সবের মুখে বিপ্লববাণী জাগালেন—

"মহর্ষি, কৈশোরে ছায়াসম
যে পত্নী সাম্রাজ্য ছাড়ি রামানুবর্তিনী বনবাসে
সহায় যে তার জন্য করে নাই সুদীর্ঘ প্রবাস
অশ্রুপাত বিনা, লোকনিন্দাভয়ে তারে অনায়াসে
দেয় নির্বাসন-দণ্ড যেই রায়—ক্ষমা করো মোরে,
ভগবান্, সেই রামে প্রণাম না করে সব!

তিনি অযোধ্যার ঈশ্বর হোন, তিনি নিখিলের পতি হোন, তিনি তুচ্ছ, তিনি ছার! রাবণ-বিজয়ী হলেও তিনি শতধার ভীরু।"

আর এক বিপ্লব-বাণী—"সব দোষের কারণ আছে, সমস্ত অপরাধেরই হয়তো প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু সমাজের সব শাস্তি, শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্যের আধার বা মূখ্য-কেন্দ্রের প্রতি এই যে আমাদের অবিচারিত অত্যাচার ও আঘাত, জননীদের প্রতি এই যে আমাদের অবজ্ঞা ও উপেক্ষা—এ ভয়ঙ্কর মহাপাতক থেকে আমাদের কিছুতেই একেবারে পরিত্রাণ নেই। হাজার রকমের অধঃপাতে গিয়াও আজ আমাদের মতো নিম্নতম স্তরের লোকেরাও যেসব কাজ করতে লজ্জা পায়, সভ্যতার চরমোচ্চ শৃঙ্গে প্রতিষ্ঠিত থেকে ও পরম পূজ্যরূপে স্বীকৃত হয়েও স্বয়ং রামচন্দ্র ও যুধিষ্ঠির পর্যন্ত তা অসঙ্কোচে ক'রে গেছেন। সীতার বনবাস ও অগ্নিপরীক্ষা এবং অক্ষক্রীড়ায় দ্রৌপদীকে বাজি রাখার ব্যাপার একটু বিবেচনা করে দেখলেই আমরা যাথা হেঁট ক'রে মানতে বাধ্য হই যে, স্ত্রীকে আমরা পার্থিব সম্পত্তির তুলামূল্য ভাবে গণ্য করি।"

নির্ভীক, নারী-দরদী, বিপ্লবী পুরুষ সিংহ না হ'লে এমনভাবে সনাতনের সমালোচনা করা আর কারো পক্ষে সম্ভবপর হ'ত না। কিন্তু দুর্ভাগা আমরা। স্থূলের চরম মাদুল ঝোলানোর দিকে সব মন নিযুক্ত করায় ঐ মহাজীবনকেও আমরা ভুলতে বসেছি। তবে আমাদের এ আশা পূর্ণ হবে না। নিজগুণে তিনি হ'য়ে গেছেন—ভারতের ধন। তিনি অমর—মর মানুষের সংসারে। তাঁর জন্ম দিনে, এঠা শ্রাবণে আমরা যেন শপথ নিই তাঁরই মহাবচন উচ্চারণ ক'রে—"আবার তোরা মানুষ হ'!"

প্রথমা

শ্রীশৈলী মুখোপাধ্যায়

সেদিন ইলিয়ট রোডের মোড়ে বহুদিন পরে কল্যাণের দেখা হয়ে গেল উর্মির সঙ্গে। অন্যমনস্কভাবে উর্মি হেঁটে যাচ্ছিল, কল্যাণই তাকে দেখতে পেল প্রথম। লাইন পার হবার অবকাশে যেটুকু দাঁড়াবার সেই অবসরে কল্যাণ এসে তার পাশে দাঁড়ালো। তাকে দেখে উর্মি যে এত অবাক হয়ে যাবে কল্যাণ ভাবেনি। তার মুখের দিকে চেয়ে বিস্মিত কণ্ঠে উর্মি বললে—তুমি হঠাৎ? কোথা থেকে? মাত্র দু বছরের অদর্শনে কল্যাণ যে উর্মির কাছে এতটাই অবাক বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে তা তার জানা ছিল না। একটু মৃদুস্বরে বললে—খুব অবাক হয়ে গেছ দেখছি আমাকে দেখে। উর্মি সামান্য হাসলো, বললে—দীর্ঘ দু বছর নিরুদ্দেশের পর যদি হঠাৎ পাশে এসে কোন লোক দাঁড়ায় তা হলে একটু অবাক হয় বৈকি মানুষ। কল্যাণ সে কথার উত্তরে কিছু বললে না। উর্মির হাতের খাতা পেন্সিলের দিকে চেয়ে বললে—এই বিকেল বেলায় কলেজ যাচ্ছ বলেতো মনে হচ্ছে না। যাচ্ছ কোথায়? উর্মি বললে—যাচ্ছি কাছেই এই সার্কুলার রোডের মেসিহি ট্রিতে। এবার অবাক হওয়ার পালা কল্যাণের, বিস্মিত কণ্ঠে পরিহাসের সুর ফুটিয়ে সে বললে—কেন, সেখানে কি? এই দু বছরের মধ্যে ধর্মান্তরিত হয়েছ নাকি? উর্মি একটু অন্যমনে বললে—না; মেসিহি ট্রিতে যাওয়ার জন্য ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রয়োজন করে না। নিজের প্রয়োজনের তাগিদেই সেখানে যাই, তিন কামরা বিশিষ্ট অন্ধকার এক তলা বাড়ীতে ওটি পাঁচেক ভাই বোন আর মা বাবা সমেত আর সব কিছু চলে কিন্তু ছবি আঁকা চলে না, তাই এখানেই আসি। এখন জনতা অথচ নির্জন, পরিপূর্ণ আকাশ, গাছ আর ফুলের মিতালী আমাদের বাড়ীর কাছাকাছি ক'লকাতায় আর নেই। বলতে বলতে প্রত্যহের ছবিটি উর্মির চোখে ফুটে উঠলো। ছায়া শীতল একটী গাছের তলায় তন্ময় মন ছবি আঁকায়, অন্ধকার হলে চমক ভাঙে, যাবার সময় দেখে কোন মালি দুটী গোলাপ তোড়ায় বেঁধে কখন নিঃশব্দে রেখে গেছে। ক্ষুদ্র এই প্রীতিটুকুতে হৃদয় তার পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। স্বল্প ক্ষণের নীরবতা ভঙ্গ করে উর্মি বললে—যতক্ষণ ওখানে থাকি ততক্ষণ বাস্তব সংসারটাই ভুলে যাই কল্যাণ। কল্যাণ তার দূর বিসর্পী অন্যমনস্ক চোখের দিকে চেয়ে ম্লান হাসলো বললে—এই বিশ্ব সংসারটাই ভুলে যাও, তোমার এই পলায়নপর মনোবৃত্তি আমি কিন্তু সমর্থন করি না। দু জনে মেসিহি ট্রিম গেটে পৌঁছে গেছে। কল্যাণের দিকে চেয়ে উর্মি বললে—ভেতরে যাবে? কল্যাণ বললে—এতদূর এলাম যখন দেখেই যাই। নতুন কিছু করেছে নাকি? উর্মি বললে—নতুনের মধ্যে শ্রীমধুসূদনের অনাবৃত কবর সজ্জিত করেছে। তাঁর পৌত্র পৌত্রীরা শিল্পী রমেশ পালের গড়া একটী মর্মরমূর্তি স্থাপিত করেছে। আর সম্প্রতি রাজ্যপাল হরেন্দ্র কুমারের কবর আছে ওখানে। দু'জনে ভেতরে ঢুকলো। বসন্তমী ফুল আর ছোট বড় গাছের আন্দোলিত পাখায় লেগেছে ম্লান আলো। সহরের একেবারে মাঝে অথচ এমন নিঃশব্দ পরিবেশ, মাটির নীচে ঘুমন্ত মানুষগুলির মতই নিঃস্তব্ধ শান্তি, কল্যাণের মনেও কেমন শান্তির পরশ বুলিয়ে দিল।

উর্মি যে তার সঙ্গে খুব আগ্রহ ভরে কথা বলছে না এই ব্যথাটুকুও তখন সহজ মনে হচ্ছিল। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা এল ঘনিয়ে, উর্মির আর ছবি আঁকা চলবে না সেদিন। পথে বেরিয়ে কল্যাণ বললে—মনে আছে উর্মি সেদিনের কথা, অকল্যাণ তোমায়ে বলে কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা উত্তরে যেত, আমাদের খেয়াল থাকতোনা। মনে পড়লো উর্মির, কল্যাণ তখন ছিল মিশনারী কলেজের ছাত্র মাঝে মাঝে হুকুম করতো উর্মিকে, তার কলেজের কাছাকাছি থাকতে। তখন কি আশ্চর্য্য জোর আর তীব্র অভিমান ছিল কল্যাণের। তাকে তখন একটু ভয় করতো উর্মি, তার আদেশ পালন না করলে একটানা চব্বিশ ঘণ্টা উপবাস ও করতে পারতো কল্যাণ। আজ সেই জোর আর অভিমান হারিয়ে গেছে।

তার কলেজের কাছাকাছি অকল্যাণ তোমার। সেখানেই তার অপেক্ষায় বসে প্রতীক্ষা করতো উর্মি। শেষ দুপুরের নির্মেঘ আকাশের অনেক দূর থেকে চিলের ডাক ভেসে আসতো। জলে পুকুরের ধারে ধারে কোন অজানা চারা গাছগুলি দুল দুল করে দুলতো। আকাশের ছায়া বুকে নিয়ে টল-টল করতো পুকুরের জল। বনস্পতির শাখা প্রশাখার পাতায় পাতায় ঝিলমিল করতো বিকেলের আলো। কলেজ ছুটী হলে হত প্রতীক্ষার শেষ। তারপর কথায় কথায় অন্ধকার। উর্মির মনে পড়লো সে কথা, কিন্তু সে কথার উল্লেখ না করে বললে—মা বাবার সঙ্গে দেখা করবে না? কল্যাণ বললে—আজ নয়, কাল যাচ্ছি তোমাদের বাড়ী। উর্মি বাড়ীর পথে যেতে যেতে বললে—বচ্ছন্দে।

উর্মির মনে পঁচ বছর আগেকার ঘটনাগুলি ছায়া ছবির মত ভেসে ভেসে আসছিল। সেদিন কল্যাণের বাড়ী ছিল তাদের বাড়ীর পাশে। কল্যাণের বিরাট প্রাসাদের পাশে তাদের একতলা জীর্ণ বাড়ীটী যে নিতান্ত বেমানান খাপছাড়া দেখাত সে কথা সে বুঝতে পারতনা তখনকার বয়সে। কল্যাণের মা খুব ভালবাসতেন উর্মিকে। খুব ছেলেবেলা থেকেই উর্মি থাকতো তাঁর কাছে। তিনি নিজের স্নেহের অভাব উর্মিকে দিয়েই পূরণ করতেন সম্ভবতঃ। উর্মির বাবা হরপ্রসাদ বাবু দরিদ্র স্কুল মাষ্টার। তিনি কল্যাণের মায়ের উর্মির প্রতি স্নেহাধিক্যে মাঝে মাঝে বিরক্ত হতেন। কোন দিন সন্ধ্যার সময় পড়াবার ফাঁকে তিনি মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে বলতেন—কল্যাণের মা তোমাকে খুবই স্নেহ করেন মা, তিনি মহিয়সী মহিলা। তুমি কিন্তু গরীবের মেয়ে মা, একথা সর্বদা মনে রেখো। আরোও কথা বলতেন তিনি, স্বার্থত্যাগ আত্মসম্মান আদর্শবাদের কাহিনী। সে সব কথা সব বুঝতো না উর্মি, সে বয়সও তার ছিল না। তারপর আরোও বড় হলে কল্যাণ আর উর্মি স্বপ্নরচনা করেছিল মনে মনে। সেই বিচিত্র স্বপ্ন স্বজনের কথা ভেবে একটু হাসি ফুটলো উর্মির মুখে। সে স্বপ্নের পরমায়ু ছিল স্বল্প। তারপর অতর্কিতে কল্যাণের মা মর্মান্তা হলেন। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই উর্মির ভেতর এক বিরাট পরিবর্তন এসেছিল। অন্যমনস্ক মন সমাক্ষ সজ্জা, লেখাপড়ায় চেয়ে ছবি আঁকায় বেশী আগ্রহ সেই সময় থেকে তার মধ্যে সঞ্চারিত হল। আবময়লা শাড়ী পরা সস্তা চপ্পল পায়ে সারা ক'লকাতা ঘুরে বেড়ানো উর্মির প্রতি সে সময় কল্যাণের আগ্রহ বোধ হয় কিছু কমে এসেছিল, প্রায়ই অনুযোগ অভিযোগ শুনতে হত উর্মিকে। কল্যাণ অনাগ্রহ আরোপ করতো উর্মিতে, ছেলে মানুষের অভিমানে বলতো—সে না কি সমুদ্রে ভেসে আসা আগাছা, মা চলে যাবার পর থেকে উর্মি থেকেও চলে যাচ্ছে। কিন্তু ছেলে মানুষ উর্মি বোঝাতে পারতনা, মাসীমা চলে যেতে তাঁর স্নেহ আশ্রয় হারিয়ে উর্মির মানসিক নিরাপত্তাও হারিয়ে গেছে। এই অস্থির মন তাই কল্যাণের প্রতি উদাসীন না হলেও উন্মুখ নয়। বস্তুতঃ সে সময় তার মনের বিরহ বোধ থেকে তার শীর্ণাঙ্গে কেমন এক অজানা অপূর্ব ভাবধারায় ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠছিল বিলাস সজ্জা আর ঐশ্বর্য্যের ঊর্দ্ধে। কল্যাণ তখন সে মনের নাগাল পাবে কি করে? তবু উর্মি মাঝে মাঝে কল্যাণের বাড়ী গিয়ে তার সঙ্গে গল্প করতো হয়তো অনুপস্থিত কল্যাণের ঘরে গিয়ে ঢুকে থাকতো তার প্রিয় লেখকের রচনায়। কল্যাণও যেত সময় অসময়ে উর্মির বাড়ী। বই নিয়ে কিংবা উর্মি নতুন কি ছবি আঁকলো দেখতে, সেদিনের দিনগুলি ছিল তাদের অপরূপ, দুজনেরই একাগ্র মন যেন যন্ত্রে একজন গাইলে অন্যজন অবনে, কিন্তু একে অন্যের যাদুস্পর্শে যে অনাস্বাদিত মাধুর্য্যের প্রবাহ বয়ে যেত তার সেতুটী তখন ছিল তাদের দুজনেরই অজ্ঞাত। এমন সময়ে একদিন সন্ধ্যায় কাছাকাছি উর্মি এসেছে কল্যাণের বাড়ী প্রায় সন্ধ্যার আলো আঁধারিতে। উর্মি তখনও হালান পায় হয়নি; শুনলো কল্যাণের বড় দুই বৌদির মুখে তার নাম। স্বাভাবিক ভাবেই ধীর পায়ে সে চললো সেদিকে। বড় বৌদি বলছেন মেজ বৌদিকে—উর্মি আসে কেন যায়বার জানোতো সুরমা? সুরমা হাসতে হাসতে জবাব দিচ্ছেন—জানিনা আবার, বামন হয়ে চাঁদের আশায়। অনুকরণ করলেন বড় বৌদি—কি যে পছন্দ ঠাকুরপোর স্কুল মাষ্টারের মেয়ে। মেজ বৌদির কথা শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল উর্মি, একেবারে নিশ্চল প্রতিমূর্তির মতন।

সে তবে যামন, কল্যাণ চাঁদ! চোখ ভরে জল এসে পড়েছিল। দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে সে জল সংবরণ করে ফিরে এসেছিল। সেদিন সে বুঝেছিল যাবার প্রত্যেকটী উপদেশের অর্থ। তার রূপখ্যাতি কিছু নয়, গুণ গনার আদর নেই, সে যে বিত্তশালীনী নয়, এবং নয় বলেই সে যামন, কল্যাণ চাঁদ, যদিও কল্যাণরূপ চাঁদকে ধরবার তার অণুমাত্রও অভিপ্রায় ছিলনা। সেই থেকে তার সুন্দর কিশোর মনটী বিত্তশালীদের এই অসুন্দর নয় মনোবৃত্তির পর স্থগিত বিরূপতার রূপ নিয়েছিল। তারপর থেকে কল্যাণকে সে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলেছিল। বন্ধ করে দিয়েছিল তার হৃদয় দুয়ার। তার জন্ত কল্যাণ যে অভিমানে উদাসীন হয়ে গিয়েছিল তা সে দেখেও দেখেনি, তারা যেদিন ইলিয়ট রোডের নূতন বাড়ীতে চলে গেল, সেদিনও যায়নি উর্মি। কল্যাণ আর তার দাদা বৌদিরা অবশ্ত ভদ্রতা করে উর্মির মা বাবার সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে উর্মি যখন বাড়ী পৌছল, সন্ধ্যা তখন ঘন হয়ে এসেছে। ছোট বোনের কাছে এক গ্লাস জল চেয়ে খেল সে। উর্মির বাবা ফিরেছেন অনেকক্ষণ ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া দেখছেন। আর মাঝে মাঝে চোখ বুলোচ্ছেন হাতের কাগজ খানায়। সেখান থেকে একবার ঘুরে এসে, রান্নাঘরে মাকে সাহায্য করতে করতে রাজ্যের গল্প ফেঁদে বসলো উর্মি। পথে কল্যাণের সঙ্গে দেখা হওয়ার প্রসঙ্গও বাদ পড়লো না। কল্যাণও তার ঘরে বসে একটার পর একটা সিগারেট শেষ করছে। ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইটএর তুমিষ্ট গন্ধ তার স্নায়ু শিরাগুলি সতেজ করছে, উর্মিকে ভাবতে সাহায্য করতে। কল্যাণ ভাবছে, এখন উর্মি কেমন কথা বলতে পারে, ভদ্রতাসম্মত ভাবে, পরিমান করে। আগে কিন্তু ছল ছল চোখে তাকাতো শুধু, মা মারা যাবার পর কি যে হল উর্মির আর সে কল্যাণের দিকে তাকালো না। যাক ভালই হয়েছে। ওকে নিয়ে কল্যাণ সুখী হত না হয়তো দিল্লীর সভ্য সমাজে মানাতে পারত না। তার অফিসার্স কোয়ার্টারেও নয়। সেই ইলিয়ট রোডের বাড়ীতে আসার পর মস্ত চাকরী পেল কল্যাণ দিল্লী দপ্তরে। বৌদিরা বিয়ের কথা কতবার বলেন। কনের কটোর বোঝাই হল টেবিল, কিন্তু কোন বিদ্যাবতী গুণবতী রূপবতীতেই কল্যাণ মনোনীত করলো না। বৌদিরা রাগ করে বলেন—কল্যাণের জন্ত বোধ হয় অর্জার দিতে হবে সৃষ্টিকর্তার কাছে, কিংবা কল্যাণ কি আর কারুর জন্ত মালা রেখেছে? এই করে অনেকগুলি দিন কাটলো, এবার আর ছাড়বেন না বৌদিরা। মেজ বৌদির বোন, বড় বৌদির বোনঝির বরে তাঁরা আবেদন জানিয়েছেন, এবং সেই উদ্দেশ্তেই এখানে এসেছে কল্যাণ। কিন্তু উর্মি জানেনা কল্যাণ চিরদিনের জন্ত হারিয়ে যাচ্ছে; কোন স্মৃতি কি কিছু বেদনা ও কি সঙ্কল্প নেই কল্যাণের জন্ত তার মনে! আর কল্যাণ? আর কি ফিরবে না উর্মি? তার দৃঢ় চিবুক আর কঠিন মুখের ভঙ্গিতে সে কথা ভাবতেই পারেনা কল্যাণ, ইচ্ছাও হয়না—একি চাওয়ার জিনিষ, আমি চাইবো, তবে তুমি দেবে, চাইনা আমি এ ভিক্ষালব্ধ দান, তোমার অভিমান আর বিমুখতা নিয়ে তুমি থাক, আমি চললাম চিরকালের জন্ত। অনুপস্থিত উর্মিকে উদ্দেশ্ত করে কল্যাণের অভিমান, মনশ্চক্ষে পরমুহূর্তে ভেসে ওঠে সেই কঠিন মূর্তি, কল্যাণের মন ভীরু সংকোচে প্রশ্ন করলো—কি অপরাধ বুঝতেও পারিনি। পরদিন কল্যাণ তার সুসজ্জিতা বৌদিকে নিয়ে নিমন্ত্রণ করতে এল উর্মিকে। উর্মির মা শশব্যস্ত হয়ে উঠলেন তাঁর কুঁড়ে ঘরে কোথায় বসাবেন রাজেন্দ্রাণীকে। ছেলে মেয়েদের হাঁক ডাক দিতে লাগলেন। উর্মিকে বললেন—তোর সেই ঘন নীল শাড়ীখানা পড়ে ওদের সামনে যা যা। উর্মি মনে মনে মহা বিরক্ত হয়ে উঠেছিল, প্রকাশ না করে মৃদু ধীর স্বরে বললে—কি যে বল তুমি মা, আশ্চর্য্য এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? তা হবনা, ওঁরা কত বড় মানীলোক, বললেন মা। উর্মি হাতের বোনাই ফেলে ফেলে উঠে দাঁড়ালো। মুখে সহজ হাসি ফুটিয়ে অভ্যর্থনা করতে গেল সবৌদি কল্যাণকে।

মেজ বৌদি হঠাৎ সামনে উর্মিকে দেখে একটুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আটপৌরে শাড়ীর আঁচলটী ঈষৎ হলুদ রংয়ের ব্লাউসটীকে বেষ্টন করে উর্মির কাঁধে এসে বিশ্রাম নিয়েছে। এলো খোঁপার শুবক ভেঙে ভেঙে পড়ছে ঘাড়ের ওপর। উজ্জ্বল চোখে সহজ ভংগিতে অনায়াসলব্ধ সপ্রতিভতায় আলাপ অভ্যর্থনায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন মেজ বৌদি। উর্মি যে এত সুন্দরী হয়েছে এ তাঁর

ধারণা ছিল না। শেষে ঊর্মির মাকে বললেন আসল কথা আগামী কাল সন্ধ্যায় ঊর্মির নিমন্ত্রণ তাঁদের বাড়ীতে। আরো কয়েকটী ঊর্মির বয়সী মেয়ে আসবে। তাদেরই আত্মীয়া, ঊর্মি যেন অবশ্যই যায়। না গেলে তাঁরা খুবই দুঃখিত হবেন। বৌদি অবশ্য নিজের মনেও ভেবে পাননি, এ আদরে কল্যাণ ঊর্মিকে হঠাৎ বলতে গেল কেন? একেবারেই হঠাৎ, তারা ভাববারও সময় পাননি।

তারা বিদায় নিয়ে চলে যাবার পর বোনের আর মায়ের আলোচনা চললো কি পরে ঊর্মি নিমন্ত্রণে যাবে। ঊর্মি বলছে—তত্র রকম কিছু একটা পরে গেলেই হবে। তার জন্য ভাবনার কিছু নেই, ছোটবোন নিজের মায়ের আর দিদির সমস্ত কাপড় দেখেও পছন্দসই কাপড় পেলনা, যা তার দিদি পরে যেতে পারে। কল্যাণদের বাড়ীর নিমন্ত্রণে অবশেষে ঊর্মি নিজেই বেছে নিল একটি রেশমী শাড়ী, সমুদ্র নীল রং, পাড় আর আঁচলে জরির আঁকি বুকে রয়েছে দু আঙুল চওড়া। এটি তার গত বছরের জন্মদিনে পাওয়া মামার উপহার। বোনটি একটু ক্ষুণ্ণ হয়—ওটাতো তুমি অনেকবারই পরেছ দিদি, ঊর্মি বললে—তাতে কি, দেখতো কি সুন্দর শাড়ীটা।

কল্যাণদের তেতলার বড় ঘরে খাবার জায়গা হয়েছিল। নীচু ছোট ছোট টেবিলে রুপোর প্লেট চামচের ব্যবস্থা করে ছিলেন বড় বৌদি। পুরুষ দু একজন, মেয়েরাই বেশী। এর মধ্যে এক সময় ঊর্মিকে ডেকে বৌদিরা বললেন—জানো তো ঊর্মি, সেকালে মেয়েদের স্বয়ংবর সভা ডাকা হত, একালে আমরা ঠাকুরপোর জন্য ডেকেছি। কথাগুলো শুনে ঊর্মির হাস্যোজ্জ্বল মুখে গাম্ভীর্য ঘনিয়ে এল। সেই কঠিন মুখের দিকে চেয়ে বৌদি কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন। মেজ বৌদি তাড়াতাড়ী বললেন—ঠাকুরপো বললেন—"ঊর্মি আটিষ্ট মানুষ, সৌন্দর্য্য চেনবার আসল চোখ তার, সেই আমার বধূ নির্বাচন করবে।

বৌদিদের সঙ্গে কাজেও হাত দিল ঊর্মি, হাসি খুশী আর উৎসাহে ভরিয়ে দিল উৎসব লগ্ন।

মিলিতা মেয়েটি খুব সুন্দরী, শান্ত, ধীর, স্নিগ্ধ ভাষী, ঊর্মি একেই বাড় বরালো কল্যাণের পাশে। মিলিতা সুর তুলেছে পিয়ানোতে তার কাজল কালো চোখের পল্লব কেঁপে উঠছে। তার অন্তরাগ শাড়ীতে প্রবাল বর্ণাচরণে আর খোপায় রক্ত গোলাপে ও যেন সুরের মূর্চ্ছনা লেগেছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে তারা, তার সুপটু হাতে ঘুমিয়ে সুরের মূর্চ্ছনা ঘরের আবহাওয়াতেও ইন্দ্রজাল রচনা করেছে। মেজ বৌদি উজ্জ্বল বাতি নিভিয়ে জেলে দিলেন মৃদু নীলাভ বাতিটী। সেই জ্যোৎস্না রাত্রির আকাশের মত আলোভরা মায়াময় ঘর ছেড়ে ঊর্মি দাঁড়ালো সামনের ছোট্ট গোল ব্যালকনিটীতে। আকাশ তারায় তারায় আঁকা। দূরে কোন প্রাসাদের গবাক্ষ হীন জানালার ধারে বসে এক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক এক মনে বই পড়ছে। হঠাৎ একটী তন্বী-তরুণী মেয়ে এসে তার মেয়ে বইটা কেড়ে নিয়ে গেল। হাসতে হাসতে পালিয়ে যাচ্ছে কক্ষান্তরে। এই যে, ছেলেটা ছুটে ওর গাউন ধরে ফেলেছে। কেড়ে নিলে বইটা। মেয়েটী ছদ্মরাগে ফুলদানী থেকে এক গোছা ফুল নিয়ে ছুঁড়ে মারলো। যুবকটী হাসছে কেবল, চোখ নামিয়ে নিল ঊর্মি, মনে আসছে—দিল্লীর বাড়ীতে কল্যাণ মিলিতার রাগ অনুরাগ পাওয়া না পাওয়া নিয়ে হারানোর খেলা। মনে মনে কামনা করে ঊর্মি, সুখী হোক তারা। একে অন্যকে যেন সম্পূর্ণ করে পায়। কিন্তু গলার কাছে কি যেন ঠেলে আসে তার, চোখের পল্লব যেন ভিজে উঠছে, রাত বাড়ছে ক্রমে ক্রমে। সব অতিথি একে একে চলে গেল। বাচ্চারাও ঘুমিয়ে পড়লো ক্রমে ক্রমে, বাড়ীটাকেও কেমন যেন স্বপ্নময় নীরবতায় মূর্চ্ছিতার মত লাগছে। ঊর্মি যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। বড় বৌদি বললেন—এত রাত্রে এ্যাংলো মুসলিম পাড়া দিয়ে একা যেওনা ঊর্মি, কল্যাণকে ডাক, সে তোমাকে রেখে আসবে। ঊর্মি নামার প্রতিবাদ করলো, এই তো কাছেই বৌদি। বৌদি বল্লেন—না, না তা হবেনা, ডাক তুমি কল্যাণকে। আর কোন মেয়েকে চোখে লাগলো তোমার, সেটাও তার জানা দরকার তো। ঊর্মি হাসতে হাসতে তেতলার সিঁড়ি ধরলো উঠতে উঠতে বললে—সেটা আপনাদের মাননীয় হবে না?

কল্যাণ তার ঘরের জানালায় দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। সিগারেটের ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গটী তার চশমার কাঁচে

মাঝে মাঝে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। ঊর্মির পায়ের শব্দে সচেতন হয়ে দাঁড়ালো।

বড় বৌদির অনুরোধ আমাকে পৌঁছে দিতে হবে।

তোমাদের আদেশ অনুরোধ উপরোধ পালন করতে অধীন সর্বদা প্রস্তুত, বোস।

ঊর্মি হেসে বললে—আর বসবো না রাত হয়ে গেছে।

আচ্ছা ঊর্মি বলতে না তো কোন মেয়েকে জীবন সঙ্গিনী করতে পারি।

ঊর্মি বললে—একটু ভাঁজতে পারি বলে এমন কঠিন কাজের ভার দিলে। কিন্তু মনে হচ্ছে পছন্দটা আমার ভালই, মিলিতাকে কেমন লাগলো তোমার বলতো?

তার গায়ের চাঁপা রংয়ের সঙ্গে ম্যাচ করে ঘন সবুজ পাড় দেওয়া কমলা রংয়ের শাড়ীটী পরেছে, খোঁপায় রজনী গন্ধার মালা সেতারের সুর মূর্ছনা শুনেছ? আমার মনটা কেমন হয়ে গেল। বারান্দায় দাঁড়িয়ে শুনলাম। ভেসে এলো অন্ত বিহীন পথের সুর।

আবছা জ্যোৎস্না আলোয় বারান্দায় দাঁড়িয়ে আমার কিন্তু সত্যি মনে হচ্ছিল, কে যেন কতদূর থেকে অন্তহীন মরুভূমি পার হয়ে সুধা শ্যামলীর দেশে এসে পৌঁছেছে। নয়ন যুঁই ফুলের মালাটী তার হাতে জড়ানো, তুমি ওকেই বিয়ে কর কল্যাণ।

কল্যাণের অন্যমনস্ক দৃষ্টি তারই দিকে নিবদ্ধ দেখে ঊর্মি হঠাৎ চুপ করে গেল। লজ্জিত হয়ে ভাবলো—ছিঃ ছিঃ ছেলে মানুষের মত কত কি আবোল তাবোল বলছে সে কি ভাবছে কল্যাণ।

আর কল্যাণের মনে হল—মিলিতাকে তার সামনে ঠেলে দিয়ে ঊর্মি যেন তার দৃষ্টিপট থেকে সরে যাচ্ছে। মনের পট থেকেও। যেন মিলিতাকে তার সামনে দাঁড় করিয়ে তার দাবী বুঝিয়ে নিজের দাবী ফিরিয়ে নিয়ে চিরদিনের জন্য কোন সুদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে সে হঠাৎ কল্যাণের মনে হল, তার পায়ের নীচের মাটী যেন শক্ত নয়। কেমন অসহায় ক্ষুব্ধ ব্যথা ফুটে উঠলো তার মুখে। সে যেন একটু আগে ও জানত না পৃথিবীটা এই মুহূর্তে এত বিস্বাদ বিবর্ণ হবে তার কাছে। মনের এক অব্যক্ত শূন্যতা বোধ বাষ্পাকারে তার নয়ন আশ্রয় করে বাইরে আসবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠছে। ঊর্মি তার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ স্তব্ধ হলে সে সচেতন হয়ে ভাবতে পারলো মিলিতাকে, রূপে গুণে বিদ্যায় বয়স্ত কৌলিন্যে অনুপম, মিলিতাকে বিয়ে করলে তার অভিজাত সমাজ, তার দিল্লীর সুসজ্জিত ফ্ল্যাট, তার পার্টি জীবনের বহিরাবরণ ঝলমল করে উঠবে, কিন্তু এই সমুদ্রে ডুবে থাকা তার নিজের অগোচর মন, যে এইমাত্র বিদ্যুত চমকের মত নিজেকে ক্ষণিক প্রকাশ করে, সেই অতলে ডুব দিল, সে কি ওরবে? সূর্যের আলো-মাখা সূর্য মুখীর মত সে কি বিকসিত হবে? সেকি ক্ষুব্ধ শূন্যতায় মাথা কুটে কুটে মরবে না? তার জীবন তরণী এই তোবা পাহাড়ে ধাক্কা লেগে কত বিক্ষত হবে না বারবার?

মানুষ যেন রঙ্গন রশ্মিতে অপ্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষের প্রকৃত রূপ দেখে, কল্যাণও আসন্ন চিরবিচ্ছেদের তোমাছিতে নিজের অজানিত হৃদয়ের আসল রূপ প্রত্যক্ষ করে বেদনায় বিবর্ণ হয়ে গেল। বুঝতে পারলো ঊর্মি বিহনে কল্যাণ অসম্পূর্ণ অন্ধকার।

হঠাৎ সে একটু যেন ব্যাকুল হয়ে এগিয়ে ঊর্মির হাত দুখানি নিজের দু হাতে তুলে নিল। উত্তেল কণ্ঠস্বর কেঁপে কেঁপে উঠলো। কিন্তু আশ্চর্য দৃঢ়স্বর কল্যাণের—ঊর্মি আজ বুঝতে পারছি তুমি ছাড়া আমার আকাশ অন্ধকার। জানি না, তুমি কেমন কি ভাবে হঠাৎ সুদূর হয়ে গিয়েছিলে। জানি না তোমার মনের কোনে আমার কোন ছায়া আছে কি না, কিন্তু আমি আজ স্থির বুঝেছি, আমার হৃদয়, আমার জীবনে তোমার অবদান। তাই উচ্চ কণ্ঠে স্পষ্ট স্বরে জানাচ্ছি আমার প্রার্থনা। তুমিও বল তোমার সত্য মনোভাব। ঊর্মি বিহ্বল হয়ে নত চোখে দাঁড়িয়ে ছিল। তার চোখের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকালো কল্যাণ। তেজী তেজী স্বরে বললে—বল ঊর্মি, হ্যাঁ না বল। তোমাকে দুঃখ দিয়ে আমি কিছু চাইব না। ঊর্মির অবরুদ্ধ হৃদয় বেদনা, অপ্রকাশিত প্রেম, লবনাক্ত সমুদ্রের আকারে দুটী চোখ দিয়ে ঝরে পরতে লাগলো। সে শুধু থেমে থেমে বলতে পারলো—তুমি তো আমায় এত জোর করে কখনো ডাকনি। কল্যাণ তাকে একটু আকর্ষণ করে

বললে—ঊর্মি এতদিন বিশ্বাস ছিল নিজের অটুট ভালবাসার ওপর। বিশ্বাস ছিল এই ব্যাকুলতার ডাকে একদিন তুমি সাড়া দেবেই। কিন্তু আজ ভাবছি, বুঝি বা তোমার অভিমানটাই বড় হয়ে উঠছে। প্রেমের চেয়ে অবস্থাভেদই জিতে যাচ্ছে। আচ্ছা বলতো অর্থশালী হওয়াটা কি অপরাধ? আমি বিনিদ্র কত রাত তোমাকে ভেবে কাটিয়েছি। বুঝেছি আমার অর্থ থাকাটাই তোমাকে পাওয়ার অন্তরায়। অর্থ তুচ্ছ, ঐশ্বর্য্য আমি অনায়াসে অবহেলায় ত্যাগ করতে পারি। ঊর্মি-বিরহ আমার ভয় নেই, ভয় শুধু বিচ্ছেদকে। আজ বিচ্ছেদের মুহূর্তে তোমার মাধ্যমে নিজেকে পেলাম। এই পাওয়া আমার কাছে চরম পাওয়া। পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য্য এর কাছে তুচ্ছ।

এর পরে ঊর্মি আনন্দ আর বেদনায় আপ্লুত হয়ে বললে আমি তোমার যোগ্য নই।

কল্যাণ হাসলো, সুখের হাসি, আনন্দের হাসি, কি এক আশ্চর্য্য আলোকে চোখ দুটি তার জ্যোতিষ্মান হয়ে উঠেছে। বললে—এর জবাব রবীন্দ্র নাথের ভাষায় দিতে পারি তোমাকে।

"তুমি যে তুমিই শুধো এই
শুধু ক্ষণ
আমি মোর প্রেম দিয়ে তুমি
চিরদিন।"

বড় বৌদি বলতে আসছিলেন ঊর্মির আর দেরী করা উচিত নয়। রাত ক্রমশঃ গভীরতর হয়ে আসছে। ঘরের পর্দাটা হাওয়ায় মৃদু মৃদু কাঁপছে। সন্ধ্যায় আনা একরাশ গোলাপ আর রজনী গন্ধার গন্ধে কল্যাণের চুলের ব্রিলিয়ান্টিনের গন্ধ মিশে অকস্মাৎ যেন বৌদির দেহ মন স্নিগ্ধ করে দিল। পর্দার মৃদু দোলনের অবকাশে চকিতের জন্য দেখতে পেলেন—কল্যাণের প্রশস্ত বুকে ঊর্মির অশ্রু উদ্বেল মুখখানী চির দিনের আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে।

রূপকল্প

শ্রীপ্রশান্ত মিত্র

এখন তোমার জন্যে ক'রছে যে খুব মন কেমন,
বুকের ভেতরটা কাঁদছে অপরূপ আনন্দের মত,
এর বড়ো পৃথিবীটা ভরে আছে সেই একটি জন—
অনেক আলোর ধারা এই চোখ করে অবগাহন।
—এই চোখে সর্ব্বক্ষণ তোমাকেই দেখছি কেবল
সুদর্শনা তোমাকেই অদর্শনে করছি দর্শন
তোমার মধুর মন এই মনে এনেছে ক্রন্দন
আমাকে আশ্চর্য্য বলবে?—চেয়েছি যে তারুণ্য উজ্জ্বল।
আমি তো তোমার জন্যে অন্তরের সব ভাষা আঁকা,
প্রাণ ভরে চেয়ে দেখি আকাশের সমস্তটা নীল—
এ' অসীমে দু'জনের এই সীমা মিলালো যে মিল।
বিচ্ছেদের অভিত্বকা আনলো কি আগুনের লাভা?
তুমি জানি বহু দূর—তবু তুমি হ'লে সান্ত্বিধারি
সমস্ত দুঃখের ঝড়ে বরাভয় আনন্দ প্রতিমা।
কিছুই চাইনা আমি; আনন্দের ধারী
আমাকে ফিরিয়ে দিক; সুষমা এমনের জিনীয়া।
ভিত্তিতে তাকন ধরলো ভালবাসা সে ঠুনকো অনেক
তাড়াতাড়ি সময় যায়, স্মৃতি শুধু মৌমাছির মত
গুণ গুণ গান করে,—সেই গান অপরূপধারী
সে তোমারি রূপকল্প তোমারি সে ছায়ারূপে রত!

দক্ষিণের মেয়ে

শ্রীমতী প্রীতি চক্রবর্তী

সারা ভারতের মধ্যে একালে দক্ষিণের মহিলারা জীবনের সকলক্ষেত্রেই সুপরিচিত। সমাজ উন্নয়নের কাজ থেকে সুরু করে রাজনীতিতে পর্যন্ত তাঁদের অপ্রতিহত অভিযান।

এর কারণ কি?

কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে জানতে হয়, এই দক্ষিণাঞ্চলে মেয়েদের জীবন কেমনভাবে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলে বিরাট কর্মভার গ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করতে। জানতে হয় কত বিচিত্র দিকে এদেশের মেয়েরা দুঃসাহসী পদক্ষেপ প্রয়াসী। আর কত কর্মঠ, কত ধৈর্যশীলাই না দক্ষিণীদেশের মেয়েরা।

অল্পকালে পৃথিবীর কোনো দেশের মেয়ের সংগে অন্য দেশের মেয়ের তেমন কোনো পার্থক্য থাকে না। সত্যি বলতে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মেয়েরা জন্ম সময় প্রায় একই অবস্থায় থাকে, তারপর বাল্যে কৈশোরে, যৌবনে পরিবেশ ও শিক্ষার গুণে এবং ব্যক্তিগত চেষ্টা তথা জাতীয় চরিত্রের উত্তরাধিকারে ক্রমে ক্রমে নানা প্রকারের পার্থক্য প্রকট হতে থাকে। দক্ষিণীদেশে একালে-ও মাতৃতান্ত্রিক সমাজের কিছু কিছু প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রভাব অন্ধ্র অপেক্ষা তামিলনাদের, তামিলনাদ অপেক্ষা মালাবারে বেশি, তাই অন্ধ্রের চেয়ে তামিলনাদের মেয়ে যেমন বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে, তেমনি তামিল মেয়েদের চেয়ে মালাবারী মেয়েরা অনেক বেশি স্বতন্ত্রতার অধিকারিনী। তার চেয়ে বড় কথা, স্বাধীনতার সার্থক প্রয়োগ এরা জানে এবং প্রায়শঃপক্ষে তার অসদ্ব্যবহার করে না। বরং চূড়ান্ত সদ্ব্যবহার করতে প্রথম থেকেই চেষ্টা করে থাকে।

শারীরিক গঠনে অন্ধ্রের মেয়েরা তামিল মেয়েদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। তামিল মেয়েদের স্বাস্থ্য আর দশজনা সাধারণ বাঙালী মেয়েরই মতন। মালাবারী মেয়েরা স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে অনেক কর্মক্ষম। কিন্তু স্বাস্থ্য ও গাত্রবর্ণে মেয়েদের কোনো অংশে খারাপ নয়। তথাপি জীবনের নানাক্ষেত্রে দক্ষিণের মেয়েদের সংগে এঁটে উঠতে ভারতের আর কোনো প্রান্তের মেয়েদেরই দেখা যায় না। চেহারার বেলাতেও সৌন্দর্য্য ও গায়ের রঙে দক্ষিণের অগ্রী হবার সম্ভাবনা অনেক কম।

কিন্তু কর্মক্ষেত্রে আবার তাঁদের পেছনে ফেলা ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মেয়েদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন।

কর্মক্ষমতা একদিনে জন্মে না। কর্মে অক্ষমতাও একদিনের পরিণাম নয়। সুতরাং দক্ষিণের মেয়েদের কর্মক্ষমতা একদিনে যে পুষ্টিলাভ করেনি, সে একরকম সুনিশ্চিত। আস্তে আস্তে একটু একটু করে এই ক্ষমতার পুষ্টি ও বৃদ্ধি হয়েছে। আজও হচ্ছে। এমনিতে হচ্ছে তা নয়। হচ্ছে ক্রমাগত নিষ্ঠার সঙ্গে সাধনার ফলে। এই সাধনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, দক্ষিণের মেয়েরা শিশুকালে মা বাপের আদর যত্ন যে কম পায়, তা মোটেই নয়। কিন্তু আদর যত্নের সঙ্গে সঙ্গে মা বাপের সতত লক্ষ্য থাকে মেয়ের শিক্ষার দিকে। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে যেই একটু করে বয়স বাড়তে থাকে, সেই সংসারের ছোটখাট কাজে তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের পালা সুরু হয়। কোনোক্রমেই জীবনকে—"গোলাপ শয়ন" রূপে চিত্রিত করা হয়না। যতদূর সম্ভব কঠোর বাধ্যবাধকতা ও কঠোরতর জীবনে পদক্ষেপ করতেই মেয়েদের বাধ্য করেন পিতা মাতারা। পোষাক-আষাকে, আহারে বিহারে অত্যন্ত সাদাসিধে জীবনে দীক্ষা হয় মেয়েদের। কলেজ জীবনে প্রবেশের আগে কি ছেলে কি মেয়ে কাউকে প্রায় জুতো স্যাণ্ডেল পরতে অভ্যস্ত করা হয় না। এ ঘটনা ঘটে মাদ্রাজের মত আধুনিক নগরে। আর অন্য পাড়াগাঁয়ে তাহলে কি হয়, সে ভাববার বটে। জুতো স্যাণ্ডেল পরা ভালো কি মন্দ, সে আলোচ্য নয়।

আসল কথা হচ্ছে—মেয়েদের কঠিন কঠোর জীবনের সঙ্গে সুপরিচয়, যা ভবিষ্যতে জীবন-সংগ্রামে যথেষ্ট সাহায্যকারী। যে মেয়ে একবার শিক্ষার স্বাদ পায়, সে আর শিক্ষার শেষ না দেখে ছাড়তে রাজী নয়। তাই স্কুল ছাড়লেই কলেজ, কলেজ ছাড়লেই উচ্চতর গবেষণায় মেয়েদের দক্ষিণের সর্ব্বত্র লিপ্ত হতে দেখা যায়। সকলের পক্ষে কলেজের ব্যয় বহন শিক্ষা গ্রহণ সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। কাজেই যারা স্কুল সীমা পেরিয়ে পড়া ছাড়তে বাধ্য হয়। তারা সোজা অফিসে অফিসে কাজে ঢুকে পড়ে। কেউ বা প্রাইমারী শিক্ষকতার ট্রেনিং নিয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব বরণ করে নেয়। কেউ কেউ টাইপ করা শেখে। বাদবাকী রাষ্ট্রভাষা অধ্যয়নে লেগে যায়। সেখান থেকে পাশ করে হিন্দীপ্রচারক হয়ে জীবিকা অর্জ্জনে তৎপর হয়। আর একদল বিজ্ঞানের ছাত্রী ঢুকে পড়ে মেডিকেল কলেজে। ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে পারলে ছাড়ে না। নানা ভাষা শিক্ষাতে ও এদের আগ্রহ অপরিসীম। ইংরেজীতে বলতে কইতে এদের জুড়ি নেই। যারা কিছু পায় না, তারা মনে মনে নাসিংয়ের ব্রত গ্রহণ করে থাকে। এরাই আজকাল সারা ভারতের নার্সিংয়ের বাজারটা দখল করে আছে বলে অত্যুক্তি হয় না। এই ভাবে সকল রকম কাজকর্ম বিদ্যাতে পারদর্শিনী হয়ে দক্ষিণের মেয়েদের জীবিকা অর্জ্জনের ক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য প্রান্তের মেয়েদের থেকে এগিয়ে যেতে হামেশাই দেখা যায়।

মোট কথা, দক্ষিণের মেয়েরা কেউ-ই প্রায় বসে থাকতে চায় না। সব সময় যে পেটের দায়ে মেয়েরা কাজ করতে বেরিয়ে পড়ে তা নয়। এমন ও দেখা যায়, স্বচ্ছল অবস্থার মেয়েরা বি, এ, এম, এ পাশ করে চাকুরীর প্রয়োজন নেই, তবু ও টাইপ শিখছে। সেলাইয়ের শিক্ষা নিচ্ছে। যে অবস্থায় ভারতের অন্যত্র বিশেষ করে বাঙলাদেশের মেয়েরা নড়ে বসতে কি না সন্দেহ, সেই অবস্থায় দক্ষিণের মেয়েরা কোনো একটা কাজ না করে থাকতেই পারে না। এ সবের উপরে এঁদের সমাজের অন্যান্যক্ষেত্রে কাজের আহ্বানে সাড়া দিতে তৎপর দেখা যায়। স্কুলের শিক্ষা পর্য্যায়েই এদের হাতে খড়ি হয় সমাজ কল্যাণ ব্রতে। প্রসঙ্গত দক্ষিণের শিক্ষা ব্যবস্থা যেমন সুশৃঙ্খল, তেমন সারা ভারতে আর কোথাও দেখা যায় না। এই সুশৃঙ্খল শিক্ষা ব্যবস্থা মেয়েদের আত্মসচেতন কোনো কাজেই হতে দিতে শিক্ষা না দিয়ে গঠনের কাজে দীক্ষা দান করে। তারই কল্যাণে মেয়েরা যখন শিল্পী বা মহিলা হয়, তখন কেবল ঘরের কাজেই নয়, সমাজের কল্যাণকর কাজেও তাদের কল্যাণী হাতের ছাপ পড়ে। দক্ষিণী দেশে ছাত্রাবস্থায় মেয়েরা কখনও ব্যাপকভাবে ও সুদূরের কথা সামগ্রিক ভাবেও রাজনৈতিক ঐ হট্টগোলে মাথা ঘামায় না। রাজনৈতিক ছাত্র দুর্ঘটনাই বিরল তায় ছাত্রীদের দুর্ঘটনা! সে কল্পনাতীত ব্যাপার। তাই বলে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে মেয়েরা অচেতন নয়। শিক্ষাকালীন সক্রিয় রাজনীতি বর্জ্জন এবং শিক্ষা সমাপ্তিতে সাধ্যমত রাজনীতিতে যোগদান, এই দক্ষিণী মেয়েদের নীতি। আর শিক্ষা গ্রহণের কালে ব্যাপকতর অর্থে যে কোনো গঠনমূলক কাজে, দলে দলে যোগ দিয়ে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা অর্জ্জনে মেয়েদের দক্ষিণে যেমন আগ্রহ তেমনি আগ্রহ এদের নৃত্য ও সংগীত শিক্ষায় পারদর্শীতা অর্জ্জনে। ঘরে ঘরে এখানে মেয়েরা কিছুটা গান, বাজনা ও নাচ শিক্ষা না করে ছাড়ে না। ভবিষ্যৎ জীবনে এই বিদ্যাগুলি অতিরিক্ত বিদ্যারই মত। সময় সময় কিছুটা বেশিও জীবন সংগ্রামে সাহায্য করে।

দক্ষিণের মেয়েদের জীবন এইভাবে অগ্রসর হতে হতে একদিন পূর্ণ যৌবনে উত্তীর্ণ হয়। বিবাহ-উত্তর জীবনে মহিলা স্বামীর রোজগারের সংগে নিজের উপার্জ্জন যোগকরে সংসারে স্বাচ্ছল্য আনবার চেষ্টা করেন। এ চেষ্টা আবার সন্তান সন্ততিতে অবহেলা করে নয়; লালন পালন করেই করতে হয় মহিলাদের। সে সম্ভব হয়। সুশৃঙ্খল সংসার যাত্রা নির্ব্বাহরীতির ঐতিহ্যকে এরা কখনও অমান্য করেন না বলেই। তাছাড়া সুপরিকল্পিত পন্থায় এরা সংসার চালাতে এমনই অভ্যস্ত যে একটি পয়সাও এদের অপব্যয় করতে দেখা যায় না। তাই অতি অল্পে সংসার চালিয়ে কিছু কিছু সঞ্চয়ে দক্ষিণের মহিলারা নিজেদের সুখী জীবন তথা সন্ততির ভবিষ্যৎ সুন্দর করতে সর্ব্বদা তৎপর।

চিরদিন কাহারও সমান না যায়

শ্রীদেবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হয়ে গিয়াছে, চারিদিকে স্কুল কলেজ খুলে গিয়াছে অধ্যাপক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী কলেজে রওনা হলেন। ঠিক দশটার সময় গোবরডাঙ্গা ষ্টেশনে গাড়ী থামলো, গাড়ী হতে অধ্যাপক নামতেই ছেলেরা তাঁহাকে ঘিরে দাঁড়ালো, চারিদিক থেকে সবাই বলতে লাগল কেমন আছেন স্যার! তিনি হাসিমুখে উত্তর করলেন ভালই আছি। অধ্যাপক শ্যামসুন্দর বাবুর ছাত্র সমাজে খুব সুনাম আছে। তিনি ছাত্রদের প্রাণাধিক ভাল বাসতেন, ছেলেরা তাঁহাকে একদিন না দেখলে তাদের প্রাণ যেন ছটফট করে উঠত। অধ্যাপক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী পিতার একমাত্র ছেলে, পিতা অঘোর নাথ চক্রবর্তী কলিকাতা হাইকোর্টের একজন বড় উকিল ছিলেন। যাহাই হোক অঘোর বাবু মৃত্যুর পূর্বে পুত্রের জন্য ব্যাঙ্কে কিছু টাকা রেখে গিয়েছিলেন। অধ্যাপক দয়াময় রোডের উপর সেই টাকা দিয়ে দ্বিতল অট্টালিকা স্থাপন করলেন, চারিদিকে ক্ষুদ্র প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত, বাড়ীর একাংশে ক্ষুদ্র ফুলের বাগান অবস্থিত। বাড়ীর আকার কতকটা ইংরাজী ই-এর মত, দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন বাড়ীর মালিক খুব সৌখিন। তাঁহার দুই পুত্র—তিলক, দীপক, একমাত্র কন্যা দীপালী ও স্ত্রী মাধবী এই কয়জন নিয়ে অধ্যাপকের সোনার সংসার গঠিত। তিলকের যখন যখন পাঁচ বৎসর সেই সময় থেকে অধ্যাপক পুত্রের লেখাপড়ার প্রতি বিশেষ নজর রাখতেন, এমন কি গৃহ শিক্ষক না রেখে তিনি নিজেই ছেলেকে পড়াতেন। ফলে তিলক কুমার এম-এ ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট হলো। পিতার মনে আর আনন্দ ধরে না, একদিন তিলক কুমারকে ডেকে অধ্যাপক বল্লেন "তিলক এত দিনে আমার আশা পূর্ণ হলো।"

তিলক কিছু দিনের মধ্যে সওদাগরী অফিসে একটা বড় চাকুরী পেয়ে গেল বেতন প্রায় ৬০০ টাকার মত। দীপক বর্তমানে আই-এ পড়ছে, সে মনের আনন্দে বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়, তার সম্বন্ধে অধ্যাপক বিশেষ নজর রাখেন না। দীপালী সারাদিন গান বাজনা নিয়ে থাকে, দুই জন বড় বড় গায়ক দীপালীকে গান শেখায়। সে এখন ভজন, খেয়াল, ঠুংরী ও আধুনিক প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষ পারদর্শীনী হয়ে উঠেছে। বিভিন্ন উৎসবে সে গান গেয়ে তার ঘরের মধ্যে পুরস্কারগুলো প্রদীপ মালার মত সাজিয়ে রেখেছে। দীপালীকে নিখুঁত সুন্দরী বলা চলে। বর্তমানে অধ্যাপকের সোনার সংসার, বাড়ীতে চাকর চাকরাণীর কলরব, তাছাড়া রবিবারে অধ্যাপকের বন্ধু-বান্ধবেরা বেড়াতে আসতেন, তাঁহারা দাবা, পাশা ইত্যাদি খেলায় মত্ত থাকতেন, আবার তিলক কুমার নিজের গাড়ী করে বেড়াতে যেত। এইভাবে আনন্দে দুবৎসর অতীত হলো। তারপর অধ্যাপক তিলক কুমারের বিবাহের জন্য মেয়ে মনস্থ করলেন। এই মেয়েটির নাম কমলা অপূর্ব সুন্দরী, তাহা ছাড়া সে এবার বি-এ পাশ করেছে। কত জায়গা থেকে বড় বড় লোকের মেয়েদের সম্বন্ধ এসেছে কিন্তু অধ্যাপক সব বাদ দিয়ে দরিদ্রা কমলার সহিত বিবাহ ঠিক করলেন। ১৩ই ফাল্গুন সোমবার বিকাল ৪টায় তিলক কুমার অতি ধুমধামের সহিত বিবাহ করতে গেল। যখন তিলক কুমার বউ নিয়ে বাড়ীর সামনে এল, অধ্যাপক ও স্ত্রী মাধবী ছেলে ও বধূকে সোনার মুকুট পরিয়ে—বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেলেন। এইভাবে মহা ধুমধামের সহিত বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল। কমলা স্বামীর ঘরে এসে শ্বশুর ও শাশুড়ীকে বিশেষ ভাবে আদর যত্ন করতে লাগল। প্রত্যহ কমলা নিজ হাতে পাক করে পিতা ও স্বামীকে খাইয়ে অন্যান্য কাজ করত, আবার পিতা কলেজ থেকে এলে সর্বাগ্রে তাঁহার পরিচর্যায় মন দিত। দীর্ঘ ৫ বৎসর ধরে অধ্যাপকের সোনার সংসার সুখে শান্তিতে অতীত হলো।

এদিকে তিলক কুমার কুসংসর্গে পড়ে আজকাল বেশ খেলে। প্রতিমাসে সে মাধবীর কাছে ৪০০৲ টাকা নিত। বর্ত্তমানে সে এখন ২০০৲ টাকার বেশী দেয় না। মাধবী জিজ্ঞাসা করলে, সে স্পষ্ট বলে ২০০৲ টাকার বেশী দিতে পারবে না। কিছু দিন পরে তিলক কুমার আর টাকা পয়সা দেয় না। ফলে সংসারে অভাব অনটনের ছায়া পড়ে গেল। অধ্যাপক জানতে পেরেও কিছুই বলেন না। একদিন তিলক কুমার মদ খেয়ে টল্‌তে টলতে বাড়ীতে ঢুকতেই অধ্যাপকের চোখে পড়ে গেল, তাহা দেখে বাসাহত পাখী যেমন ছটফট করে ঠিক তেমনি তিনি বিছানায় পড়ে ছটফট করতে লাগলেন। একদিন গাড়ীর ড্রাইভার অধ্যাপককে জানালেন যে বাবু গাড়ী বিক্রয় করে কোথায় চলে গেলেন।

কিন্তু আমাকে এ মাসের বেতন দিলেন না! অধ্যাপক তাঁর কোমর হতে প্রাপ্য টাকা দিয়ে তাকে বিদায় করল। মাধবী টাকার অভাবে চাকর চাকরাণীদের ছাড়িয়ে দিল। কমলা নির্জ্জনে বসে কাঁদে, এদিকে তিলক কুমার চাকুরী ছেড়ে দিয়েছে। সে কোন দিন রাত্রে ১২ টার আগে আবার কোন দিন আসে না। তিলক কুমার কমলার গহনাগুলি পূর্ব্বেই চুরি করে নিয়ে গেছে, এখন সেগুলো বিক্রয় করে রেসের মাঠে গিয়াছে, হায়! সেদিনও তার ভাগ্য খুল্‌লো না! অধ্যাপক তিলক কুমারকে আর বাড়ী ঢুকতে দেয় না, সে তাহার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের কাছে গেল সাহায্যের জন্য কিন্তু সবাই তাহাকে তাড়িয়ে দিল। এখন তাহার রেস খেলার মত টাকা নেই। চারিদিকে সে দেনায় ডুবে আছে; রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ায়। এই ঘটনার কিছু দিন পরে দীপক বসন্তরোগে আক্রান্ত হলো, কোন বন্ধু হাসপাতালে কোন বেড় পাওয়া গেল না; অবশেষে তাহাকে বাড়ীতে রাখা হলো। অধ্যাপক আর কলেজে যায় না, ছাত্রেরা এসে জিজ্ঞাসা করলে তিনি রুক্ষভাবে উত্তর করেন—"তোমরা বেরিয়ে যাও" বর্ত্তমানে অধ্যাপকের মস্তিষ্ক যেন বিকল হয়েছে। যে ছাত্রদের তিনি প্রাণাধিক ভালবাসতেন আজ তাদের প্রতি এরূপ ব্যবহার? অধ্যাপক মনে মনে বলতেন এ দৃশ্য যেন আমি আর দেখতে পাচ্ছিনা। একজন বড় ডাক্তার দীপককে দেখতে আসে, তাঁহার ফি ৬৪৲ টাকা তাহাছাড়া ভালরকম পথ্যাদি দরকার। মাধবীও দীপালীর যাহা সোনা দানা ছিল সবই নষ্ট হয়ে গিয়েছে; কমলার তো কিছুই নেই।

প্রত্যহ রাত্রে কমলা রোগীর শিয়রে বসে সেবা করে, তার চোখ দুটি কোঠরাগতা, চুলগুলো বাতাসে দুলছে, মুখের দুপাশের হাড়গুলো যেন বেরিয়ে পড়ছে, আজ তাহাকে যেন ৪০ বৎসরের বুড়ী বলে মনে হইতেছে, টাকার অভাবে ডাক্তারের আসা বন্ধ হয়ে গেল, মাধবী সারা দিন ঠাকুরের কাছে বসে থাকে। পূর্ব্বে অধ্যাপক বাংলা ভাষায় ভাল ভাল বই লিখেছেন, এক কথায় সাহিত্য জগতে তাঁহার বিশেষ সুনাম আছে। বর্ত্তমানে তিনি অন্ধ হয়ে গেছেন, একদিন অধ্যাপক সকালবেলায় দীপালীকে একটা খাতা ও কলম নিয়ে আসতে বল্লেন এবং কঠিন স্বরে বলছেন "আমি লিখব যে বিদ্যার কোন মূল্য নেই; লোকে যেন লেখাপড়া না শেখে" দীপালী খাতা ও কলম দিতেই সর্ব্বাগ্রে তিনি তাহা গ্রহণ করে বল্লেন "আমার চশমা নিয়ে এস"—দীপালী ভয়ে কোন কথা বলতে পারছে না; কারণ পূর্ব্ব থেকে সে পিতাকে রীতিমত ভয় করে চলত, যাহাই হোক অধ্যাপক চোখে চশমা লাগিয়ে কিছুই দেখতে পেল না, তারপর বল্লেন "উঃ আমি যে অন্ধ মা", তারপর আস্তে আস্তে তাঁহার হাত থেকে খাতা ও কলম মাটিতে পড়ে গেল। বৈশাখ মাস। প্রায়ই কাল বৈশাখীর ঝড় ওঠে, রাত্রি তখন ১টা, বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়ে দিয়ে ছোট একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে কমলা দীপকের শিয়রে বসে আছে, এমন সময় বাহিরে ভীষণ ঝড় উঠল ও সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি পড়ছিল, ক্ষণে ক্ষণে ভীষণ মেঘের গর্জ্জন, সাধ্বী তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে চারিদিকে জানালা দরজা বন্ধ আছে কি না পরীক্ষা করে দীপকের শিয়রে বসে রহিলেন, কিছু সময় পর দীপক পর পর তিন বার কাশলো, সঙ্গে সঙ্গেই অনেকটা রক্ত পড়লো! তারপর আস্তে আস্তে তাহার চোখ দুটি বুজে এল, এ দিকে ঝড়ের ঝাপটায় জানালা খুলে প্রদীপ নিভে গেল, তারপর সাধ্বী তাড়াতাড়ি বৈদ্যুতিক আলো জ্বালিয়ে দেখলেন যে দীপক চিরনিদ্রায় মগ্ন। ঘরের মধ্যে যেন কান্নার রোল

পড়ে গেল। ওদিকে অধ্যাপক হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সেখানে যোগদান করলেন, ঝড় তখন থেমে গেছে, শুধু প্রবলবেগে বৃষ্টি হচ্ছে, কেহ কোথাও ইহার ছাড়া পেল না।

অবশেষে দেখা গেল চারিটি প্রাণী সেই মৃত দেহটার চারি পাশে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছে, এদিকে বাহিরে একদল চোর চুরি করতে বেরিয়েছে। একটা চোর আস্তে আস্তে প্রাচীর পেরিয়ে উপরে উঠে এসে দেখল যে একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্য। এ দৃশ্য দেখে তার চোখ দিয়ে ঝর ঝর করে জল পড়তে লাগল। তখন তার চুরি করার প্রবৃত্তি এল না, তারপর আস্তে আস্তে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। ও দিকে দীপকের সম্বন্ধে ভীষণ একটা খারাপ স্বপ্ন দেখে তিলক কুমারের প্রাণ কেঁদে উঠল, সে সকাল বেলায় বাড়ীর দিকে রওনা হলো, পায়ে ছেঁড়া জুতা, জামা কাপড় ময়লা, চুলগুলো ঝুলে পড়েছে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে সে কত গাড়ীর সামনে পড়েও বেঁচে যাচ্ছে। তারপর বাড়ীতে গিয়ে দেখল চারিদিকে যেন একটা থম্ থমে ভাব; কাহারও মুখে কোন কথা নেই। মৃত দীপককে জড়িয়ে ধরে বলল "ভাই আমায় ক্ষমা কর, আমার জন্য তোমার এই অকাল মৃত্যু, বিনা চিকিৎসায় তোমার মৃত্যু হলো, সবই আমার দোষ"!

———

কবি নজরুল ইসলাম

শ্রীমতী মঞ্জুলা দেবী

বাংলা সাহিত্যে কবি নজরুল একটা বিরাট বিস্ময়, যখন বাংলা-সাহিত্য গগন রবীন্দ্র কিরণ সম্পাতে প্রদীপ্ত, বিশ্বের দরবারে বাংলা-সাহিত্য একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছে, তখন কবি নজরুল একটা জলন্ত উল্কার মত আসিয়া সকলকে বিস্মিত, স্তম্ভিত, আশান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। কবি নজরুল যে সময় আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই যুগকে যুদ্ধোত্তর যুগ বলা হয়। যুদ্ধোত্তর যুগ একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের স্থায়িত্বকাল ১৯১৪-১৯১৮ হইলেও কবি নজরুলের প্রকাশ কাল ইহার পরবর্তী। সে সময় রবীন্দ্র পরিমণ্ডলে যাঁহারা অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারাও কাব্য সাহিত্যে সুপরিচিত; বিশেষতঃ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবি প্রতিভার অবসানে কবি নজরুল নিজেও মুখর ছিলেন। এই হেন সময় কবি নজরুল একটা বীরত্বব্যঞ্জক প্রকাশ ভঙ্গি, সাম্যের সুর ও মানব-প্রীতির প্রশস্ত হৃদয় লইয়া বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হইলেন। তরুণ বাংলা এই যৌবন দৃপ্ত কবিকে অভিনন্দিত করিলেন, কবি সম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উদ্দেশ্যে আশীর্বচন বর্ষণ করিলেন।

—কবির বিদ্রোহী কবিতা ঠিক সময়োপযোগীই প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময় বাংলার আকাশে, বাতাসে, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্মক্ষেত্রে যে বিদ্রোহের একটা গুরুগম্ভীর ধ্বনি হইতেছিল, বিদ্রোহী কবিতা যেন তাহারই মূর্ত প্রকাশ। চিন্তা, ভাব ও রূপের এইরূপ সম্মিলন খুব কমক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। তরুণ বাংলা যেন বিদ্রোহের মধ্যেই পাইয়াছে তাহার জীবন সাধনার মন্ত্র, আর কবির আহ্বানের বাণীতেও তরুণ দলের বুক ভরিয়া উঠিয়াছিল—

"যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল
আকাশ বাতাসে ধ্বনিবে না।
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপান ভীম রণভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেই দিন হব শান্ত।"

তরুণদল তাঁহাকে শুধু কবির আসনে বসাইয়া নিশ্চিন্ত হইল না—তাঁহারা কবিকে নেতৃত্বের গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাই কবি ছাত্রদল ও তরুণ দলকে সামরিক ছন্দে সংগত করিবার জন্য তরুণের মুখে শুনিয়া তুলিলেন—

"আমরা শক্তি আইরা বল
আমরা ছাত্রদল
যোগের পায়ের তলায় মুর্ছে তুফান
উর্দ্ধে বিরাব ঝড়-বাদল
আমরা ছাত্রদল।"

—কবি এই তরুণ যাত্রীদিগকে আহ্বান করিতেছেন—অগ্রসর হওয়ার জন্য, জীবন আহরণে প্রস্তুত হওয়ার জন্য :—

চল্ চল্ চল্!
ঊর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী তল
অরুণ প্রাতের তরুণদল
চল্‌রে চল্‌রে চল
চল চল চল।

বাংলা সাহিত্যে সাময়িক সঙ্গীতের আমদানী কবি নজরুলের একটা বিশিষ্ট দান। এই সাহিত্যে দেশাত্মবোধের গান ও কাব্যের অভাব ছিলনা বটে, বঙ্গলাল হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত ছোট বড় অনেক কবিই দেশ জননীর বন্দনা গাহিয়াছেন, দেশবাসীকে জাগ্রত করিবার জন্য কাব্য, কবিতা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু কবি নজরুলের কবিতায় ও সঙ্গীতে যে সাময়িক ছন্দ ও উদ্দীপ্ত ভাব আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে তাহা বাংলা কাব্যে অভিনব ও বিচিত্র।

নির্য্যাতিত মানবাত্মার প্রতি সমবেদনা এই যুগের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ। কবি নজরুল তাঁহার কাব্যে নির্য্যাতিত, উপেক্ষিত মানবাত্মার বন্দনা গানে মুখর। কুলী, মজুর হইতে আরম্ভ করিয়া সমাজ রাষ্ট্রের আনাচে কানাচে যাহারা নির্য্যাতিত, উৎপীড়িত উপেক্ষিত—তাঁহাদের জন্য এমন দরদ আর কে দেখাইয়াছেন? সর্ব্ব-হারার ব্যথায় "সাঁতার পানিদের চোরাবালির চরের" আর কে সংবাদ পাইয়াছেন। সাম্যের গান এমন স্পষ্ট ও দরদের সহিত কয়জন গাহিয়াছে? অন্ধ বিশ্বাস ও উদ্দেশ্যহীন আচার ব্যবহারের আবরণ উন্মোচন করিতে কে অগ্রসর হইয়াছেন? ভগবানের উপলব্ধি এমন করিয়া কতজন করিয়াছেন—

"কেন খুঁজে ফের দেবতা তাঁহার যুক্ত পুঁথি কোরাণে
হাসিছেন তিনি অন্তর হিয়ার নিভৃত অন্তরালে,
এই হৃদয়ই সে নীলাচল, কাশী, মথুরা, বৃন্দাবন
বুদ্ধ-গয়া এ, জেরুজালেম এ, মদিনা করা ভবন
এই খানে বসি গাহিলেন তিনি কোরাণের সাম গান।
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় কোন মন্দির কাবা নাই।"

কবি ভগবানের প্রকাশ দেখিয়াছেন প্রত্যেক জীবের মধ্যে—"অয়ং জীব স্তুয় শিব" এই শাস্ত্রবাক্য নূতন ব্যঞ্জনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে তাহার কাব্যে—

"সকলের মাঝে প্রকাশ তাঁহার
সকলের মাঝে তিনি
আমারে দেখিয়া আমার অদেখা
ভক্ত দাতারে চিনি।"

কবির বাণী স্মরণ করাইয়া দেয় বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের বাণীকে। প্রত্যেক জীবদেহে ঈশ্বরানুভূতি উপলব্ধি করার প্রয়োজন হইয়াছিল যুগের তাগিদে। কবি সেই যুগ-ভাবকে নূতনভাবে রূপায়িত করিয়াছেন। এই সৃষ্টি ভঙ্গিতে কবি সমাজ দেহে এক নূতন জীবন স্পন্দন পাইয়াছেন—এই জন্য সমাজে ও রাষ্ট্রে যাহারা ছিলেন নির্য্যাতিত তাঁহারা কবির নিকট প্রাণের বস্তু,—হৃদয়ের প্রানলোকে উজ্জ্বল। এই জন্য তাঁহার 'কবিয়াদের' প্রথম কথাই ছিল এই—

"এই ধরণীর ধূলিমাখা তব অসহায় সন্তান
মাগে প্রতীকার, উত্তর দাও আদিপিতা ভগবান্।"

সেই ধূলিমাখা সন্তানদের ভিতরে ও জাগিয়া উঠিয়াছে জাগরণী মন্ত্র, তাই কবি অসুরে রুদ্র গানের বেণু টানিয়াই বলিতেছেন—

"চির অবনত ভূলিয়াছে আজ গগনে উচ্চ শির
বান্ধা আজিকে বন্ধন ছেঁড়ি, ভেঙেছে কারা প্রাচীর"

—কবির এই সাম্যগীতি রুশীয় সাম্যবাদের প্রতিধ্বনি নহে। অবশ্য রুশীয় সাম্যবাদ কবিকে কতকটা অনুপ্রাণিত করিয়া থাকিবে। কিন্তু ইহার মূল উৎস ইসলামীয় সাম্যবাদ ও ভারতীয় সাধনার ব্রহ্মবাদের সংমিশ্রন। তাই কবির সাম্যগীতির ধ্বনি এই দেশের মধ্যেই প্রতিহত হয় নাই। বিশ্বের লাঞ্ছিত, উপেক্ষিত মানব সমাজের প্রতিও তিনি কর্ত্তব্যচ্যুত হন নাই—তাহার সেই জাগরণের গান—আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ধ্বনিত হইয়াছে—

"জাগো অনশনবন্দী, ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্য-হত।"

রাজভয়, লোকভয় সকল প্রকার ভয় হইতে মুক্তির বাণী শুনাইয়াছেন কবি নজরুল। তাঁহার এই সাম্য-গীতির ছন্দেও ধ্বনিয়া উঠিয়াছে নারীর অধিকারের জন্য বুকভরা দরদ। তিনি যুগ যুগ বঞ্চিত নারীর বেদনায় হইয়াছেন ব্যথাতুর তাই তাঁর কবিতায় স্বীকৃতি পাইয়াছে একটি আমোঘ সত্য—

"আমার চক্ষে পুরুষ রমনী কোন ভেদাভেদ নাই।
বিশ্বে যা কিছু মহান্ সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্দ্ধেক তার করিয়াছে নারী অর্দ্ধেক তার নর।"

কবি রবীন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্গদার মুখে একদিন যে বাণী দিয়া ছিলেন তাহা আমরা ভুলিনাই—

দেবী নহি আমি সামান্যা রমনী
পূজা করি রাখিবে মাথায়;—সেও আমি
নহি, অবহেলা করি পুষিয়া রাখিবে
পিছে, সেও আমি নহি, যদি পার্শ্বে রাখ
মোরে সঙ্কটের পথে, দুরূহ চিন্তায়
যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর
কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে
যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,
আমার পাইবে তবে পরিচয়.....

চিত্রাঙ্গদা অর্জ্জুনের নিকট যে কামনা করিয়াছিল তাহা সহধর্ম্মিণীর যোগ্য অধিকার কিন্তু কবি নজরুলের যুগ আরও অধিকদূর অগ্রসর হইয়াছে।

নারী শুধু তাহার পরিবারের নয়, দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের মধ্যেও তাহার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সে ব্যাকুল। কবি সেই ব্যাকুলতাকে লক্ষ্য করিয়াই নারী জাগরণের গান গাহিয়াছেন। তিনি এক দিকে মোহনীয় সকল কালের সকল দেশের সকল মানুষকেই আহ্বান করিয়াছেন। নারী সমাজও সেখানে অপাংক্তেয় নহে। তিনি নারী জাগরণের অভিনেত্রী মিসেস্—এম্ রহমানের প্রতি যে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্যও নারী সমাজ কবির নিকট কৃতজ্ঞ, তিনি লিখিয়াছেন—

"বন্দিনীদের বেদনার মাঝে বাঁচিয়া আছ যা তুমি
চির জীবী মেয়ে, তবু যাই ঐ কবরের ধূলি চুমি।

কবি নজরুলের সঙ্গীত অত্যন্ত জনপ্রিয়। রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদ ও রজনী সেনের পর এইরূপ জনপ্রিয়তা কেহই অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তিনি বাংলা গানে পারস্যের সূফী কবিদের অনেক ছন্দ, সুর ও ভাষার লালিত্য আনিয়াছিলেন। কবির গজল বাংলা সঙ্গীতে একটা নূতনত্ব আনিয়াছে।

কবি ছন্দের মধ্যে বিচিত্রতা আনিয়াছেন। আরবী ও পার্শী কবিতার ছন্দ আমদানী করিয়া বাংলা ভাষায় সৃষ্টি সাধন করিয়াছেন। রবীন্দ্র নাথের পরে ছন্দ যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ ব্যতীত এই বিষয়ে আর কেহ কবির সমকক্ষ আছেন বলিয়া মনে হয় না। কবি কাব্য রচনায় হিন্দু ও মুসলমান শাস্ত্রের অনেক পৌরাণিক কাহিনী উপমা, উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা তাহার শাস্ত্রানুশীলনের ফল। যখন যেই পরিবেশে তিনি কবিতা লিখিয়াছেন তখন সেই পরিবেশের কমনীয়তার মধ্যেই তাহার কাব্য শত দলের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাজেই কি হিন্দু কি মুসলমান শাস্ত্রের পৌরাণিক কাহিনীই তিনি অবলম্বন করুন না কেন তিনি তাহাতে কবি ধর্ম্মেরই পরিচয় দিয়াছেন—

রবীন্দ্র যুগে কবি নজরুলের মত এত বিভিন্ন ক্ষেত্রে আর কাহারও সাহিত্যিক প্রতিভা প্রতিফলিত হয় নাই। তিনি একাধারে কাব্যকার, সঙ্গীত রচয়িতা ও সঙ্গীত শিল্পী উপন্যাসিক, কথা সাহিত্যিকার, নাটকার। তাঁহার নাটক কবিতার সংখ্যা অধিক না হইলেও উচ্চাঙ্গের। রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্র লাল ও রজনী সেনের নাটক কবিতার ধারাকে নজরুল অক্ষুণ্ন রাখিতে পারিয়াছেন ইহা মুক্ত কণ্ঠেই বলা যাইতে পারে।

কবির জীবন তাহার কাব্যেই প্রতিফলিত। কাব্যে যেমন কবি নজরুল একটা বিদ্রোহের বাণী লইয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন ও যেন একটা বিদ্রোহের ফুলিঙ্গ। বর্দ্ধমানের এক গ্রামের ধার্ম্মিক পিতার সন্তান তিনি। শিক্ষায় ছিলনা তাঁহার অনুরাগ কিন্তু শৈশবকাল হইতেই তাঁহার কণ্ঠে সরস্বতী ভর করিয়াছিলেন। তাঁহার কণ্ঠস্বর যেমন ছিল মধুর তেমনি কবিতাও গান রচনায়ও ছিল প্রকৃতি দত্ত শক্তি।

সেই শিশুর বয়সেই তিনি পল্লীর গানের দলে ভিড়িয়া গেলেন। সেখানে তিনি হইলেন সঙ্গীত চর্চয়িতা ও গায়ক। পরে কটির দোকানের কর্মচারী, আবার বিদ্যালয়ে প্রবেশ, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার মন বসেনা বাঁধাধরা নিয়ম কানুনের মধ্যে। তিনি বিদ্যালয়ে থাকিতে থাকিতেই প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বাঙ্গালী পলটনে প্রবেশ করেন। কবি ও গায়ক দুজন হইলেন হাবিলদার যুদ্ধশেষে হাবিলদার রেজমেন্ট ত্যাগ করিয়া লেখনি গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা তাঁহার কাব্য জীবনকে অধীর চঞ্চল করিয়া তুলিল। তিনি বিদ্রোহী কবি সাজিলেন। সাপ্তাহিক পত্র পরিচালনা করিলেন। এদিকে রাজ শক্তির রোষ দৃষ্টি তাহার উপর পড়িল। তিনি কারাগার বরণ করিলেন। তাহার রচিত পুস্তক বাজেয়াপ্ত হইল। দারিদ্রের মধ্যে নিপীড়িত হইয়াও তিনি আদর্শচ্যুত হন নাই, বরং তিনি দীপ্তকণ্ঠে গাহিয়াছেন—

"হে দারিদ্র, তুমি মোরে করেছ মহান"

ইহার পর রামমোহন কম্পানীতে চাকরী গ্রহণ করিলেন। এই চাকরী করিতে করিতেই কবি রোগ-শয্যা গ্রহণ করিলেন। যে কণ্ঠে একদিন বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছিল সেই কণ্ঠ যুগের ব্যবধানেও নীরব নিথর।

দেশবাসী কবির কণ্ঠে আবার গান শুনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল। দীর্ঘদিন পরে দেবাসীর অর্থে তিনি পাশ্চাত্য দেশে চিকিৎসার্থে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য দেশের দুর্ভাগ্য দেশবাসীর কবির ব্যাধি চিকিৎসার অতীত বলিয়া ঘোষিত হইল। কবি পূর্বের ন্যায় রোগ শয্যা নিলেন। কবির কণ্ঠ নীরব হইয়াছে বটে, কিন্তু মহাকাল কবিকে বিস্মৃত হইবে না। ২০ বৎসরের সাহিত্য সেবার মধ্যে তিনি বাংলা সাহিত্যকে যাহা দান করিয়াছেন তাহাতেই অনাগত কালেও কবি সুধর ও মধুর ভাষী বলিয়াই বন্দিত হইবেন। কালের পটে অঙ্কিত থাকিবে তাহার ভাস্বর মূর্তি……।

— —

গান

শ্রীমমতা ঘোষ

ওরে সেই শিশুটি হারিয়ে গেছে
এই দুয়ারি মাঝে,
তারে মিথ্যে আমি খুঁজে বেড়াই,
কিছুতে পাই না যে।
সোণার বরণ তনুখানি
মুখের সোণায় ছিল জানি,
তার খেলাতে ছিল মুখর
আমার আঙিনা যে।
ওগো প্রথম আমার প্রাণের পুরে
মায়ের আসনখানি
কাছে এসে সহজ হেসে
ওই বিছানো আনি।
দিন যে কখন কেটে গেছে,
জেগে দেখি এসেছে যে
সেই শিশুটি শক্তি লভি'
দীপ্ত যুবার সাজে।

শ্রাবণী

শ্রীশৈলেন বিশ্বাস

অনন্তের কোন সঙ্গীত এনেছে শ্রাবণ
তুমি কি জাননা। এস হে শ্রাবণ।
ইন্দ্রনীল ছায়া দিগন্তের তীরে
অব্যক্ত সুরের মিছিল মধ্যাহ্নের নিস্তব্ধ প্রহরে।
মেঘের অদির বন্যায় উচ্ছ্বসিত শ্রাবণের গান
বন-মর্মরে মর্মরিত মল্লার তান,
পাখীর কাকলী শুদ্ধ প্রাবৃট মায়ায়
বক্ষের বার্তা নিয়ে মেঘ দূত দূর হ'তে দূরে চলে যায়।
এক মুঠো যৌবনের লুকানো সহস্র স্বপন
উন্মুক্ত করো আজ—হে আমার বিস্মৃত শ্রাবণ।

— —

"ফেরীওয়ালা"

শ্রীতপতী মুখোপাধ্যায়

ন'টার কর্মচঞ্চল কলিকাতায় বিচিত্র কোলাহল ছাপাইয়া ধ্বনিত হইল—

যো—ওয়—মু-জা, যো—ওয়—মু-জা—
ফলের রাজা যো—ওয়—মু—জা
চিনি দিয়ে যখন খাবে
ফুলপী বরফ মালুম হবে।
যো—ওয়—মু-জা, যো—ওয়—মুজা.....

একাধারে পরিচিতি, ব্যবহার প্রণালী ও সুখাদুতির পূর্ণাভাষ। প্রতিভাবান লেখকের লেখনী যেমন তুচ্ছ ঘটনা গ্রহণ করিয়া তাহাতে চিরন্তনত্বের অমৃত সিঞ্চন করিয়া অমরতা দান করে তেমনি এই উচ্চস্তরের সৃষ্টি প্রতিভার অধিকারী ব্যক্তিটির বুদ্ধিতে বস্তুচক্রের আবর্তনে যে ফল স্থান লাভ করে তাহাকেই শ্রেষ্ঠ সম্মান না দিয়া সে ছাড়ে না। এবং সেই শ্রেষ্ঠ সম্মানের যোগ্যতা দেখাইতে গুণবর্ণনার পারিপাট্যের অবধি নাই। তাহা সকল সময় ফলটিকে লোভনীয় করিতে সক্ষম হয় কিনা জানা নাই, কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণের শক্তি নিঃসন্দেহে সার্থক। আবার শুনিতে পাওয়া যায় "বেনারসকা ল্যাংড়া আম"—মনে পড়িয়া গেল কিছুদিন পূর্বে কাশী গিয়াছিলাম এবং তথাকার এক আম্রফল বিক্রেতা, তাহারটিই যাহাতে আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় তাহার জন্য বলিয়া যাইতেছিল "ল্যাংড়া কলকাত্তা—আ-কা ল্যাংড়া আম।" আবার সুজলা সুফলা বাংলায় বসিয়া শুনিতে হয় "আফ্রিকার পেয়ারার" গুণ গান—পেঁয়ো যোগী ভিখ্ পায় না প্রবাদটির মর্মোপলব্ধি হয় প্রত্যক্ষ ভাবে।

যখন যেমন জিনিষটি চাই অর্থাৎ সময়োপযোগী বিচিত্র দ্রব্য সম্ভার লইয়া ফেরীওয়ালা আমাদের দ্বার প্রান্তে হাঁকায় আমাদের দৃষ্টিপাত প্রত্যাশায়। প্রত্যুষে খবরের কাগজ হইতে শুরু করিয়া স্কুল কলেজে যাওয়ার সময় তপসে মাছ। আবার অফিস কলেজ যাত্রাকালে ছেঁড়া জুতা দেখিয়াই দুর্ভাবনায় পড়িতেই শুনা যায় "এ-ওকে". বয়াতমের ইংরাজী প্রতিরূপ নহে "জুতা সেলাই হোবে" কথাটির প্রতীক, পূর্ববর্তী অতি প্রয়োজনীয় কথাগুলি অপ্রয়োজনীয় বোধে হাল্কা সুরে বলা হইয়েছে। দ্বিপ্রহরে সেলাইএর কলের সুতা ফুরাইয়াছে নবনির্মিত জামাটিতে লাগাইবার বোতামও নাই। অথচ এই প্রখর রৌদ্রে বাড়ী হইতে বাহির হইবার কল্পনাও করা যায় না—এমন সময় শুনিলাম—"চাই লেস্-ফিতা" আর ভাবনা নাই ডাকিলেই মিলিবে। যায় "বেলোয়ারী কাঁচের চু-উ—ড়ী" যায় "শিশি বোতল কাগজ বিক্রী"। এই শেষোক্ত দুই জনের আসরে সকলেরই সাদর আহ্বান। তাহাদের ঐশ্বর্য্যে ছেঁড়া কাগজ, পুরান জুতা, ভাঙ্গা চলিবার ফ্রেম, কালির দোয়াত কিছুই অপাংক্তেয় নহে। বৈশাখের সন্ধ্যায় প্রকৃতির দেহের শীতলতা দর্শনে মানুষও যখন এমনটি হইতে চায় তখন আসে "ফুলপী বরফ" আসে "বে—এল—ফুই" আরো কত কি।

বিকালবেলায় শিশুর নয়নসুখকর সামোর অপূর্ব্ব নিদর্শন "সাড়ে ছে আনা লেখানা" আবার তাহার পিছন পিছন সেই অপূর্ব্ব সাম্রাজ্যের অধিকারীর প্রতি ঈর্ষাকাতর বালক দল। তাহাদের উজ্জ্বল চক্ষু দুইটি যেন বলিতেছে—কি সৌভাগ্যবান—যেটিতে খুশী হাত দিতে পারে যখন খুশী খেলিতে পারে—এমন কি ইচ্ছা করিলে এই গোটা রাজ্যটি বেলিয়া বেলিতেও বলিয়া যাইতে পারে। কিন্তু এই বিক্রেতাটির কাছে বল, পুতুল ও ইন্দুর বরাদ্দ করে যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য নাই ইহা তাহাদের ধারণার অতীত। এই গাড়ী ঠেলা যে বেড়াইবার খেলা বা যাদা হাতে ফুল যোগাইবার কবিত্ব নহে পৃথিবীর আদিম অভিশাপের তীব্র নিষ্পেষণ আছে ইহার পিছনে তাহা বুঝিবার বয়স এই অপরিণত বুদ্ধি বালকদের হয় নাই।

আগেকার দিনের অন্তপুরিকাগণ দোকান বাজারে

যাইতেন না; অন্তরমহলে পুরুষ প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ—তাঁতিনী, নাপতিনীর ছিল অবাধ গতিবিধি। তাহারা যে কেবল পণ্যদ্রব্য বিক্রয় করিত তাহা নহে—বাহিরের নব নব সংবাদও আনিয়া দিত। সেই প্রায় সত্য বিলুপ্ত আপন মতামত নিষিদ্ধ খবরে হয়ত জীবিত ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিত, কিন্তু তাহা পুরনারীগণের মধ্যে যে আনন্দ সৃষ্টি করিত তাহার মূল্য কম নহে।

এই ফিরিওয়ালাদলের আগমন তাহাদের প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য। কিন্তু এই প্রাত্যহিক দেখা শোনার মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে—পাই পয়সার হিসাব ছাড়াইয়া একটি প্রীতিসূচক আত্মীয়তার সম্পর্ক। যে সম্পর্কে মন একে অপরের সুখে, দুঃখে হাসে, কাঁদে। আনন্দের দিনে একে অন্যের কল্যাণ কামনার প্রত্যাশা করে। অভাবের আদান প্রদানের মধ্যে এই যে সজীব বিনিময়ের অংশটুকু, তাহার প্রীতি বড় সুন্দর বড় মনোরম।

কৃষ্ণকলি

(উপন্যাস)

শ্রীকণপ্রভা ভাদুড়ী

৬

কৃষ্ণার বাড়ীর বাগানটী সত্যিই ভারী সুন্দর। দূর থেকে ঠিক ছবির মত দেখতে লাগে। মস্ত সবুজ মাঠের চারিধারে রাঙা সুরকীর পথ। তার কিনারে কেয়ারী করা ফুলের বাগান। তাইতে থরে থরে ফুটে আছে, বেল, যুঁই, গোলাপ, আর রজনীগন্ধা ফুল। মাঠের মধ্যে প্রবেশ পথ গুলি প্রস্ফুটিত মাধবী ফুলে আচ্ছাদিত; তাইতে ফুটে আছে তবকে তবকে সুন্দর সুগন্ধী মালতী ফুল। নীল আর কালো, হলুদ আর সাদা প্রজাপতির পাখায় তার রেণু মাখা। বাগানের পাঁচীল ঘেঁসে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে আম জাম লিচু পেয়ারা গাছের ফাঁকে ফাঁকে চাঁপা করবী, অশোক আর শিরীষ ফুলের গাছ। তারই ছায়ায় ছায়ায় পাথরের বেঞ্চী পাতা আছে। এখন মালীও নেই তাই বাগানের যত্নও তেমন হয় না, তাই বাগানের পূর্ব্বশ্রী এখন হয়ত আর নেই। তথাপি অযত্নও কৃষ্ণার আন্তরিক স্নেহের ফলে তার সৌন্দর্য্য এখনও পুরোমাত্রায় বর্ত্তমান আছে। সেই পুষ্পোদ্যানের মধ্যে কৃষ্ণা আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছিল; আর হাতে বাঁধা ঘড়ির দিকে ক্ষণে ক্ষণে দৃষ্টিপাত করছিল। না এখনও ছয়টা বাজেনি, রঞ্জনের আসার সময় এখনও হয়নি। বাগানের গাছের ফাঁক দিয়ে রাজপথ স্পষ্ট দেখা যায়। ওর ইচ্ছে ছিল, রঞ্জন এলে ও এখান থেকে প্রথমেই দেখতে পাবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে ভিতরে নিয়ে গিয়ে সিসিমাকে অবাক করে দেবে। বৈশাখ মাস শেষ হতে গেছে, কিন্তু চাঁপা গাছে ফুল ফোটার পালা এখনও শেষ হয়নি। কয়েকটী ভরা চাঁপা ফুল হাতে নিয়ে কৃষ্ণা ভাবছিল, রঞ্জনকে দেখলেই সিসিমার কেবল তার সঙ্গে আমার বিয়ে দেওয়ার কথা মনে পড়ে যায়; আশ্চর্য আমার ও কখনও মনে হয় না রঞ্জনকে বিয়ে করার কথা; আমার জীবনে বিয়ের প্রয়োজন নেই এইজন্য যে, ঠিক শঙ্করের মত যদি একটী ছেলে পাই তবে আমি বিয়ে করতে পারি, নচেৎ নয়; কিন্তু ঠিক শঙ্করের মত ছেলে, আমি পাবোনা তাই; আর বিয়ের কথা চিন্তা করারও অবসর আমার নেই এইজন্য যে আমার মনে অনেক আদর্শ দানা বেঁধে আছে, তাকে সফলের জীবনে রূপায়িত করতে হলে অখণ্ড অবসরের প্রয়োজন। বিয়ের মধ্যে আমি আমার জীবনের মূল্যবান অবসর গুলিকে বন্দী করতে রাজী নই তারপর সিসিমাকে ছেড়ে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। কৃষ্ণার মনে এলোমেলো ভাবে নানা চিন্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে; আর সে অন্যমনে নখ দিয়ে খণ্ড বিখণ্ড করছে একটার পর একটা করে তার হাতের চাঁপা ফুলগুলি। এমন সময় পিছনে

পরদিনে আফিস হতে সে দেখল রঞ্জন একটী রক্তকরবী বাড়ের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। সে দ্রুত পায়ে তার নিকটে যেতেই রঞ্জন বললে, "কি এত ভাবছিলে কৃষ্ণা ?"

"বাবে, আমার বুঝি কিছু ভাবনা নেই না ? "কৃষ্ণা বললে, "চল পিসিমার কাছে যাই ; কাল তোমার বাবাইনি বলে আমি বকুনি খেয়েছি"—

"তোমাদের বাগানটী কিন্তু ভারী সুন্দর, "রঞ্জন বললে "আমার এখানে বসতে ইচ্ছে করছে"—

কৃষ্ণা বললে, "পিসিমার সঙ্গে দেখা করে এসে, পরে বোসো কেমন ?"

"বেশ, তবে এখন পিসিমার কাছে আমায় নিয়ে চল" রঞ্জন বললে।

"এস আমার সঙ্গে" কৃষ্ণার পিছনে পিছনে, রঞ্জন অন্তঃপুরে প্রবেশ করল।

রঞ্জনকে দেখে গুরুর আনন্দ আর ধরেনা। নিজের কাছে খাটে বসিয়ে তিনি তার সঙ্গে অনেক গল্প করলেন। কৃষ্ণাকে ডেকে বললেন, "রঞ্জনের খাবার দিয়ে তুই চা তৈরী করে দে কৃষ্ণা"—

রেকাবী ভরা খাবারের দিকে চেয়ে রঞ্জন বললে, "একটু কম করে দিন পিসিমা, এত কি খাওয়া যায় কখনও"—

"খুব যায়," গুরু বল্লেন, তুমি খাও তো দেখি, কেমন পেটে না ধরে ?"

এ স্নেহের শাসন উপেক্ষা করার ক্ষমতা রঞ্জনের নেই। কাজেই সে আহারে মনোসংযোগ করল। এক সময় গুরু বললেন, "তোমার মা বাবার কথা মনে পড়ে রঞ্জু ?"

"না পিসিমা," রঞ্জন বললে ; "আমার খুব ছোট বেলায় তারা মারা গেছেন। মামার বাড়ী আমি মানুষ হয়েছি"—

আহা, গুরু বললেন, "তাঁরা খুব ভালোবাসেন নিশ্চয় ?"

"আমায় ভালোবাসেন কি আমার পৈত্রিক সম্পত্তিকে ভালোবাসেন, রঞ্জন বললে "সেকথা বলতে পারিনা পিসিমা ; তবে সেই বাড়ীতেই আমি নির্ব্বাঞ্ঝাটে আছি, একথা সত্য"—

গুরু বললেন, "তা বাবা এবার একটী বিয়ে কর্ত্তো তুমি"—

"ওরে বাবা" রঞ্জন দুই হাত তুলে বললে, "রক্ষে করুন পিসিমা, এই বেশ আছি।"

"ওকি কথা বাবা," গুরু বললেন, "বিয়ে না করলে ত তোমার ঘরে লক্ষ্মী বাঁধবে না ?"

কৌতূহলী হয়ে রঞ্জন প্রশ্ন করলে "পাত্রীটী কে পিসিমা, নিশ্চয় ঠিক আছে, তাই বিয়েতে আপনার এত আগ্রহ ?"

"আমার ভাইঝি কৃষ্ণা", অজ্ঞান বদনে গুরু বলে ফেললেন, "ভারী লক্ষ্মী মেয়ে,"—কৃষ্ণা যে ঘরের মধ্যে ছিল সে কথা তাঁর স্মরণে ছিলনা ; কিন্তু স্মরণ হোল, রঞ্জনের সুউচ্চ হাসির শব্দে। তিনি বললেন, "কি হোল রঞ্জন হাসলে যে ?"

"আপনার কথায় পিসিমা," রঞ্জন বললে, "কৃষ্ণা রাগ করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।"

"ওর কথায় তুমি কিছু মনে কোরনা বাবা," গুরু বললেন, "ছোটবেলা থেকে বাপ মা নেই, স্নেহ তেমন পেল কই ? তাই একটু একরোখা গোছের হয়ে গেছে। কই বাবা তোমার মতামতের কথা কিছু বল্লে না ত ?"

"আপনার আদেশ অমান্য করার ক্ষমতা আমার নেই পিসিমা," রঞ্জন বললে, "আমার মামা মামীমা, রামেশ্বরে গেছেন, কিছু দিন পরে ফিরবেন ; তখন আপনি তাঁদের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়ে দেবেন। তবে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমার মতে তাঁরা অমত করবেন না।"

খুসী হয়ে গুরু বললেন, "বেশ, বাবা তাই কোরবো। তুমি আমায় আজ যে সুখী করলে সে কথা মুখে বলে বোঝাতে পারব না।"

গুরুকে স্নানত্যাগ করতে দেখে, সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জনও উঠে দাঁড়িয়ে বললে, "আজ তবে আমি যাই পিসিমা ?"

"এখনি যাবে বাবা" ; গুরু বললেন, "রাতে খেয়ে তবে যাবে। আমার সব তৈরী আছে।"

"আমি ত বাড়ীতে বলে আসিনি পিসিমা," রঞ্জন বললে, "ওরা খাবার নিয়ে বসে থাকবে"—

"তোমার মামা মামী ত এখানে নেই" ; গুরু বললে, "ঠাকুর চাকররা একদিন না হয়, বসে থাকলই। তুমি একটু বোস, আমি এখনি খাবার দিচ্ছি"—

উত্তরের অপেক্ষা না করে তিনি চলে গেলেন। রঞ্জন

শুনলো, তিনি বাইরে দিয়ে ডাকছেন, "কৃষ্ণা ও কৃষ্ণা, এদিকে আয়"—

ঘরের মধ্যে বসে বসে রঞ্জন ভাবতে লাগল, বিয়েতে সে তো হঠাৎ মত দিয়ে দিল, কিন্তু কৃষ্ণার মতটাও ত একবার জানা দরকার। পিসিমার যা গোঁড়া মত, আর যে রকম স্নেহান্ধ তিনি, তাতে করে তাঁকে দিয়ে এ কাজ করা সম্ভব হবে না। নিজেকেই এ দায়িত্ব নিতে হবে।

খেতে বসে রঞ্জন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল কৃষ্ণা সেখানে নেই। শুরুতে সে কথা জিজ্ঞেস করতে ওর কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকতে লাগল। শুরু কিন্তু নিজেই এক সময় বললেন "মেয়েটার আবার হঠাৎ যে কেন মাথা ধরল, তা জানি না বাপু যা দিনকাল পড়েছে, এখন একটা অসুখ না হলেই বাঁচি"—

রঞ্জন মাথা নীচু করে খেতে লাগল, কোনও উত্তর দিল না।

তার মনের কথা শুরু হয়ত কিছু বুঝলেন হয়ত বা বুঝলেন না; কিন্তু তিনি তার খাবার আসনের সামনে বসে একান্তভাবে তদারক করতে লাগলেন।

সুধা আর শঙ্কর, শঙ্কর আর সুধা; তারা দুজন আর পাচক ভৃত্য ছাড়া তাদের এই নতুন গৃহস্থালীতে অন্য কোনও প্রাণী নেই। তবু দুজনের মধ্যে রবিবারও মনের মিল হয় না। তার কারণ অফুরন্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিত পালিত হওয়ার জন্য সুধা জীবনে প্রাচুর্যটাই বেশী পছন্দ করে। আর শঙ্কর ঠিক তার বিপরীত। কি সংসারে, কি জীবনে, সে রীতিমত প্রাচুর্যকে বর্জন করে চলে। সে চায় নিজের চিন্তকে প্রসারিত ও বাধামুক্ত করে জীবনের চতুর্দিক অনাড়ম্বর মাধুর্যে ভরিয়ে তুলতে।

সুধা এই তথ্যটা একেবারেই বোঝে না। সে চায় সে যখন ধনীর স্ত্রী, শঙ্কর ওকে নিত্য নূতন শাড়ী অলঙ্কার এনে দিক, আর সেই ঐশ্বর্য অঙ্গে ধারণ করে প্রতিবেশী আত্মীয় বান্ধবীদের বাড়ী অবসর বিনোদনের জন্য ঘুরে বেড়াক। তা নয়, শঙ্করের আবার, ওকে এখন কই করে লেখাপড়া শিখতেই হবে। শঙ্করের এই অদ্ভুত খেয়ালকে সে কিছুতেই প্রশ্রয় দিতে চায়না। এই নিয়ে দুজনের মধ্যে মনান্তর আর মতান্তরের সীমা পরিসীমা নেই। সুধা বুঝতে পারেনা, এই নির্বোধের মত নিজের অন্ধ মতবাদকে আঁকড়ে পারিপার্শ্বিকের থেকে নিজেকে বর্তমানে বিচ্ছিন্ন করে রাখার পরিণতি কি হতে পারে? শঙ্কর দূরদৃষ্টি দিয়ে তাহা উপলব্ধি করতে পারে, পরে তার মুখ গম্ভীর হয়ে ওঠে। সময় সময় সে ভাবে চলুক সুধা নিজের খুশী মত, করুক অর্থের অকারণ অপব্যবহার, থাকুক অশিক্ষায় অন্ধকূপে বর্তমান যুগ থেকে বহু পশ্চাতে পড়ে; সে আর কিছু বলবেনা—কিন্তু পরক্ষণেই তার পৌরুষ গর্জে ওঠে; না, জেনে শুনে, অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া মহাপাপ। সে তাই প্রত্যহ লাইব্রেরী থেকে ফিরে এসে চা খেয়ে সুধার বই খাতা নিয়ে বসে, আর সুধা লজ্জায় অস্থির হয়ে এক ঘণ্টার পড়া দশ ঘণ্টায় আয়ত্ত করে। প্রায় প্রত্যহই রঞ্জন সে সময় তাদের ঘরে উপস্থিত থাকে, সুধাকে উৎসাহিত করার জন্য কৃষ্ণার বিদ্যা বুদ্ধির প্রশংসা করে, শঙ্করও তাতে যোগ দেয়; ফলে হয় কি অজ্ঞতার জন্য সুধার অবচেতন মনে, একটা ঈর্ষাও অগ্নি ধীরে ধীরে জ্বলে ওঠে তার ফলে তার মন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং অকারণে স্বামীর উপর নিষ্করুণ হয়ে ওঠে; তবু নিজের জেদ ত্যাগ করে স্বামীর অনুগামী হতে পারে না অদ্ভুত জেদী মেয়ে সুধা।

সেদিন অপরাহ্ণ বেলায় স্নানান্তে নিজ কক্ষে প্রবেশ করে সুধা দেখল, কৃষ্ণা তার অপেক্ষায় বসে আছে। খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে সে কৃষ্ণার গলা জড়িয়ে ধরে বললে, "কখন এসেছিস কৃষ্ণকলি; চল দেখবি চল, ছাদে আমার কুলের টবে কত রকমের কৃষ্ণকলি ফুল ফুটেছে"—

সুধার এই অকারণ আনন্দের আরও একটা কারণ আছে। সেটা হচ্ছে, শঙ্করের আজ বাড়ী ফিরতে রাত্রি হবে, সেইজন্য আজকের সন্ধ্যাটা সে বিদ্যার্জনের হাত থেকে রক্ষা পাবে। এই অবসরে সাজ সজ্জা করে ও একটু গাড়ীতে বেড়াতে পারবে। কৃষ্ণা হেসে বললে' "তোমার আজ হয়েছে কি দিদি? এমন ত কোনও দিন দেখিনি?"

"অন্য দিন থেকে আজকের দিনটা যে অন্য রকম" সুধা বললে,—

"কেন ভাই"—

"আজ আমার খুশ বন্ধ" বলে বালিকার মত হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে সুধা আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে। কিছুক্ষণ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজের সুন্দর মুখখানি নিরীক্ষণ করে নানা রকম অনুরাগ নিয়ে প্রসাধনে লিপ্ত হোল। তার এই ছেলেমানুষি দেখে কৃষ্ণার তাকে খুব ভালো লাগছিল, কিন্তু মনে মনে একটা যেনো অনুভব করছিল, তার এই পাঠে বিস্মৃতভা দেখে। কৃষ্ণা শৈশব থেকে জানে শঙ্করের মন কি গভীর জ্ঞান পিপাসু; তার নিজের পাণ্ডিত্য ও কিছু কম নয়? সুধার এই স্বভাবের জন্য সে কি শঙ্করের মনের সঙ্গী হতে পারবে? শঙ্কর কি ওকে শ্রদ্ধা করতে পারবে? শ্রদ্ধাই প্রেমকে মহনীয় করে কৃষ্ণা একথা জানে; হোলই বা স্বামী স্ত্রীর প্রেম, অত্যন্ত লোভনীয় অত্যন্ত গোপনীয়, তথাপি সব প্রেমের পরিণতি এক।

কৃষ্ণা অন্যমনস্ক হয়ে নানা কথা ভাবছে, এমন সময় "সুধা ডাকল, কৃষ্ণা দেখে যা একটু"? কৃষ্ণা দেখল আলমারী খুলে বিভিন্ন রকমের শাড়ী আর ব্লাউস, সামনে নিয়ে সুধা বিব্রত হয়ে বসে আছে। কৃষ্ণা কাছে গেলে সে বললে, দেখনা কৃষ্ণা, এই শাড়ীটার সঙ্গে এই ব্লাউসটা ঠিক মানাবে কি না; নীচু হয়ে মাটীতে বসে কৃষ্ণা বললে, "না, বং ঠিক ম্যাচ করবে না; তোমার অবিশ্যি সব পরলেই মানায়।" "বেছে দেনা একটু ভালো দেখে"; সুধা বিপন্ন মুখে বললে, "রোজ আমার জামা কাপড় দেখে ঠাকুরপো ঠাট্টা করে, আমার এমন লজ্জা করে কি বলবো তোকে?"

"তুমি যদি চোখ খুলে না দেখে, সাজ সজ্জা কর", কৃষ্ণা বললে, "তাহলে লজ্জা ত করবেই। তুমি কালো শাড়ী পরতে ভালোবাসো, পরো, কিন্তু তার সঙ্গে অমন কটকটে সবুজ ব্লাউস পরো কেন? এক পরবে, শাড়ী ব্লাউস দুটোর বংই এক দেখে, না হলে, একটার বং গাঢ় হলে, আর একটার বং যেন হালকা হয়, এ দিকে সব সময় দৃষ্টি রেখে পরো; তাহলে দেখো কেউ ঠাট্টা করতে পারবে না তোমায়; তোমার যে রকম সুন্দর বং, সুন্দর ফিগার তাতে একটু হালকা ধরণের সাজ সজ্জাই করা ভালো"—কৃষ্ণার বেছে দেওয়া শাড়ী ব্লাউস হাতে নিয়ে সুধার মন খুশীতে ভরে উঠল। শান্তিনিকেতনী সুচী শিল্প করা একটী ব্লাউস। পরে সুধাকে তারী সুন্দর দেখাতে লাগল। কৃষ্ণা বললে, "কোথাও যাবে নাকি দিদি?"

"চলনা একটু বায়োস্কোপে যাই"—সুধা বললে।

"ছয়টা বেজে গেছে, এখন যেতে হলে, নয়টার শোতে যেতে হয়", কৃষ্ণা বললে, 'বাড়ী ফিরতে তাহলে এগারোটা হবে, কি তার চেয়েও বেশী, শঙ্কর বাড়ী ফিরে রাগ করবে না? আজিও শিশিমাকে বলে আসিনি?"

"তাইত", সুধা নিরাশ কণ্ঠে বললে, "তবে কোথায় যাওয়া যায় বলতো কৃষ্ণা?"

একটু ভেবে কৃষ্ণা বললে, "সত্যি কথা দিদি ভীড়ের মধ্যে অকারণে আমার যাতায় বেরোতে ইচ্ছে করেনা, কোলকাতার কোন্ জায়গাটা যে একটু নিরিবিলি আছে আমি ত ভেবে পাইনা?"

"এই বয়েসে তোর মনটা এমন বুড়োটে হয়ে গেল কেন বলতো?" সুধা বললে, "সব সময় নিরিবিলিতে থাকতে চাস, কেন ভীড়ের মধ্যে গেলে লোকে তোকে কি খেয়ে ফেলবে?"

"খেলে ত ভালোই ছিল, কৃষ্ণা বললে, নিজের মনের ভাব চেপে রেখে, "আধ খাওয়া করে ফেলে দেবে। যা আমার কালিমারা রূপ?" হেসে উঠল কৃষ্ণা খিল খিল করে।

"ছিঃ ছিঃ ওকি কথা ভাই, "সুধা তার মুখটী তুলে ধরে বললে, "কালো হলে কি হবে, এমন মুখ কজনের আছে? তোকে কল্পনা করেই বোধহয় কবি লিখেছেন,

"কৃষ্ণ বলি আমি তারেই বলি,
কালো যারে বলে গাঁয়ের লোক;
কালো, তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ"—

"ওমা তুমি কখন কবিতা পড়ো দিদি?" কৃষ্ণা কলকণ্ঠে উছল হয়ে উঠল।

"দূর আমি পড়বো কেন? আমার ও সব ভালো লাগেনা।" সুধা বললে "দুটীর দিনে ও সারাদিন কবিতা পড়ে; এইটাতে তোর নাম আছে বলে, আমি শুনে শুনে মুখস্থ করেছি"। শঙ্কর কবিতা পড়ে, এই কবিতা

সুধা শঙ্করের কাছে লিখেছে, গভীর প্রত্যয় কৃষ্ণার মন আনুত হয়ে উঠল, সেও যে কবিতা পড়তে ভীষণ ভালোবাসে।

"আমার গান গাইতে খুব ইচ্ছে করে", সুধা বললে, "কিন্তু এত বড় বয়সে শিখতে বড্ড লজ্জা করে"—

"সেখার আবার বয়স আছে নাকি;" কৃষ্ণা বললে, "তোমার ওই লজ্জাই হয়েছে সবচেয়ে শত্রু"—

"তুই ত বেশ ভালো গাইতে পারিস কৃষ্ণা,"

"আমায় কটা গান শিখিয়ে দিবি?"

"তুমি যদি শেখো তবে আমি আনন্দের সঙ্গে শিখিয়ে দোব"—কৃষ্ণা বললে, "তবে চল আজই সুরু করি", সুধা বললে, "কিন্তু হারমোনিয়াম ত নেই কৃষ্ণা?" হারমোনিয়াম নেই? কৃষ্ণা ভাবলো এই অজুহাতে সুধা হয়তো আর শিখতে চাইবে না—তাই সে বললে "না থাক হারমোনিয়াম আমার শুধু গলায় গাওয়া অভ্যাস আছে, তোমাকেও তাই শেখাবো চল"—

নিজের অপরূপ সাজ লজ্জার দিকে কতক চোখে চেয়ে সুধা বললে, "তাহলে বাইরে আর কোথাও যাবিনা?"

"তবে আর হয়েছে তোমার গান শেখা", কৃষ্ণা ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বললে, "তুমি যেখানে খুশী বেড়াতে যাও, আমি বাড়ী চলে যাচ্ছি"—

"হয়েছে, হয়েছে" থাক্ আর রাগ করতে হবেনা—"সুধা অপ্রতিভ হয়ে বললে, "চল, মাষ্টার দিদিমনি, তুমি যা বলবে, আমি তাই শুনবো"—

ওর ভাব ভঙ্গী দেখে কৃষ্ণা হেসে ফেললে। বললে, "তোমাদের বারান্দাটা বেশ সুন্দর চল সেখানে গিয়ে বসিগে"—"যা তোমার খুশী" বলে, সুধা কৃষ্ণার গলা জড়িয়ে ধরল।

কৃষ্ণা গান গাইছে, সুধা বসে তন্ময় হয়ে শুনছে; মানুষের গলায় এত সুর ফোটে কি করে? সে ভেবে পায় না। মনে এত ভাব আসে কি করে সে বুঝতে পারে না। কৃষ্ণা তখন গাইছে—

"তুমি সন্ধ্যার মেঘ, শান্ত সুদূর
আমার সাধের সাধনা।
মম বিজন গহন বিহারী
আমি আমার মনের মাধুরী মিশায়ে
তোমারে করেছি রচনা।
তুমি আমারি, তুমি আমারি, তুমি আমারি,
মম বিজন গগন বিহারী।"

এখান থেকে মুক্ত আকাশ তেমন দেখা যায় না। চতুর্দিকে পাচিল তুলে রেখেছে, বাড়ীর পর বাড়ী, আর ছাদের পর ছাদ। তারই ফাঁকে সঙ্কীর্ণ আকাশে লেগেছে অস্ত সূর্যের রক্তিমাভা। মেঘে মেঘে ভেসে চলেছে সেই রংএর ছোপে, অন্ধকার ধীরে ধীরে নেমে আসছে, চারিদিক আচ্ছন্ন করে। আকাশে পক্ষীরেখা রচনা করে দলে দলে ফিরে আসছে গৃহবাসী ছোটা ছোটা কপোত আর কপোতী। বারান্দার কার্নিশে চড়াই পাখীদের কল কাকলি থেমে গেছে, চারিদিকে কেমন একটা স্তব্ধতা থম থম করছে। তার মধ্যে কৃষ্ণার গানের মূর্ছনা, কেঁপে কেঁপে ফিরছে; ভারী করুণ; ভারী মধুর সে সুর। গান শেষ হলে, কৃষ্ণা বললে, "দিদি আমি গাইলুম শুনলে ত? এবার তুমি আমার সঙ্গে গাও"—

সুধা খাতায় গানের মুখস্ত রেখে, কৃষ্ণার সঙ্গে গাইতে সুরু করলো, কিন্তু ওর গলায় কথা আসে সুর আসে না। অনেকক্ষণ চেষ্টার পরে কৃষ্ণা বললে, তোমার বাজনার সঙ্গে আগে গলা সেধে তৈরী করে নিতে হবে, তা না হলে তুমি গান গাইতে পারবে না"—

"আচ্ছা তুই শিখিয়ে দিবি ত?" ম্লিষ্ট কণ্ঠে সুধা বললে, "দেখিস আমি ঠিক পারবো"—

"পারবেনা কেন?" খুশী স্বরে কৃষ্ণা বললে, নিশ্চয় পারবে"—

কাদের বাড়ীতে বেজিওর ঘড়িতে তখন চং চং করে আটটা বাজল। কৃষ্ণা সচকিত হয়ে বললে "আটটা বাজল দিদি এবার বাড়ী যাই, আবার একদিন এর মধ্যে আসবো।"

"হ্যাঁ আসিস," সুধা বললে, "তুই না এলে আমার কিন্তু গান শেখা হবেনা। মাষ্টারের কাছে আমি শিখতে পারবো না"—

"না না মাষ্টারের কাছে তোমায় শিখতে হবে কেন", কৃষ্ণা ব্যস্ত হয়ে বললে, "আমি সময় পেলেই চলে আসবো,

দেখো তুমি"—দুই বোনে গল্প করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল।

বারান্দা পার হয়ে বসার ঘরে ঢুকতেই তারা দেখল, শঙ্কর ও রঞ্জন সেই সময় বাইরের থেকে সেই ঘরে প্রবেশ করছে। ওদের দেখে মেয়েরা দাঁড়িয়ে পড়ল। শঙ্কর হেসে বললে, "কি কৃষ্ণা যে, কখন এসেছো, যে এমি ধারা চল্‌লে?"

"অনেকক্ষণ এসেছি, তুমি দিদির কাছে শুনো" কৃষ্ণা বললে, "তোমার গাড়ীটা নিয়ে আমি যাচ্ছি শঙ্কর"—

উত্তরের অপেক্ষা না করে, রঞ্জনের দিকে দৃকপাত মাত্র না করে ও হন হন করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। শঙ্কর উচ্চকণ্ঠে বললে, "একলা যেতে ভয় করবে কৃষ্ণা, একটু অপেক্ষা কর আমি যাচ্ছি"—

বাহির থেকে কৃষ্ণার কোনও প্রত্যুত্তর এলনা, শুধু একটা চলন্ত যন্ত্রযানের গর্জন আর পেট্রোলের তীব্র গন্ধ হাওয়ায় ভেসে এসে তাদের জানিয়ে দিল, কৃষ্ণা চলে গেছে। শঙ্করের বিপন্ন মুখভাব লক্ষ্য করে সুধা বললে, "তুমি, কোনও চিন্তা কোরনা, কৃষ্ণা অত ভীতু মেয়ে নয়, আর ড্রাইভার লালজী সিংকে ও বেশ ভালো করেই চেনে"—

রঞ্জনকে নীরবে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুধার ভারী অবাক লাগল, সুধাকে দেখে ক্যাপাতে ও ঠাট্টা করতে তার কখনও ত ভুল হয় না? পরিহাস তরল কণ্ঠে সুধা বললে, "কি ঠাকুর পো গলায় ব্যথা হয়েছে নাকি? কথা কইছ না যে?"

"সত্যি বউদি", নিস্পৃহ স্বরে রঞ্জন বললে, "সারাদিনের পরিশ্রমে শরীরটা বড় ক্লান্ত লাগছে, আজ চলি"—

"হ্যাঁ তুমি চলে যাও রঞ্জু" শঙ্কর বললে, "আজ সারাদিন বড্ড খাটুনি গেছে। ওকে আর আটকিয়োনা সুধা"—

রঞ্জন ক্ষিপ্র পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেট দিয়ে একেবারে পথে এসে পড়ল। কৃষ্ণার ব্যবহারে সে হঠাৎ কেমন যেন মর্মাহত হয়ে গেছে। হঠাৎ এমন অপরিচিতের মত ব্যবহার কৃষ্ণা কেন করলো তার সঙ্গে? ভদ্রতা করে একটু হাসি বিনিময়, বা একটা নমস্কার পর্য্যন্ত করলনা, এর মানে কি? অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে সে একটা ট্রামগাড়ীর ট্রামে উঠে পড়ল। আজ অনেক ঘুরতে হবে বলে সে বাড়ী থেকে গাড়ী নিয়ে বেরোয়নি। কিরতে দেরী হবে বলে সে আজ বাড়ীতে তার রাত্রের খাবার রাখতে বারণ করে এসেছিল ঠাকুরকে। কেন না সে জানতো বেশী রাত্রি হলে শঙ্কর ও সুধা তাকে না খাইয়ে ছাড়বে না। কৃষ্ণার ব্যবহারে সে এমনি, বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল যে, সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর আহারের কথাও ভুলে গেল। তার মনে স্থির বিশ্বাস ছিল যে তার সঙ্গে বিবাহের কথায় কৃষ্ণা সুখী হয়নি, তার জন্যই কৃষ্ণা তাকে এমনি ভাবে এড়িয়ে গেল।

রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর সুধা ঘরে এসে দেখল, শঙ্কর শুয়ে পড়েছে। কাছে গিয়ে দেখল, না এখনও ঘুমায়নি, এমনি চোখ বন্ধ করে আছে। তার গায়ে মৃদু স্পর্শ করে ও ডাকল, "শুনো শুনছ?"

"কি" শঙ্কর চোখ মেলে তাকাল।

"আমার একটা হারমোনিয়াম কিনে দেবে;" সুধা বললে—শঙ্কর যেন আকাশ থেকে পড়ল, বললে "কেন হারমোনিয়াম তুমি কি কোরবে?

"হারমোনিয়াম দিয়ে যা করে তাই কোরবো"—ভিক্ত কণ্ঠে সুধা বললে। শঙ্করের উদাসীন ব্যবহারে ও মর্মাহত হয়েছিল।

"আহা রাগ করছো কেন। "নিজের ভুল বুঝতে পেরে শঙ্কর হাত ধরে তাকে কাছে টেনে এনে বললে, হারমোনিয়াম দিয়ে ত গান করে, তা তুমি গান শিখেছ নাকি?"

"না শিখিনি", সুধা বললে, "কৃষ্ণার কাছে শিখবো। সে বলেছে আমায় শিখিয়ে দেবে"—

"তুমি কৃষ্ণার মত গান গাইতে পারবে?" শঙ্করের চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল, "তোমার লজ্জা করবে না?"

"শিখলে কেন পারবো না?" শঙ্করের উপেক্ষা গায়ে না মেখে সুধা বললে, "তবে বাইরের পাঁচ জনের সামনে গাইতে লজ্জা করবে কিনা বলতে পারি না"—

"তবে আর টাকা খরচ করে যাদুনা কিনে লাভ কি?" শঙ্কর বললে, "তার চেয়ে ও টাকাটা কোনও সৎকাজে ব্যয় করলে ভালো হবে"—

"আমি একটা জিনিষ চাইলেই সেটা কিতে টাকা নষ্ট

করা হয় না ?" সুধার ঠোঁট অভিমানে কাঁপতে লাগল ; তবুও সে বললে, "আর নিজে যখন মুঠো মুঠো টাকা নষ্ট করো তাতে কিছু হয়না না ?"

"কি, কিসে আমার টাকা নষ্ট করতে দেখলে বল ত ?" শঙ্কর বিস্মিত স্বরে বললে।

"দেখিনি কিনে ?" কটু কণ্ঠে সুধা বললে, "কৃষ্ণার একটা হারমোনিয়াম রয়েছে তার উপর জন্ম দিনের নাম করে আবার একটা তানপুরা কিনে দেওয়া, এতে বুঝি টাকা নষ্ট হয় না ?"

"ছিঃ ছিঃ ছিঃ", শঙ্করের কণ্ঠে আক্ষেপ ঝরে পড়ল। নিজের বোনকে তুমি হিংসে করছ ? তুমি খুব ভালো করে জানো, ওকে কিছু দেবার কেউ নেই, ও ভালো গান গাইতে পারে তার জন্য তোমারই নাম করে ওকে একটা তানপুরা কিনে দিয়েছি"—

"হ্যাঁ তোমারই নাম করে", সুধা মুখ বিকৃত করে বললে, "বুঝি গো বুঝি, সব বুঝি, বুঝতে আমার আর কিছু বাকী নেই"—

দুই হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। শঙ্করের মাথায় তখন রোখ চেপে গেছে। কাজেই সে তার কান্নাতে বিচলিত না হয়ে উত্তপ্ত কণ্ঠে বললে, "কি বোঝ তুমি আমায় তা এখনি বলতে হবে"—

হঠাৎ সুধা রেগে উঠে দাঁড়িয়ে দৃঢ়স্বরে বললে, "না বলবো না, আমি কালই চলে যাব কাছে যাবো। এখানে এক দিনও থাকবো না।"

"বেশ ত যাও না", শঙ্কর স্নেষ করে বললে—

"যাবোই ত" বলে সুধা দুমদুম করে পা ফেলে, সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তার গমন পথের দিকে চেয়ে শঙ্কর কিছুক্ষণ বিছানার উপর স্তব্ধ হয়ে রইল। সে কিছুতে বুঝতে পারছিল না, সুধা হঠাৎ কেন এই রকম তার সঙ্গে ব্যবহার করল। আর কৃষ্ণাকেই বা হঠাৎ হীন চোখে দেখছে কেন ? সে যে কৃষ্ণাকে ভালোবাসে, সে তো কিছু নতুন কথা নয় ? সে তো অতি শৈশব থেকে সকলেই জানে সুধাও জানে ; সে ভালোবাসায় ত কোনও কলুষতা নেই ? তবে সুধা তার প্রতি কেন এমন করে কটাক্ষ করল ? ভাবতে ভাবতে তার মাথা গরম হয়ে উঠল, মন হিংস্র হয়ে উঠল, তথাপি ভাবনার কোনও কূল কিনারা খোঁজ পেল না। অবশেষে এক সময় সে শয্যা গ্রহণ করে ক্লান্ত ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল। হঠাৎ শেষ রাত্রের দিকে তার ঘুম ভেঙে গেল, এবং মনে হোল, পিছন থেকে কে যেন তাকে অক্টোপাসের মত জড়িয়ে ধরেছে। চমকে ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসল। সভয়ে চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে চোখের তন্দ্রা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের মধ্যে সে উপলব্ধি করল যে সুধা তার পাশে এসে শুয়েছে। বেচারা বাইরের বারান্দায় শুয়ে ঘুমাবার অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু ভয়ের জন্য কিছুতে তার চোখে ঘুম এলনা। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে অনেকক্ষণ বসে বসে কেঁদে অবশেষে ঘরে ফিরে এসে নিজের শয্যায় প্রত্যহের মত, শঙ্করকে আশ্রয় করে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে তখন ঘুণাক্ষরেও জানতো না যে স্বামীর মনে কিসের আগুন ও নিজের অজ্ঞাতে জ্বেলে দিয়েছে। কাজেই ও শঙ্করের নিদ্রাভঙ্গের কথা জানতে পারল না। অন্ধকারের মধ্যে একটী পরিচিত প্রিয় দেহের স্পর্শ শঙ্করের আজ বৃশ্চিক স্পর্শের মত জ্বালাময় মনে হোল। সে গভীর ঘৃণায় নিজের দেহ বেষ্টিত কোমল তনুলতাটী ঘৃণা নিক্ষেপ করে নিজে সে কক্ষ হতে বেরিয়ে গেল। নীচে বসার ঘরের সামনের বারান্দায় যে সোফাটী ছিল গিয়ে তাইতে ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিল। ভোর হতে তখন বেশী দেরী ছিলনা, পূব আকাশে শুকতারা ঝল ঝল করছে, ঠাণ্ডা বাতাস বইছে, শঙ্কর স্তিমিত দৃষ্টি মেলে শূন্য মনে বসে রইল। মুহূর্তে যেন তার জন্মান্তর ঘটেছে। চোখে সূর্যের আলো এসে লাগতে সুধা ধরফর করে বিছানার উপর উঠে বসল ! ওঃ অনেক বেলা হয়ে গেছে ত ? সে চোখ রগড়ে ভালো করে চারিদিকে চাইতেই দেখল, নবোদিত সূর্য কিরণে সমস্ত ঘরখানি সোণার পাতের মত ঝকঝক করছে। সে শয্যা থেকে নেমে পড়ল। হঠাৎ তার পাশের শূন্য বালিশটী লক্ষ্য করে সে ঘরকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মনে পড়ল গত রাত্রের ঘটনা। যেন বায়োস্কোপের ছবি, একটার পর একটা ভেসে চলেছে তার মনের উপর দিয়ে, সুধার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, লজ্জায় সে চোখ বন্ধ করে ফেলল, সামান্য একটা মতান্তরের জন্য সে কত কটু

কথাই না বলেছে ? মেয়েদের কত সহ্য করতে হয়, কত ত্যাগ করতে হয়, তবেই না সংসার সুখের হয়। শঙ্করের কাছে ত্রুটী স্বীকার না করা পর্য্যন্ত তার মনে কিছুতে শান্তি ফিরে আসবে না। কৃষ্ণা তারই সহোদরা তার উপর নিতান্ত ঈর্ষার বশে অমন হীন মন্তব্য করা তার খুবই অন্যায় হয়েছে। অন্যমনস্কভাবে নানা কথা চিন্তা করতে করতে সে দ্রুতপদে নীচে নেমে একেবারে শঙ্করের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল। একটী ভৃত্য ঘর পরিষ্কার করছিল সূর্য্য তাকে বললে, "বাবু কোথায় রে মদন ?"

"বাবু ত খুব ভোরে বেরিয়ে গেছেন ?" মদন বললে।

"বেরিয়ে গেছেন ?" সূর্য্য যেন আকাশ থেকে পড়ল। বল্লে, "অত ভোরে কোথায় গেলেন, কিছু বলে যায়নি তোদের ?"

"হ্যাঁ মা", মদন বললে, "আমাকে বললেন, তিনি কখন ফিরবেন কিছু ঠিক নেই, তাঁর জন্য যেন ভাত রান্না করা না হয়।

সূর্য্যর মাথার মধ্যে সমস্ত তালগোল পাকিয়ে গেল। অন্যান্য অত্যন্ত আদরে বর্দ্ধিত হওয়ার জন্যই ত একটু জেদী এবং অভিমানী হয়ে পড়েছে বেশী রকমের। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনটী তার ভাবী সরল। কোনও ঘটনাকে সে জটীল করে দেখতে এবং সহ্য করতে পারে না। কাজেই শঙ্করের এই রহস্যময় আচরণের সে কোনও তাৎপর্য্য ধরতে পারলনা। ধীরে ধীরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে স্নানের ঘরে ঢুকল। স্নানান্তে পূজা সেরে যখন চা খেতে বসল, তখন বেলা দশটা বেজে গেছে। পুরানো দাসী কান্দু অনুযোগ করে বললে, "এখন এই রকম অনিয়ম করা কি তোমার উচিৎ বউদি ?" সূর্য্য অপরাধীর মত নত-মস্তকে চায়ের পেয়ালা তুলে মুখে দিল। কান্দু দুই হাত তার মুখের কাছে এনে বললে, "ওকি হচ্ছে ? ওকি হচ্ছে ? আমার মাথা খাও, তুমি শুধু পেটে চা খেওনা, একটা কিছু খাবার খাও। তোমার পেটের মধ্যে একটা জীবের সৃষ্টি হচ্ছে, মা হয়ে তুমি একথা ভুলে গেছো ?"

হঠাৎ সূর্য্যর কি হোল কে জানে ? সে কান্দুর সামনেই ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল। কাঁদতে কাঁদতে বেকাবী থেকে দুটো বিস্কুট তুলে নিয়ে ভেঙে ভেঙে খেতে লাগল। আসলে গত রাত্রির ঘটনার জন্য অনুশোচনায় তার মন জ্বলে যাচ্ছিল।

শঙ্করের এই নীরব উপেক্ষা সে কিছুতে সহ্য করতে পারছে না। মনের এই চরম অবস্থায় কান্দুর স্নেহস্পর্শে তাই সে হঠাৎ অমন বিচলিত হয়ে উঠেছে। কান্দু ত বিস্ময়ে হতবাক্। ওমা একি কাণ্ড গো ? বৌদির চোখে জল ? সূর্য্যর কাছে এসে পায়ের নীচে হাঁটু গেড়ে বসে কোমল স্বরে বললে, "কাঁদছো কেন বৌদি ? কি হয়েছে তোমার আমায় বল ? আমি কাউকে বলবো না ?" সূর্য্য কোনও কথা বললো না, শুধু আঁচলে মুখ ঢেকে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। কান্দু এবার ভয় পেয়ে গেল। সে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, কি জানি বাপু শরীর টরীর খারাপ হোল নাকি ? খোকাবাবুও বাড়ী নেই, যাই ওদের বলি ডাক্তারকে একবার খবর দিয়ে আসুক।"

গমনোদ্যত কান্দুর আঁচল চেপে ধরে হঠাৎ সূর্য্য মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে বললে, "শরীর আমার ভালো আছে, আমার কাছে তুমি একটু বোসো কান্দু পিসি"—অস্থির নিঃশ্বাস ফেলে কান্দু আবার বসল। পিসির সিক্ত স্নেহের মত সূর্য্যর অশ্রুভেজা সুন্দর মুখখানির পানে চেয়ে ব্যথিত স্বরে সে আপন মনে বলতে লাগল, "কি জানি বাপু আমরা বুড়ো মানুষ, তোমাদের রকম সকম কিছু বুঝিনা—এখন কোথায় সব সময় হাসি খুশী মনে থাকবে, তা নয়ত এই কান্নাকাটি—"

সূর্য্যর কি হোল কে জানে ? হঠাৎ সে বলে উঠল, কান্দু পিসি আমি মায়ের কাছে চলে যাবো এখানে থাকতে আমার ভালো লাগছে না"—

"তাইতো গো, মন কেমন করছে ?" কান্দু সহানুভূতিতে গলে গিয়ে বললে, "আচ্ছা খোকাবাবু আসুক আমি বলছি তাকে"—

"বলাবলির কি আছে ?" সূর্য্য বললে, "তুমি আমার বাক্স বিছানা গুছিয়ে নাও, আমি, ঠাকুরপোর সঙ্গে আজই সন্ধ্যেবেলা যাত্রা করবো।"

"ওমা সেকি কথা, দিনক্ষণ না দেখে যাত্রা ?" চোখ কপালে তুলে কান্দু বললে। "তোমায় মিনতি করছি কান্দু

নিশি", সুধা অনুনয় করে বললে, "ওসব আপত্তি তুমি আর তুলো না"—

যতই হোক কাজু ত বেতনভুক দাসী? কাজেই সুধার কাতরতা দেখে, সে নীরবে তার মতেই সায় দিল। একবার শুধু মৃদুকণ্ঠে বললে, "খোকাবাবু যদি আপত্তি করে?"

"আমি এখানে থাকবোনা"—পাথরের মত কঠিন মুখে সুধা বললে। (ক্রমশঃ)

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ

ভারতীয় রমণীর আমেরিকার ডক্টরেট ডিগ্রী :

ডুবাই পত্নিনী এইচ, রামসেষনি নেব্রাস্কা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষা বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি প্রথমে কানসাস্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে শিক্ষা ও পাইয়া অর্থনীতি বিষয়ে এম. এ ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি এখন দক্ষিণ ভারতে ওয়েষ্টোয়ের গার্হস্থ্য বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠায় ব্যাপৃত।

লণ্ডনে তৃতীয় বিশ্ব গার্ল গাইড শিবিরে বাঙালী :

ব্যাডেন পাওয়েল শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৯৫৭ সালে লণ্ডনের উইণ্ডসর গ্রেট পার্কে তৃতীয় বিশ্ব শিবির অনুষ্ঠিত হইবে। ভারত হইতে ২৩ জন গাইড প্রতিনিধি রূপে যোগ দিবেন। তার মধ্যে বাঙলা হইতে ৯ জন যোগ দিতে গিয়াছেন—তাঁহারা শকুন্তলা গুপ্তা, সুচেতা চক্রবর্তী, সি এস রাও, রাধা আগরওয়ালা, মনীষা দাস ও বকুল চক্রবর্তী।

উইম্বলডন টেনিস খেলায় নিগ্রো মহিলা চ্যাম্পিয়ান :

জগৎ বিখ্যাত উইম্বলডন আন্তর্জাতিক টেনিস খেলায় নিগ্রো মহিলা অ্যাইথিয়া গিবসন (Aithia Gibson) চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করেন। তিনিই প্রথম নিগ্রো মহিলা এই খেলায় বিজয়িনী হইলেন। নিউ ইয়র্কের মেয়র এক সভায় লক্ষাধিক নর-নারীর উপস্থিতিতে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জানান। চামড়ার রং প্রকৃত গুণের আদরের বাধা হয় নাই।

আই, এস-সি, পরীক্ষায় কৃতি ছাত্রী :

বর্তমান বর্ষে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আই, এ, ও আই, এস-সি, পরীক্ষায় মহিলাদের কৃতিত্ব খুবই ধারাপ। এক শ্রীমতী মধু সেনগুপ্ত আই, এস-সিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন হাওড়া গার্লস কলেজ হইতে।

ফুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় কেহই প্রথম দশের মধ্যে হইতে পারেন নাই।

রাষ্ট্রীয়পুঞ্জের প্রথম মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান :

বর্তমান বর্ষে রাষ্ট্রীয়পুঞ্জের সামাজিক কমিশনের প্রথম মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। এই প্রস্তাব করেন সুইডারল্যাণ্ড এবং মিশর সমর্থন করেন।

রাণী লক্ষ্মীবাঈ জীবনী :

ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধের গোড়ার শতবর্ষ চলিতেছে। ১৮৫৭ সালেই সিপাহী বিদ্রোহ। এই স্বাধীনতা সংগ্রামের এক প্রধান নেতা রাণী লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন। তাঁহার স্বদেশের প্রতি মমতা, স্বজাতির প্রতি দরদ এবং যুদ্ধে নির্ভীকতা সকল নারী সমাজে আদর্শ। সে জন্যই বিশ্বভারতী হইতে রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব দিবসে রবীন্দ্রনাথের স্বরচিত রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করিয়াছে।

অ-বাঙালী মেয়েদের বাংলা শিক্ষায় অনুরাগ :

সুযোগ সুবিধা পাইয়া বর্তমান কালে ভারতের সর্ব প্রান্তের নর-নারীর যাতায়াত ও বসবাসের সুযোগ হইতেছে। এখন অনেকেই উপলব্ধি করেন যে, পরস্পরের ভাষা জানিতে পারিলে ভাবের আদান-প্রদান এবং স্থানীয় লোকের সহিত ব্যবহারে সুবিধা হয়। সেজন্য দেখা যায় আজকাল কলিকাতায় ও বঙ্গদেশে যাহারা বসবাস করেন তাঁহারা বাঙলা শিখিবার জন্য আগ্রহান্বিত। সেই জন্য দেখা

যার লিখিল ভারত বন্ধচার্য্য প্রসার সমিতির প্রবর্ত্তিত আদ্য-মধ্য-অন্ত পরীক্ষা দিবার জন্য তামিল, মালাবলী, মাদ্রাজী ও ছুছুবাহি মহিলারাও আগ্রহান্বিত। বর্ত্তমান বর্ষে কলিকাতায় ৭ জন এবং কোচিন কেন্দ্রে ২ জন মহিলা পরীক্ষা দিয়াছে। তাহার মধ্যে মিস ফ্রান্সিস মেরন আমেরিকান মহিলাও আছেন। সত অতিরিক্ত বোম্বাই কেন্দ্র হইতে আদ্য পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন—শ্রীমতী মাণিনী কে সাহ (১ম বিভাগ), শ্রীমতী রত্নী এন ত্রিবেদী ও কুমারী নিরু কাটীয়া দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

মার্কিন শিক্ষাব্রতী মহিলার ভারত ত্যাগ :

ডাঃ শ্রীমতী ইসাবেলা থোবর্ণ ১৪ বৎসর লক্ষ্ণৌএ তাঁহার নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত "ইসাবেলা থোবর্ণ কলেজ" এর অধ্যাপিকার কার্য্য করিয়া সম্প্রতি ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। তাঁহার অভাব নারী শিক্ষায় অনেক ক্ষতি হইবে। তাঁহার বিদায় কালে এই কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষা মিস্ কে আরতি বিশ্বাস, ডাঃ শ্রীমতী থোবর্ণের অধ্যাপনার বিশেষ সুখ্যাতি করেন।

নারদা সেবা সঙ্ঘ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধর্ম্মিণী শ্রীশ্রীসারদা-দেবীর নামে কতিপয় শুভচিন্তা মহিলা এই সঙ্ঘটী অল্পদিন হয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার সঞ্চালিকা শ্রীমতী হাকসার (প্রাক্তন রাজ্যপাল ডাঃ কাটজুর কন্যা)। শ্রীমতী শিবানী দেবী এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদিকা। নিষ্ঠা ও পূত ভাবে নারী সেবার কার্য্যে এবং নারীর মানসিক ও আধ্যাত্মিক নির্ম্মলতা রক্ষার সাহায্যে নীরবে কার্য্য করিয়া যাইতেছে। এই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব ও প্রসার জাতির কল্যাণ করিবে। সম্প্রতি এই সঙ্ঘে উড়িষ্যার মন্দির ও শিল্পের আধ্যাত্মিক পরিচালনা বিষয় বক্তৃতা কালে ইহাদের সারদাদেবীর জীবনী পাঠে ও পরমতাত্ত্বিক সঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হই।

সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতি

সমাজ-সেবা শিক্ষা শিবির—১৯৫৭

সরকারের শিক্ষা বিভাগের সাহায্যে এবং তাঁহাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী সরোজ নলিনী নারীমঙ্গল সমিতির পরিচালনায় ২৩।১ বালিগঞ্জ প্লেস রোডস্থ সমিতি ভবনে এক মাসের জন্য ২২শে মে হইতে ২০শে জুন পর্য্যন্ত এক "সমাজ সেবা শিক্ষা শিবির" পরিচালিত হয়। ৪১ জন বয়স্কা শিক্ষার্থী এই শিবির শিক্ষা কেন্দ্রে যোগদান করে। উক্ত শিবির শিক্ষা কেন্দ্র বনগাঁওতে খোলা হইবে স্থির করা হইয়াছিল কিন্তু তথায় কলেরা রোগের প্রাদুর্ভাব হওয়ায় উক্ত কেন্দ্র সমিতি ভবনে খোলা হয়।

প্রাত্যহিক কার্য্যসূচী

ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রাত্যহিক কার্য্যসূচী তৈয়ী করা হয়। ভোর ৫ ঘটিকা হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত শিক্ষার্থীদিগকে নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হয়।

শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক কার্য্যসূচীর অন্তর্গত প্রধান প্রধান কার্য্য ও শিক্ষণীয় বিষয় সমূহ নিম্নে দেওয়া হইল। ভোর ৫ ঘটিকায় শয্যা ত্যাগ, প্রার্থনা ও আরাধনা সঙ্গীত, আত্মীক উন্নতি বিধানের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জ্ঞান দান, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে তথ্যমূলক জ্ঞান দান, এবং কর্ম্মীরা নিজ হস্তে বাসস্থান, তৎসংলগ্ন বারান্দা, নালা নর্দ্দমা প্রভৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করে। পোষাক-পরিচ্ছদ ও শারীরিক পরিচ্ছন্নতার প্রতিও প্রতিটি শিক্ষার্থীকে বিশেষ ভাবে সচেতন করা হয়। মনের শুচিতা বাহিরের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার উপর যে বহুলাংশে নির্ভর করে—শিক্ষার্থীদিগকে তাহা কথায় ও কাজে বিশদরূপে জানান হয়। জঞ্জাল পরিষ্কার ও চুল ও নখ্ কাটা যাহাতে প্রভৃত বিষয়ে কর্ম্মীরা হাতে কলমে জ্ঞান লাভ করে।

শিক্ষা—সাহিত্য, নীতি, ধর্ম, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, খাদ্য ও খাদ্যপ্রাণ সংরক্ষণ, প্রাথমিক চিকিৎসা, রোগী পরিচর্য্যা,

শারীর চর্চা, ব্রতচারী, শিল্প শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সমাজ সেবা ও বয়স্ক শিক্ষা—সমাজ সেবা ও বয়স্কদের শিক্ষাদান বিষয়ে শিক্ষার্থীদিগকে শিক্ষা দান করা হয়।

শিক্ষার্থীদের এক একটি বিভাগ নিকটবর্ত্তী বস্তী সমূহে যাইয়া নিরক্ষর বয়স্কদের শিক্ষা দেয় এবং স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা, গৃহস্থালী প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষা দান করে এবং বস্তীর অনেককে কলেরার টীকা দেয়।

শিল্প শিক্ষা—শিক্ষার্থীদিগকে নিয়মিত শিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়। ১ জন অভিজ্ঞা শিল্প শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ছাটকাট, সূচিশিল্প, প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্যতত্ত্ব—সেণ্টজোন্ এম্বুলেন্স এসোসিয়েশনের কর্মী শ্রীমতি বরুন ব্রহ্মচারী প্রতিদিন প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ে ক্লাস নেন এবং সংক্রামক রোগের টীকা দিবার প্রণালী শিক্ষা দেন।

যাদবপুর কুষ্ঠ টেক্‌নোলজী বিভাগের শ্রীবীরেন্দ্র শ্রীমানী স্বাস্থ্য সংরক্ষণের সহজ প্রণালী বিষয়ে ২ দিন শিক্ষা দেন।

আমোদ প্রমোদ—শিক্ষার্থীদের চিত্তবিনোদনের জন্ত শিক্ষাপ্রদ ভ্রমণ, ছায়াচিত্র প্রদর্শন, ছায়াচিত্রযোগে বক্তৃতা ও নাটকাভিনয় প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। একদিন দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী লইয়া যাওয়া হয়।

চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও ছায়াচিত্রে বক্তৃতা—পশ্চিমবঙ্গ এবং কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের প্রচার বিভাগ হইতে স্বাস্থ্য, জাতীয় উন্নতির ধারা, ও শিক্ষণীয় বিষয়ে মনোজ্ঞ চিত্র ২ দিন প্রদর্শন করেন। সরোজ নলিনী নারী মঙ্গল সমিতির প্রচারক শ্রীজিতেন্দ্র লাল ঘোষ ছায়াচিত্রে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের জীবনী, বয়স্কা শিক্ষা, গৃহচর্য্যা, শরীর পালন, প্রভৃতি বিষয়ে ১ দিন বক্তৃতা করেন।

শিবির শিক্ষা সমাপনান্তে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণীয় বিষয় সমূহের এক পরীক্ষা গৃহীত হয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, জনসেবক, ঐতিহাসিক, যাঁহারা শিক্ষার্থীদিগকে জ্ঞান ও আনন্দ দান করিয়াছেন কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাদের নাম ও আলোচ্য বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাইতেছে—

প্রোঃ প্রিয়রঞ্জন সেন—সমাজ সেবা ও গান্ধিজী।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার রায়—রাশিয়ার অভিজ্ঞতা।

শ্রীমতী কল্যাণী ভট্টাচার্য্য—ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রাম।

শ্রীজনার্দ্দি প্রসাদ সিংহ—সমাজ সেবার কাজ।

শ্রীমতী অঞ্জলি রায়—সমাজ সেবা ও নারী।

শ্রীমতী ইভা ঘোষ—পাশ্চাত্ত্য দেশের নারী।

শ্রীমতী নমিতা রায় চৌধুরী—আদর্শ গৃহিণী সম্বন্ধে শকুন্তলার প্রতি ঋষির উপদেশ।

শ্রীমতী মিনতি সেন—শিবির শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

শ্রীমতী জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—প্রাচীন ভারতের নারী।

শ্রীমতী বিভা মিত্র—সামাজিক শিক্ষা।

শ্রীননীগোপাল গোস্বামী—শিবির শিক্ষাকালীন শিক্ষার্থীদের করণীয় কর্ত্তব্য।

সমিতির অন্তম সদস্য ও সহ-কোষাধ্যক্ষ শ্রীপ্রফুল্ল কুমার রায়—টেলিভিশান যন্ত্র আনাইয়া, ইহার কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলেন এবং যন্ত্রের মাধ্যমে নৃত্য, গীত ও আলোচনা প্রদর্শন দ্বারা সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

শ্রীপূর্ণেন্দু ঘোষ ঠাকুর—মহাভারতে নারীর ধৈর্য্য ও ত্যাগ সম্বন্ধে ২ দিন শ্রীমদ্ভাগবৎ হইতে উপাখ্যান পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

চিত্ত বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদ

১৫ই জুন শিক্ষার্থীরা এক বিচিত্রানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। তাহাতে গান, আবৃত্তি, "কর্ণ মুক্তি" ও "পূজারিণী" অভিনয় করে। উক্ত অনুষ্ঠানে সমিতির সভাপতি শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের উপস্থিতি সকলকে উৎসাহিত করে। তিনি শিক্ষার্থীদের এই শিবির শিক্ষার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া বলেন।

২০শে জুন অপরাহ্ণ শিক্ষার্থীদের বিদায় মুহূর্ত্ত করুণ ও বিষাদময় হইয়া উঠে। এক মাসের ভিতরে তাহারা পরস্পরের সহিত বিশেষ সৌহার্দ্দ্য ও প্রীতির বন্ধনে যে আবদ্ধ হইয়াছিল, বিদায়কালীন বেদনাদায়ক শেষ পর্ব্বটিতে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই অনুভূতির মূল্য অপরিহার্য্য। তরুণীদের সহজ, সরল, মধুর ও কোমল হৃদয়ের পরিচয়ে সকলে মুগ্ধ। তাঁহারা যে আদর্শ এই এক মাসে পাইল, তাহা তাহাদের ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিফলিত করিয়া স্ব স্ব গৃহ ও সমাজকে সুন্দর করিয়া গড়িয়া তুলিবে ইহা আশা করা যায়।

বারুইপুর মহিলা সমিতি

বারুইপুরের উদ্বাস্তু মেয়েদের লইয়া এই সমিতি বিগত ১৯৫৩ সালের ১৯শে আগষ্ট তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়।

এই সমিতিতে নিম্নলিখিত বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে।

১। জাঁতের কাজ, ২। কাপড়ের খেলনা তৈয়ারী, ৩। মজির কাজ, ৪। পশমের কাজ ও সূচীশিল্প, ৫। পাপড় তৈয়ারী, ৬। সূতা কাটা, ৭। চামড়ার কাজ। এই সমস্ত কাজ ব্যতিরেকে মেয়েরা নিরক্ষর বয়স্ক মেয়েদের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

এই প্রতিষ্ঠান হইতে প্রায় ৪০ জন মেয়ে শিক্ষাসমাপনান্তে কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে—এই মেয়েদের মাথা পিছু গড় আয়ের পরিমাণ ১৫।১৬ টাকা হইবে।

গত অক্টোবর মাসে ওয়েলিংটন স্কোয়ারে যে প্রদর্শনী হয় এই প্রতিষ্ঠানের মেয়েরা নিজেরাই পুতুল খেলনা বিক্রয়ের জন্য একটি ষ্টল ভাড়া লইয়া ১৩৫৲ আয় করিয়াছে

অধিকন্তু এই মেয়েরা কংগ্রেসের অনেক সভা সমিতিতে স্বেচ্ছাসেবিকার কাজ ও করিয়াছে।

মোট আয়—২৩০৲ মোট ব্যয়—২৩২৷৶৹

বীণা সেন চৌধুরী, সম্পাদিকা।

সরোজনলিনী কোচিং ক্লাস

এই ক্লাস ১৯৫৪ সনের সেপ্টেম্বর মাস হইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। যাহারা বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠ গ্রহণ করিতে পারিতেছে না, কিন্তু স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিবার জন্য আগ্রহশীল তাহারা যাহাতে স্বল্প সময়ের মধ্যে স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে পারে সে প্রকার শিক্ষাদানের সুব্যবস্থা করিয়াছে। ১৯৫৭ সনের বার্ষিক পরীক্ষায় উক্ত কোচিং ক্লাসের ১০ জন শিক্ষার্থী স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়াছিল। তন্মধ্যে ২জন ২য় ও ৩জন ৩য় বিভাগে মোট ৫ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং একজন কম্পার্টমেণ্টাল পাইয়াছে।

হাল্‌তু ইউনিয়ন মহিলা সমিতি

গত ১লা জুন হাল্‌তু ইউনিয়ন মহিলা সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন গড়চা রোডস্থ সেনপাড়ায় হইয়া গিয়াছে। উক্ত সম্মেলনের সভাপতি মাননীয় স্পীকার শ্রীশঙ্করদাস ব্যানার্জী মহাশয়ের আসিতে বিলম্ব হওয়ায় অস্থায়ীভাবে সভাপতিত্ব করেন এবং সম্মেলনের উদ্বোধন করেন সরোজনলিনী সমিতির অন্যতমা সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা অমিতা চৌধুরী এবং প্রধানা অতিথির আসন গ্রহণ করেন শ্রীযুক্তা সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা' সঙ্গীত গীত হইবার পর সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। ডাঃ শচীন কর সমিতির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্ম্মপন্থা ব্যক্ত করিয়া বক্তৃতা করেন। সমিতির সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা রাধারাণী মুখার্জী বাৎসরিক বিবরণীতে সমিতির অগ্রগতির ইতিহাস বর্ণনা করিয়া সরোজনলিনী সমিতির সক্রিয় সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং আর্থিক সাহায্যের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান। শ্রীযুক্তা সুবোধবালা ঘোষ মহাশয়া সমিতির কর্ম্মতৎপরতা বর্ণনা করিয়া সকলকে সমিতির সহিত যথাসাধ্য সহযোগিতা করিবার জন্য বলেন এবং মহিলাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এইরূপ সমিতির উপকারিতা ও মহিলাদের করণীয় বিষয় সম্বন্ধে একটী সময়োপযোগী ও সুচিন্তিত বক্তৃতা করেন। শ্রীযুক্ত শঙ্করদাস ব্যানার্জী মহাশয় বিশেষ কার্য্যের জন্য আসিতে বিলম্ব হওয়ায় দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সমিতির কার্য্যাবলী ও প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া এবং সমিতিকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া এক বক্তৃতা করেন।

মহিলা সমিতির মেয়েরা সঙ্গীত ও 'চিত্তরঞ্জন' নাটকাভিনয় করে। সভার আগামী বৎসরের জন্য নিম্নলিখিত সদস্যা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া কার্য্যকরী সমিতি ও উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়:—সভানেত্রী—শ্রীযুক্তা ইলা ব্যানার্জী (মাননীয় স্পীকার শ্রীযুক্ত শঙ্করদাস ব্যানার্জী মহাশয়ের স্ত্রী); কার্য্যকরী সভানেত্রী—শ্রীযুক্তা সতিকা মজুমদার; সহ-সভানেত্রী—শ্রীযুক্তা শান্তি মুখার্জী ও শ্রীযুক্তা পারুল মুখার্জী; সম্পাদিকা—শ্রীযুক্তা রাধারাণী মুখার্জী; সহ-সম্পাদিকা—শ্রীযুক্তা বেলা মিত্র, শ্রীপুতুল দাস ও আচার্য্যা শ্রীচারুলতার; সদস্যা—শ্রীযুক্তা আরতি বসু, শ্রীযুক্তা বেলা দাস, শ্রীযুক্তা মায়া মুখার্জী, শ্রীযুক্তা শান্তি পাকুড়ী, শ্রীযুক্তা নীলিমা রাণী চন্দ, শ্রীযুক্তা রাজবালা মালাকার ও শ্রীযুক্তা সুধারাণী গুপ্তা।

উপদেষ্টা পরিষদ—শ্রীযাদব পাকুড়ী, শ্রীঘাষিক মুখার্জী, শ্রীচিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীসুনীল মুখার্জী, ডাঃ শচীন কর, শ্রীকালিপদ রায়, শ্রীশঙ্কর মুখার্জী।

শ্রীবিক্রমজিৎ মজুমদার বি, এস-সি, বি, কম, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট মহাশয় প্রধান হিসাব পরীক্ষক।

শোক সংবাদ

পরলোকে অন্নপূর্ণা গোস্বামী

বিশিষ্টা সাহিত্যিকার জীবনাবসান

প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিকা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোস্বামী ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার চিৎপুরস্থ বাসভবনে ২৭শে জুলাই শনিবার অপরাহ্ণ ৪-২৫ মিঃ সময়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪১ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। তিনি স্বামী, তিন পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন।

বক্ষতে ক্যান্সার হওয়ায় তিনি গত দুইমাস শয্যাশায়ী ছিলেন। তাঁহার স্বামী ডাঃ অবনীমোহন গোস্বামী পূর্ব্ব রেলওয়ের এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জনরূপে বর্ত্তমানে চিৎপুর রেলওয়ে হাসপাতালে নিযুক্ত রহিয়াছেন। শ্রীমতী গোস্বামীর পিত্রালয় কলিকাতাস্থ আলিপুরে। তিনি কলিয়া ফিল্ডসের জেনারেল ম্যানেজার এবং এডভোকেট শ্রীনীতিশ চন্দ্র লাহিড়ীর জ্যেষ্ঠা কন্যা।

বাল্যকাল হইতেই শ্রীমতী গোস্বামীর সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ লক্ষিত হয় এবং পরিণত বয়সে উহার সার্থক প্রকাশ ঘটে। ১৯৪২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শ্রীমতী গোস্বামীকে তাঁহার "এক ফালি বারান্দা" নামক গল্পের জন্য লীলা পুরস্কার প্রদান করেন। ১৯৪৪ সালে আয়োজিত আন্তর্জ্জাতিক ছোট গল্প প্রতিযোগিতায় তাঁহার "স্বপ্ন" নামক ছোট গল্পটী বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।

শ্রীমতী গোস্বামী বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র পত্রিকায় নিয়মিত লেখিকা ছিলেন এবং সেজন্য প্রকৃত যশ ও সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে "তুমি শুধু ছবি", "স্বাগতম্", "তপস্বিনী", "রেল লাইনের ধারে", "নয়া ইতিহাস", "এক ফালি বারান্দা", "মৃগতৃষ্ণিকা", "প্রহরী", "বাঁধনহারা", "এবার অবগুণ্ঠন খোল", "সঙ্গোপনে", পাঠক সমাজে বিশেষ ভাবে সমাদৃত। "নয়া ইতিহাস" পুস্তকখানি ভারত সরকার কর্ত্তৃক গদ্যসাহিত্যের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

তিনি নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন এবং গত বৎসর ইহার কার্য্যকরী সমিতির অন্যতমা সদস্যা নির্ব্বাচিত হন। ভারতীয় মহিলা সংহতির তিনি "লাইফ প্রেসিডেন্ট" ছিলেন এবং মহিলা সংগঠনী "দেবী আসরের" উপদেষ্টা মণ্ডলীতে ছিলেন। এই সূত্রে সমাজ-সেবামূলক বহু কার্য্যের সঙ্গে তাঁহার আন্তরিক যোগ ছিল। তিনি সুবক্তাও ছিলেন। রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় তাঁহার সর্ব্বশেষ রচনা দুইটী অনুপম কবিতা "অগ্রণী" ও "মাসিক বসুমতীতে" এই মাসে প্রকাশিত হইয়াছে।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতি এবং সমিতি পরিচালিত "মঙ্গলঘট" পত্রিকার সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। "মঙ্গলঘট" পত্রিকার নিয়মিত লেখক লেখিকার চিতরে তিনি অন্যতমা ছিলেন। "মঙ্গলঘট" পত্রিকার সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে শ্রীমতী গোস্বামীর মূল্যবান রচনা বহুলাংশে সাহায্য করিয়াছে। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সমিতি গভীর শোক প্রকাশ করিতেছে এবং তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করে।

নিমতলা শ্মশানে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁহার প্রতি শেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্য শ্রীযুক্তা লীলা রায়, ডক্টর অতীন্দ্রনাথ বসু, শ্রীসুনীল দাস এম-এল-এ, ডক্টর নারায়ণী বসু প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

পরলোকে সুলাজিনী ঠাকুর

রবেন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয় ছিলেন কলিকাতার বিখ্যাত দর্পনারায়ণ ঠাকুরের বংশধর। তিনি মেয়েদের সাহিত্য সাধনায় উৎসাহ দিবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার কন্যা লীলা দেবীর স্মৃতিতে—"লীলা লেকচার" ও "লীলা পুরস্কার" প্রবর্ত্তন করিয়া যান। লীলা পুরস্কার প্রতি দুই বৎসর অন্তর বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখিকাকে প্রদত্ত হয়।

তাঁহার সহধর্ম্মিণী সুলাজিনী দেবী এই মেয়েদের সহিত সাধনায় উৎসাহ দিবার জন্য সতত তাঁহার স্বামীকে অনুপ্রাণিত করিতেন। সেই স্নেহশীলা মহিলা ৭৮ বৎসর বয়সে তাঁহার সুবৃহৎ আলিপুর টেরেসের বাসভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। সর্ব্বমঙ্গলময় বিধাতা তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন।

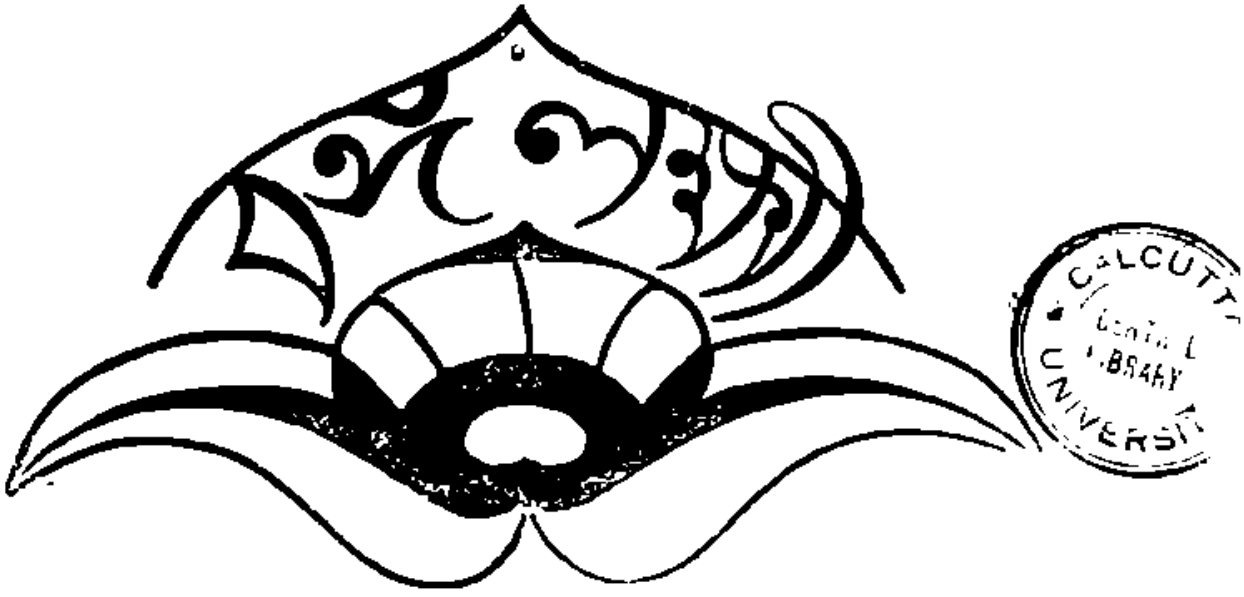

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৪র্থ সংখ্যা] কার্ত্তিক ১৩৬৪ [৩২শ বর্ষ

বোধন

সর্বমঙ্গলা মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে,
শরণ্যেত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে।

বৈদিক যুগ থেকে এই জগন্মাতার পূজা সমগ্র আর্যভূমিতে পূজিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর অন্য কোনও দেশের ধর্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের এরূপ মাতৃভাবের পরিচয় পাওয়া যায় না। এই বিশ্বপ্রসবিনী মহামায়া নানাবিধ মূর্তিতে, ভক্তবৃন্দের গৃহে গৃহে এবং আসমুদ্র হিমাচলের তীর্থস্থান সমূহে আজও পূজিতা। ইনি এক হয়েও দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি বহুনামে ও মূর্তিতে মানুষের মনস্কামনা পূর্ণ করছেন।

বৈদিক যুগে ভারতবাসী আর্য ঋষিদের মধ্যেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ১২৭তম সূক্তকে দেবী সূক্ত বলা হয়। ১২৭তম সূক্তটী রাত্রি সূক্ত নামে প্রসিদ্ধ। কারণ এতে রাত্রিদেবীর পূজা বর্ণিত আছে। বৃহদ্দেবতা নামক বৈদিক দেবব্যাখ্যা গ্রন্থে রাত্রিদেবীকে বাক্, সরস্বতী, অদিতি ও দুর্গাদেবী বলা হয়েছে। এই রাত্রিদেবী পরে কালী নামে প্রসিদ্ধা হয়েছেন। ভদ্রকালী নামটী শাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্রে আছে এবং ভবানী দেবীকে বলিহরণ দেবার ব্যবস্থা হিরণ্যকেশী গৃহ্যসূত্রে পাওয়া যায়।

দুর্গার নাম কাত্যায়নী হয়েছে, কারণ পুরাণে বর্ণিত আছে: মহর্ষি কাত্যায়ন নামে একজন মুনি হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করতেন। একদিন ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর তাঁর আশ্রমে এসে মহিষাসুর বধের জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে নিজ নিজ দেহের শক্তিতে এক দেবীকে সৃষ্টি করলেন। সেই সেই দেবীকে মহর্ষি কাত্যায়ন প্রথমে পূজা করেন। আর সেইজন্য দুর্গার নাম কাত্যায়নী হয়েছে। সেই দুর্গাদেবী আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে উদ্ভূতা হয়েছিলেন এবং শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমীতে কাত্যায়নের দ্বারা পূজিত হয়েছিলেন এবং দশমীতে তিনি মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন। দুর্গাদেবী ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের শক্তি থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন বলে তিনি ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী শক্তিরূপিণী দুর্গার অপর এক নাম নারায়ণী। অর্থাৎ শেষ নাগ শয়নশায়ী নারায়ণের অংশ যোগনিদ্রারূপিণী মহামায়া আদ্যাশক্তি। নমঃ শান্তি নমঃ শান্তি নমঃ শান্তি।

"পল্লী শিল্পের উন্নয়নে"

শ্রীনমিতা রায় চৌধুরী

"এক বস্তু থেকে বা একাধিক বস্তুর সংযোগে মানুষের প্রয়োজনীয় অন্য বস্তু উৎপাদনের নাম শিল্প। স্বভাবজাত বস্তুর সংগ্রহ—যেমন খনি থেকে কয়লা তোলা শিল্প নয়, কৃষিকর্ম এবং মাছ ধরাকেও শিল্প বলা হয় না,- কিন্তু ধান থেকে চাল তৈরী, তুলো থেকে সুতো শিল্প।"

যে শিল্প পল্লীবাসী গৃহস্থের কুটিরে নিষ্পন্ন হয়, যার উপর নির্ভর করে কোনও ব্যক্তি বা কোনও পরিবার সহজে স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে নিতে পারে তাকেই কুটির শিল্প বলে। এই কুটির শিল্পই ব্যাপক অর্থে—পল্লীর শিল্প। কুটির শিল্পের ধারা যে সমৃদ্ধি ও অর্থ তা ছড়িয়ে দেয় দূর দূরান্তরে পল্লীর ঘরে ঘরে। পল্লীর শিল্পই জাতীয় ভাবধারা ও সমৃদ্ধির পরিচায়ক।

বাঙলার শিল্পের আদর্শকে লক্ষ্য করেই গুপ্ত ও বর্ধ অনুশাসনে বৈদিক যুগে জাতি বিভাগ হয়েছিল। প্রত্যেক গ্রামে এক একটি শিল্প নিয়ে এক একটি সম্প্রদায় (যেমন কাঁসারী, শাঁখারী, মালাকার, কুম্ভকার) গড়ে উঠেছিল। গ্রামবাসীগণের সহযোগিতায় ও সাহায্যে এই সব শিল্পীরা তাদের নিজ নিজ শিল্পে জন্মগত সংস্কার ও অধিকার নিয়ে বড় হ'ত এবং শৈশবকাল হতে কোনও শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় সে সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান সহজ স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পেত। ভারতবর্ষের পল্লীতে পল্লীতে আজও তাই কামার, কুমার, ধোপা, নাপিত, জালুয়া, ছুতার, চামার প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির লোক আছে।

কৃষিই বাংলার প্রধান সম্বল বটে কিন্তু একমাত্র অবলম্বন নয়। কৃষির পাশে পাশে শিল্পের প্রসার ও প্রাচীন যুগ থেকেই আছে।

"বাঙালীর আহার হতেই শিল্প সাধনার শুরু রান্নার ব্যাপারে এত পরিশ্রম খুব কম দেশেই করে, নিরামিষ রান্না ও মাছ রান্নার বৈচিত্র্যে বাঙালী সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু এর ব্যবসায়ে শত মূল্য নেই বললেই চলে। বাঙালীর তৈরী রসগোল্লা, সন্দেশ, রাবড়ী ইত্যাদির যে স্বাদ তা অপূর্ব। এর মূল্য এবং মানও যথেষ্ট। কিন্তু টিনে প্যাক করে তা পৃথিবীর লোকের স্বাদ গ্রহণ করানো এবং তার দ্বারা বাইরের লোককে বশীভূত করা বাঙালীর শক্তির বাইরে।" এইখানেই পরিবর্তন আবশ্যক। তাই রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন—

"ময়রারা সন্দেশের সঙ্গে কল মেশাতে শিখলো না কেন? পিঠেপুলি গ্রামে এখনও দেখা যায় কিন্তু শহরে প্রায় অন্তর্হিত হয়েছে, কারণ মেয়েদের ফুরসৎ নেই। অথচ খাবার লোভ কারও কমে নি। ময়রা যদি জলখাবার ছিসাবে পিঠে পুলি তৈরী করে, তবে ক্রেতার অভাব হবে না। শুধু পৌষ পার্বণে নয়, বারো মাসেই ব্যবসায় চলতে পারে।" খাদ্য যদি নূতন ধরনের হয় এবং ভাল হয় তবে ক্রেতার অভাব কখনই হয় না। এবং একাজে মেয়েদের সক্রিয় যোগদান ও সম্ভব হবে।

খাদ্যের পরেই বস্ত্রের কথা। কাশ্মীরী শালের বা বেনারসী শাড়ির কারুকার্য খুব সূক্ষ্ম হতে পারে কিন্তু প্রাচীন যুগের জীবন শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নক্সা কাঁথা ক্ষেত্র বিশেষে কাশ্মীরী শালের কারুকার্যকে হার মানায়। ঢাকার মসলিন তো এখন গল্পে পরিণত হতে বসেছে। কিন্তু বাঙালীর তাঁতের শাড়ি - শান্তিপুর, বিষ্ণুপুর, করাসডাঙার কাপড়ের কাছে অনেক কাপড়ই দাঁড়াতে পারে না। শ্রীনিকেতনের শাড়ীর সৌন্দর্য্য ভারতের মন জয় করেছে।

রূপ পিপাসু বাঙালী শিল্পী তার স্বভাব নিজ সৃষ্টির আনন্দ নিয়ে শাড়ির পাড়ে ও আচলার চিত্র নৈপুণ্যে যে সুকুমার শিল্পী মনের পরিচয় দেয় তা অপূর্ব। তাঁতীরা নিজ নিজ রুচির দ্বারা ক্রেতার স্পৃহাই শুধু তৃপ্ত করে না। নিজেদের মনের তৃপ্তিও সাধন করে। শুধু শাড়ি নয়—জামার কাপড়, পরদা, টেবিল ও বিছানা ঢাকনা ও কাড়ন ইত্যাদির ভিতর দিয়ে তাঁতীরা যে শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে ক্রেতার তৃপ্তি সাধন করে থাকেন তা সত্যই প্রশংসনীয়। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সৃষ্টি করবার ইচ্ছা, সৃজন ক্ষমতা কিছু না কিছু থাকে—কুটির শিল্পের মাধ্যমে বাঙালী শিল্পীর সেই ইচ্ছা ও ক্ষমতার পূরণ হয়েছে। কলে ইচ্ছা করলেই ফরমাস অনুযায়ী কিছু করা চলেনা সেটা সময় সাপেক্ষ। হস্তশিল্প নানারকম কারুকার্যদ্বারা মানুষের

অবিলম্বে বশ করতে পারে—এই খানেই কুটির শিল্পের জয়। মিলের কাপড়ের তুলনায় তাঁতের কাপড় বেশী মজবুত, সূক্ষ্ম কারুকার্য্যযুক্ত ও সৌখীন। তাই সৌখীন নর নারীর নিকট তা খুবই আদরের বস্তু। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে যে এই শিল্পটি বেঁচে আছে,—এ একটা বড় কারণ। তাই যদি শিক্ষিত সুরুচি সম্পন্ন লোকেরা নিজ নিজ পরিকল্পনা অনুসারে তাঁতীকে কর্মদাস দেন এবং আর্থিক দায়িত্ব নেন, তবে তাঁত শিল্প উত্তোত্তর উন্নতি লাভ করবে। বর্ত্তমানে সরকার এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন—তাই তাঁত শিল্পকে হস্তের ব্যায়াম, অধ্যবসায়, বুদ্ধি বৃত্তির অনুশীলন ও রুচি-জ্ঞানের সম্পূরক বলে অভিহিত করেছেন। সরকারের সম্পূর্ণ হস্তক্ষেপের ফলে অদূর ভবিষ্যতেই তাঁত শিল্প পুনরায় পূর্ব্ব গৌরব ফিরে পাবে তা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

আজকাল চটের আসন, সতরঞ্চি প্রভৃতি ও কলে হচ্ছে, এই শিল্প পূর্ব্বে পল্লীতে পল্লীতে স্ত্রী-পুরুষের একচেটে ছিল—অবসর সময়ে মেয়েরা এখনও এই কাজ হাতে করতে পারেন। কলের তুলনায় একটু দাম বেশী হতে পারে কিন্তু সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্যের জন্য নিশ্চয়ই ভাল দাম পাওয়া যাবে। আজকাল শুধু শিক্ষিত মেয়েরাই বেকার নন, অশিক্ষিত গৃহস্থ মেয়েরাও বেকারের সারিতে এসেছেন—প্রত্যেকেই সম্মানজনকভাবে কিছু রোজগার করতে চান। বস্ত্রশিল্পে মেয়েরা প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের নিয়োগ করতে পারেন না,—এই সব পল্লী শিল্পের মাধ্যমে তাদের শ্রমশক্তি দেশের সম্পদ সৃষ্টির সাহায্য করতে নিশ্চয়ই পারবে।

নিত্য প্রয়োজনীয় প্রত্যেক জিনিষ এই শিল্প প্রচেষ্টার ফল। এই সব জিনিষকে সুন্দর করে তোলার কৃতিত্ব ও বাঙ্গালী শিল্পীরই প্রাপ্য। ইস্‌লামপুর-বাগআঁচড়ি ও বহরমপুর-খাগড়াই কাঁসা পেতলের বাসন যেমন মজবুত তেমনি সুন্দর। মুর্শিদাবাদের হাতীর দাঁতের তৈরী জিনিষপত্রের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মাটীর তৈরী জিনিষে বাঙ্গালী কুম্ভকারের পটুতা অসাধারণ। কৃষ্ণ নগরের পুতুল বিশেষভাবে দর্শনীয়। মাটির হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি রান্নার জিনিষ বাঙ্গালীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য কিন্তু আজকাল আলুমিনিয়াম, চিনামাটি ও কাঁচের পাত্রের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় কাসার বাসন এবং মৃৎশিল্পের মূল্য ও মান দুইই কমে গেছে। তাঁত শিল্পের সম্প্রসারণ এবং উন্নতির জন্য সরকার যে ভাবে সময়োপযোগী ব্যবস্থা করেছেন—আলুমিনিয়ামের উপরেও যদি অনুরূপ ব্যবস্থা হয় তবে কাঁসা পিতলের বাসন ও পূর্ব্বের ন্যায় চালু হবে আশা করা যায়। এ ছাড়া যুগবিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই সব বাসনের ও কিছুটা পরিবর্ত্তন দরকার। কাসার বাসনের গড়ন নিখুঁত করতে হবে, বাসনের পালিশ সুন্দর করতে হবে, যাতে অসমান না থাকে, ঠিক মত মাপ আকার ইত্যাদি কতকগুলি বিষয়ের দায়িত্বে পরিবর্ত্তনের দ্বারা এই শিল্পের পুণরুদ্ধার এবং উন্নতি সম্ভবপর।

বাঙ্গালীর শিল্পপ্রসাদের মূল প্রেরণা যোগায়ে বাঙ্গালীর সুকুমার শিল্পীমন। বাঙ্গালীনৃপতির মন্দির ও গৃহ নির্ম্মাণ প্রণালী আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল, মাটি ও খড়ের ঘর সমগ্র ভারতে প্রশংসনীয়। বাঙ্গালীর সমাজ-জীবনে বাঙ্গালী তার শিল্পী মনের পরিচয় দিয়েছে। মৃৎশিল্প, বাদ্যশিল্প, কুসুম শিল্প, আলপনা, চিত্র, সোনার কাজ আরোও কত শিল্প বাঙ্গালী স্বতঃস্ফূর্ত, স্বাভাবিক ভাবেই করে এসেছে। বাংলার তাম্র-লিপ্ত ছিল তখন ভারতের বৃহৎ বাণিজ্যকেন্দ্র, বাঙ্গালীর শঙ্খ শিল্প ও সূচী শিল্প সমগ্র পৃথিবীর ছিল বিস্ময়ের সামগ্রী।

পরিশেষে একথা বলাই বাহুল্য যে বিক্রয়ের ব্যবস্থার উপরই প্রত্যেক শিল্পদ্রব্যের উন্নতি অবনতি নির্ভর করছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হতে পল্লীর শিল্পের উন্নতিকল্পে বিভিন্নপ্রদেশে শিল্প বিদ্যা-শিক্ষালয়, শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছে - বর্ত্তমানে তো এদিকে বিশেষ নজরই দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তথাপি প্রস্তুত দ্রব্য সম্বন্ধে বিশেষ কোন ব্যবস্থা এখনও চালু হয়নি। কলকাতা এবং বড় বড় কয়েকটি সহরে গভর্ণমেণ্ট চালিত কো-অপারেটিভ ষ্টোর্স আছে—সেগুলি আরও বাড়াতে হবে। বিভিন্ন স্থানের শিল্প সামগ্রী এক জায়গায় বিক্রয় করবার ব্যবস্থা করতে হবে।

একথা নিশ্চয়ই আমরা বুঝি যে শিল্পীর অভাবে এদেশের কুটির শিল্প ধ্বংস হয়নি। শিল্প দ্রব্য কাটতির অভাবেই শিল্পীরা ধ্বংস হয়েছে। যে কোন কুটির শিল্পে কাটতি আরম্ভ হলেই আপনা থেকেই সুদক্ষ শিল্প গড়ে ওঠে এর জন্য অনেক সময়ই শিল্প শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয় না—অবশ্য এগুলি যে সহায়ক তাতো বটেই। এ ছাড়া জনসাধারণের মনে যাতে স্বদেশের শিল্পজাত দ্রব্যের রুচি ফিরে আসে সেজন্য নূতন ভাবে প্রেরণা দেওয়া দরকার!

প্রাচীন বাংলার শিল্পীরা জীবনের সর্ব্ববিধ ক্ষেত্রে যে প্রতিভার স্বাক্ষর দিয়েছেন তা আজ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিপর্য্যয়ে ম্লান হয়ে আছে কিন্তু এ সমস্ত বাধাবিপত্তি কাটিয়ে যদি বাঙ্গালী শিল্পীরা আজ জননায়ক গণের সহযোগিতায় সরকার কর্ত্তৃক বিভিন্ন পরিকল্পনার মারফৎ একটা সুসমঞ্জস সমন্বয় সাধন করতে পারেন তবেই শিল্পীরা আবার ফিরে পাবেন নিজেদের পূর্ব্ব সম্পদ ও পূর্ব্ব গৌরবের আসন। (বেতারে পঠিত)

॥ অস্ত্রোপচার ॥

শ্রীমতী পুষ্প দেবী

বড়কাকার টনসিল অপারেশান হবে। বয়সটা প্রায় পেরিয়ে গেছে। ওর বছর বয়সে টনসিল অপারেশান বড় শোনা যায় না। এক বছর ধরে সময় গণনা করে শুভলগ্নে দিন তো ঠিক হলো। মেডিকেল কলেজে কটের নোয়া হল। অপারেশান কর্জেন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক সভাবান রায়। আমি ছিলুম শ্বশুর বাড়ীতে অপারেশানের আগের দিন গেলুম। গিয়ে দেখি বাড়ীশুদ্ধ বউ, ঝিরা সবাই কটেজে চলে গেছে। বাড়ীতে রইল মধ্যে শুধু বড়কাকা। সংসার নিয়ে রীতিমত বিব্রত। ঠাকুর বলছে আজ বিকেলের জলখাবার কি হবে? কি বলছে খোকা অনেকক্ষণ ধরে আছে কাকাবাবু কাপড়গুলো লিখে দিন্। এধারে কাকার বিখ্যাত বায়নাধরা মেয়ে মুকুল তার স্বভাবসিদ্ধ সুরে একটানা কেঁদে চলেছে "লিচু খাব"। বিব্রত হয়ে কিকে বল্লুম ধোপার খাতা কোথায় আছে দাও আমি কাপড় লিখে দিচ্ছি, তুমি মুকুলকে একটু ভোলাও দেখি। বড়কাকা বললেন লিচু তো আজ অনেক এনেছি পাওনা মুকুলকে। বুকলুম বাজারের বরাতটও বড়কাকার ওপরে দিয়ে চাকর অপারেশানের কাজে লাগানো কর্ত্রী গৃহিণীদের অনুসারী হয়েছে। ঝাঁড়ার থেকে লিচু এনে দিতেই মুকুল চোখ বুঁজে হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার জুড়ে বলে "এ লিচু নয় যে লিচু চলে গেছে আমি সেই লিচু খাব—যে লিচু কোথাও নেই আমি সেই লিচু খাব"। বুকলুম পথে কিরিওলা লিচু নিয়ে যাওয়ার এই বিভ্রাট।

এমন সময় পিসীমার বাড়ীর ঠাকুর এল। একথালা রান্নাবরতী নিয়ে। পিসীমা বড়কাকার প্রিয় খাবারটি করে পাঠিয়েছেন। এধারে ডাক্তাররা লিকুইড ডায়েটে থাকতে বলেছেন কাটার অন্তত ঘাইয়ে। বড়কাকা সতৃষ্ণ নয়নে রান্নাবরতীর দিকে তাকিয়ে বলেন কি বলিস্ পুষ্প, রান্না-বরতীটা একটু গুরুপাক হবে না? পিসীমার অনেকদিনের ঠাকুর সে বলে "মা বলে দিয়েছেন তুমি সামনে দাঁড়িয়ে সব খাবারে খাইয়ে তবে আসবে"। এমন সময় এল কাকীমার বাপের বাড়ীর পুরাণো ঝি। হাতে এক জামবাটি পায়েস। বলে—"মা নিজে হাতে করে ছানার পায়েস করে দিয়েছে—বাড়ীর গরুর দুধের। ডাক্তার নাকি জামাইবাবুকে শক্ত কিছু খেতে মানা করেছে তাই।" সভয়ে সেই বাড়াই সেরি পায়েসের বাটীর দিকে তাকাই।

এমন সময় আসে ছোট ঠাকুমার ছেলে হাত হাতে তার যাদবের ফুলুরী। গোপনে বলি বর্ষিয়সী মহিলা অসম্ভব কৃপন অথচ তাই বলে যাবা দেখাতেও পেছপাও নন্। হাত বলে "মা বল্লেন বড় খোকা আমার হাতের ফুলুরী খেতে বড্ড ভালোবাসে, তুই সময় গরম খাইয়ে আয়। তুই এলে আমি পুজোয় বসবো।" বলা বাহুল্য বেগুনীগুলি মোকামের কিন্তু ছোট ঠাকুমার স্নেহ বচন মনে করে বড়কাকা সাশ্রুনয়নে বেগুনী খেতে আরম্ভ করেন। আমি আর বসে থাকতে ভরসা পাই জানিনা আর কতো অঘটন দেখতে হবে?

পরদিন শুনি বিষম বিভ্রাট, পিসীমা জানতো না যে বড় কাকার জন্যে কটের নোয়া হয়েছে। পরদিনই বাড়ীর পুরাণো ঠাকুর মাথাকে নিয়ে তিনি গেছেন মেডিকেল কলেজে। অপারেশান থিয়েটার থেকে এক মুসলমান ভদ্রলোককে অপারেশান করে ঘরে আনা হচ্ছে এমন সময় "হায় গো" বলে পিসীমা আছাড় খেয়ে পড়েন। পিসীমার মেয়ে সীতা বলে, "আচ্ছা মা, অমন দাড়িওলা মেরেও তুমি চিনতে পারলে না যে ও মুসলমান।" পিসীমা বলেন, "তখন কি আর আমার মাথার ঠিক ছিল? না কেঁদে কেঁদে চোখেই কিছু দেখতে পেয়েছি?"

দুপুরে বড় কাকাকে দেখতে যাই। দেখি ঘর লোকে লোকারণ্য বড় কাকাকে ঘুমের জন্য অষুধোপোন ইনজেক-শান দিয়েছে। মাসী, পিসী, মেজিমার দল পাঁচ মিনিট অন্তর বলছেন, "হ্যাঁ বাবা, কষ্ট একটু কমলো?" তন্দ্রা দেখলে মাথা ঘরে ঝাঁকি দিচ্ছেন "একি বাপু, যেন

আবিষ্টের মতো মনে হচ্ছে? জ্ঞান নেই নাকি?" মাথার কাছে ইউরোপীয়ান নার্স হতাশ মুখে চেয়ে বসে থাকে।

এমন সময় আসেন বড় কাকার শাশুড়ী। হাতে পুজোর বাতাসা, তুলসীপাতা নিয়ে বলেন হাঁ করতো বাবা? গলায় সদা কত স্মরণ করে নার্স তার হাত ঠেলে সরান। চিৎকার করে কেঁদে ওঠেন তন্ত্রমহিলা। বলেন "একি অলক্ষুণে কাণ্ড বাপু? বিচ্ছি নারায়ণের তুলসী আর দুই কিনা বেজাতের মেয়ে আমার হাত ঠেলে ফেলি? মাইনে করে রেখেছে তোকে হাওয়া করতে, সা টেপ্, তা নয় যত সব আদিখ্যেতা—মুখে খানে দেও—বেরো বাপু তোরা বড় বড় গলা শুনোর খেয়ে ভূত ভাগাচ্ছিস আর এই একরত্তি তুলসী পাতায় যত দোষ?"

তাঁর স্ত্রী, কল্যাণের মিনি বলেন "যা বলেছ মিনি, ঝাঁটা মেরে দূর কর মাগীকে।" ঘরে সহসা নিস্তব্ধতা নেমে আসে। বড় কাকা অস্ফুট স্বরে দুজনকেই থামতে বলে। মেম নার্স খট্ খট্ করে বেরিয়ে যায়। আমি হতাশ হয়ে চেয়ে থাকি।

মৃত্যু যদি আনে অমৃত আলোক—তবে তাই হোক

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী

বছর বছর আগের কথা। একখানা চিঠি পেলাম। প্রতিদিন কত চিঠিই আসে আমার কাছে—কখনও কখনও তার বোঝা ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে কিন্তু চিঠি পড়াও আমার একটা কাজ। সেদিন এলো মাত্র একখানা চিঠি—যা সাধারণতঃ হয় না। আজ বোঝা অনেক হাল্কা তাই মনটাও হাল্কা হয়ে উঠলো। চিঠিখানা খুলে দেখলাম অজ্ঞাতের হাতের লেখা কিন্তু একেবারে অপরিচিত—মামুলী চিঠি—যেমন সম্পাদকের কাছে ভাসাভা আসে গল্প প্রেরকের। আমি তখন ছোটদের মাসিক 'রং মশাল' এর দু'টো বিভাগ পরিচালনা করি। গল্প বৈঠকের জন্য যে গল্প এসেছিল তার সংবাদের জন্য লেখিকার তাগাদা। চিঠির শেষে গল্প লেখিকার নাম—অন্নপূর্ণা গোস্বামী। এই চিঠির মাধ্যমে পরিচয় এবং প্রথম পরিচয়।

তারপর আরো লেখা দেখেছি, পড়েছি—কিন্তু লেখিকার সঙ্গে চোখের দেখা তখনও হয় নি। বহুর চার পরে একদিন কোলকাতা বেতার কেন্দ্রের সাহিত্য সভায় দেখা ও আলাপ হলো—এই দ্বিতীয় পরিচয়।

লম্বা পাতলা মানুষটী; মাথায় ঘন অবগুণ্ঠন—বক্তৃতা শেষে আমার কাছে এসেই বসলেন—আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগলেন। বেশ লাগলো এই সহজ সরল মানুষটিকে মনে হলো অনেকদিনের পরিচয়।

এরপরে অনেকবার দেখাশুনা হয়েছে, পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ হয়েছে। 'নন্দন' (শিশু-কিশোর প্রতিষ্ঠান) এর কাজে উৎসবে, খেলাধূলায়, শিকনিকে সব সময় আমরা একসঙ্গে মিলেছি—যখনই ডাক দিয়েছি, এসেছেন উৎসবে অংশ গ্রহণ করেছেন। প্রতি বছরের নন্দনের একদিনদিন উপলক্ষে বছরের প্রতিদিনই কাজের অংশ গ্রহণ করতেন। অনেক সাহিত্যসভাতেও আমরা মিলেছি। এছাড়া আমরা সকলে মিলে (সাহিত্যিক বন্ধুরা) একটি মহিলা সমিতিও (লেখী আসর) স্থাপন করেছিলাম তার একটা বিশেষ অংশের ভার ছিল তাঁর উপর। এইরকম করে দিন কাটছিল, হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম দু'জনে দু'জনের অনেক কাছে এসে পড়েছি আর সেই সেতু নির্মাণ করেছে তাঁর ছোট্ট মেয়ে অলকানন্দা।

ছোটদের ভালবাসি, তারা আমার বন্ধু সেইজন্যই বোধ হয় মায়ের সঙ্গে মেয়েটিও আমার বন্ধু হয়ে গিয়েছিল।

আমার মনে হয় ছোটদের জন্য তিনি কলম ধরেছিলেন আমারই আগ্রহে। আমার সম্পাদনার প্রতি বৎসর যে ছোটদের বার্ষিকী 'সাত সমুদ্দুর' প্রকাশিত হয়—তার সুরু থেকেই তিনি লিখেছেন তাতে—এবং পরে অবশ্য আরো অনেক কাগজে লিখেছেন ছোটদের জন্য।

বেশ কাটছিল সুখে দুঃখে। হঠাৎ একদিন খবর পেলুম অসুস্থ হয়েছেন, শয্যাশায়ী। মাঝে আবার খবর পেলুম একটু ভাল। এইভাবে একটা বছর কোন কাজ-কর্মের ভাঁজে চলে গেল। দেখা হলো আবার সেক্রেটারিয়েটের বেঞ্চিতে।

বড্ড রোগা দেখলুম। ছেলে, মেয়ে, মা, স্বামী, সবাই ঘিরে রয়েছেন—যেন সোনার সংসারের একটি দৃশ্য। অনেক গল্প হলো। ভাল হয়ে উঠলে আবার পূর্বোদ্যমে কি কি কাজ হবে তারও একটা ছোট খাট খসড়া তৈরী হয়ে গেল। তাঁর মা তখন বলছেন 'বেশী কথা বলে আবার শরীর খারাপ হবে।' কিন্তু অনেকদিন পরে দেখা হওয়ায় পর রুদ্ধ বাক্যস্রোত বন্ধ হতে চায় না।

চলে আসবার সময় বলুম: আবার আসবো অন্নপূর্ণাদি, আপনি তো শীগ্‌গীর বাড়ী যাবেন, ডাক্তার সোবামী (ওঁর স্বামী) তাই বলছিলেন। মৃদু হেসে ঘাড় নাড়িতে চোখ বন্ধ করলেন।

সেদিন ছিল রথযাত্রা। পথে বেরিয়ে দেখলাম আশুতোষ কলেজের সামনে একদল ছেলেমেয়ে মহা উল্লাসে রথ টেনে নিয়ে চলেছে।

গাড়ীতে উঠে ভাবলাম: ভাল হয়ে উঠুক বেচারী, তাঁর সংসার, তাঁর বাইরের জগৎ, সাহিত্য সাধনা, সমাজ সেবা—এইসবের মধ্যে দিয়ে তাঁর জীবন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠুক।

সাধারণতঃ বাঙালী মেয়ের জীবন হয়ে থাকে মামুলী ছক কাটা। একটা নির্দিষ্ট বয়সে বিয়ে, ছেলে মেয়ে সংসার প্রতিপালন—তারপর গতানুগতিক ভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে—নতুন কিছু করবার উৎসাহ হারিয়ে যায়। অন্নপূর্ণাদি সংসারের মধ্যে থেকেও সাহিত্য সাধনাকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। কর্মক্ষেত্র শুধু সংসারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি, বাইরের জগতে তা পরিব্যাপ্ত হয়েছিল—এইখানেই তাঁর জীবনের সার্থকতা। আরো সার্থক হতে পারতো তাঁর সাধনা—কিন্তু তা হলো না।

দিন পনেরো পরে টেবিলে বসেছি এক রাশি কাজ নিয়ে—মুখ নীচু করে লিখেই চলেছি—এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো: "আমি অন্নপূর্ণাদি বলছি"—মনে হলো কণ্ঠস্বর কান্নায় ভেজা: 'মা চলে গেলেন ইন্দিরাদি!'

অনেকক্ষণ টেলিফোন হাতে বসে রইলাম, কথাটা যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না, কিছু বলতেও পারছিলাম না।

ক'দিন পরে একটি ছাপা চিঠি এলো—শ্রাদ্ধবাসরে উপস্থিত থাকা চাই—ভাগ্যহীন অরুণদীপ্তি, অর্ঘ্যপ্রসূন, অগ্নিজ্যোতি, অনঙ্গমঞ্জরী।

চোখের সামনে ভেসে উঠলো কুড়ি বছর আগের একটি চিঠি। আর এটা কুড়ি বছর পরে।

মনে পড়লো—'বিসর্জন আদিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।'

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

শ্রীমতী বাণী রায়

পরিচিতের পরিধির মধ্যে যাঁরা বসবাস করেন, সহসা অন্তর্ধানে স্বাভাবিক ভাবেই মানসিক বিপ্লব আসে।

অন্নপূর্ণা গোস্বামীর অকাল মৃত্যুতে দুইটি কারণে মন মুহ্যমান হয়ে ওঠে।

প্রথমতঃ, তাঁর মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষতি কতটা হ'ল চিন্তায়। বাংলা সাহিত্যে লেখিকা মুষ্টিমেয়, তালিকা থেকে একটা নামও বিলুপ্ত হয়ে গেলে, যে ব্যক্তি কখনও একটি লাইন রচনা প্রয়াস করেছে, তার শোক সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ও আন্তরিক হয়। বন্ধু বা স্বজনের ব্যক্তিগত শোকও সেখানে তুচ্ছ।

দ্বিতীয়তঃ, বন্ধুবিয়োগ শোক। তাঁর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় ছিল, তাঁদের মন পীড়িত হয়ে ওঠে আত্মীয়তার সঙ্গে সঙ্গে।

অন্নপূর্ণা গোস্বামী আধুনিক বাংলাসাহিত্যের একজন বিশিষ্টা লেখিকা ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল।

তাই শোকের নৈর্ব্যক্তিক রূপের মধ্যে বন্ধুবিয়োগ ব্যথা অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। তাই বঙ্গসাহিত্যের ক্ষতি চিন্তার মধ্যে তাঁর তিন ছেলে, এক মেয়ে ও স্বামীর ম্লান মুখগুলো বার বার ফিরে আসছে। মানুষ মানুষই, শোকের বিরাটত্বের মহিমা অপেক্ষা ব্যক্তিগত ক্ষয়ক্ষতি মমতায় আঘাত করে অধিকতর।

লেখিকার সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় হ'বার বহু পূর্ব্ব থেকে আমি তাঁর নামের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। আমাদেরি চেনাশোনার মধ্যে, আমাদেরি সমাজস্থ কোন বিশিষ্ট সূত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন জেনে স্বাভাবিক ভাবেই আমার কৌতূহল বর্দ্ধিত হয়েছিল।

তিনি মহিলা কবিদের সম্পর্কে একখানি বই লিখতে প্রবৃত্ত হয়ে আমাকে টেলিফোন করে নিজেই আমার বাড়ী এসেছিলেন।

তাঁর নিজস্ব বড় কার গাড়ী থেকে নামলেন তিনি। পাতলা চেহারা, ফীপাঙ্গী বলা চলে। বেশভূষা শাদা।

কিছুক্ষণ আলাপের পরে তিনি আমার কাব্যগ্রন্থ 'ঝুলিটার' খানি নিয়ে চলে গেলেন।

পরে তাঁর নিজালয়ে একদিন তিনি আমাকে চা খেতে ডেকেছিলেন। আরও দুই একজন সাহিত্যিকাও ছিলেন।

এই দুই দিনই তাঁর আনন্দময় উপস্থিতি আমাকে প্রচুর আনন্দ দিয়েছিল।

তাঁর মুখভাব বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যেত সর্ব্বদা একটি হাসি-খুসী ভাব ও স্বাস্থ্যের ভাব।

আমার একজন ইংরাজ বান্ধবী একদা পরিহাস করে বলেছিলেন, "তোমাদের দেশের মেয়েরা যেন স্বপ্নে চলাফেরা করে। ঘুমন্ত ভাব একটা।"

অন্নপূর্ণা গোস্বামীর মধ্যে কোথাও এই ঘুমন্ত বা স্বপ্নালু ভাব ছিল না। তিনি জেগে থাকতেন।

কীণকায়ার মধ্যে দেখেছিলাম অদম্য প্রাণশক্তি, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ সাধন। পরাজিত তিনি কিছুতেই হতেন না; ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় ছিল অপরিসীম। কোথাও বিন্দুমাত্র অলসতা বা শৈথিল্যের ইঙ্গিত দেখিনি। সত্যই বাংলার নরম মাটীতে চারটি সন্তান-স্বামী-সংসার ভারাক্রান্তা কোন মহিলার এমন উৎসাহ ও উদ্যম দেখা যায় না।

তাঁর রচনার মধ্যেও তাই অবিরত সাধনার চিহ্ন ছিল। নিজের সাহিত্য-সাধনা ও কর্ত্তব্যকর্ম্মের অঙ্কে অন্যকে সময় দেওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন তিনি—নানা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নানা কাজ তিনি করতেন। সেই সমস্ত কর্ম্মীদের কাছে তিনি অতিশয় প্রিয় ছিলেন।

তাঁর রচনার মধ্যে একটি নূতন ধারা দেবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন। রোমান্টিক রচনাকার তিনি ছিলেন না। জনসাধারণের জীবনের ছোটখাটো সুখদুঃখকে বাস্তব চিত্রায়ন তাঁর সাহিত্যাদর্শ। 'বঙ্গলক্ষ্মী' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি গল্প প্রথম আমার চোখে পড়ে—রেল-লাইনের ধারে এক দরিদ্র পরিবারের কাহিনী। বিশদ বর্ণনার ভঙ্গীতে সহজেই বলা যায় যে, রেলের ডাক্তারকে বলে কয়ার ফলে

রেল-লাইনের ধারের জীবনযাত্রা তিনি পর্য্যবেক্ষণ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তাঁর লেখার অভ্যাসের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভঙ্গি ছিল, 'ছাট' গল্পটির উল্লেখ করা চলে এই প্রসঙ্গে।

সাধারণতঃ বাঙালী মহিলাদের রচনায় যে রোমান্টিক দৃষ্টিভঙ্গী দেখি, লেখিকার মধ্যে তার ব্যতিক্রম দেখে তাঁর রচনাধারা আমি লক্ষ্য করে যেতাম। এই পথে লেখিকার বিপুল সম্ভাবনা ছিল, মৃত্যুর হাতে যবনিকাপাত হ'ল।

মহিলা-লেখিকার স্থান বর্ত্তমান জগতে ক্রমেই দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে। তাঁদের কোনরূপ অবদান স্বীকার অথবা কিঞ্চিত কয়েকটি নব্য সমালোচকের কাছে অকৃতপূজ্য বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। হয়তো জীবনে এঁরা নারীপ্রেমে বঞ্চিত অথবা বিমাতা দ্বারা পীড়িত।

সেই বর্ত্তমান যুগে অন্নপূর্ণা গোস্বামী আন্তর্জাতিক গল্প প্রতিযোগিতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরস্কার পেয়েছিলেন। সরকার লোকশিক্ষার জন্য তাঁর একটি পুস্তক গ্রহণ করেছিলেন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার রচনা সাধারণ্যে তাঁকে স্বনামধন্যা করেছিল।

তিনি স্বল্পকায়া ছিলেন, কিন্তু সাধারণতঃ আমাদের দেশের মেয়েদের প্রথম যৌবনের পরে স্বাস্থ্যহীন দেখতেই আমরা অভ্যস্ত থাকি। সুতরাং লেখিকার অতিশয় অকাল মৃত্যু আমাদের কাছে অকস্মাৎ আঘাত এনে দিল।

তাঁর সঙ্গে আমার আলাপের দিনগুলি সংখ্যায় বেশী নয়, কিন্তু সকরুণ উজ্জ্বল।

সভা-সমিতি, সাহিত্যিক পার্টি, মেলার দেখা হ'ত মাঝে মাঝে। অন্তরঙ্গ পরিবেশে তাঁকে দেখবার সুযোগ আমি পাইনি। কিন্তু বিদ্যুতের মত এই সমস্ত মুহূর্ত্ত জুড়ে তাঁর আলাপপ্রিয়তা ও সহজ ব্যবহার মনে অঙ্কিত হয়ে আছে।

তিনি আমার লেখা বা আমাকে পছন্দ করতেন কি না জানি না। কিন্তু নিজেকে তিনি দিতে জানতেন। তাঁর কিছু তিনি আমাকেও দিয়ে গেছেন বার বার।

তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হ'ল 'সরোজনলিনী' শিক্ষায়তনের বার্ষিক উৎসবের দিনে। দেখলাম তাঁর চিরাচরিত উৎসাহে তিনি ও শ্রীযুক্তা কণপ্রভা ভাদুড়ী পরিচিত বন্ধুদের সঙ্গে চা-টা খাচ্ছেন। তাঁদের সাদর আমন্ত্রণে চায়ের ভাগ পেলাম।

তাঁকে দুর্ব্বল মনে হ'ল। আমি জিজ্ঞাসা করায় তিনি হেসে বল্লেন, "স্যাট্রিক আলস্যের মত হয়েছে। স্যাস্ট্রাইডিস্।"

সেদিন রাত্রে তিনিই আমাকে বাড়ী পৌঁছে দিলেন।

কেটে গেল দীর্ঘ দিন। আমি আমার জায়গায় রইলাম। আর অন্নপূর্ণা গোস্বামী কোথাও রইলেন।

হঠাৎ একদিন 'জয়শ্রী' পত্রিকায় পড়লাম ট্রপিক্যাল হাসপাতাল থেকে লেখা একটি কবিতা তাঁর। বিস্মিত হলাম, তিনি কি ট্রপিক্যালে গেছেন? কেন?

পরক্ষণেই ধরে নিলাম, ট্রপিক্যালে রোগের পেটের ব্যথার কারণ অনুসন্ধানে গেছেন। বহু লোকই যায়, ভয়ের কিছু নেই। আমি নিজেও তো ছিলাম।

স্থির করলাম দুই একদিনের মধ্যেই কলেজ ষ্ট্রীট অঞ্চলে যেয়ে খবর নেব।

কিন্তু পূর্ব্বেই পত্র-পত্রিকা মারফৎ অন্নপূর্ণা গোস্বামীর ক্যান্সার রোগে মৃত্যু সংবাদ পেয়ে মর্ম্মাহত হ'লাম! তাঁর অসুস্থতা এত মারাত্মক, তিনি এত দীর্ঘদিন রোগভোগ করেছিলেন, জানতাম না।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ আকস্মিক ও ব্যথাপ্রদ।

মৃত্যু হিন্দুশাস্ত্রে আত্মার নব উজ্জীবন, মৃত্যু অমরতার বাহক।

সুতরাং আত্মার কল্যাণ কামনা করা ভিন্ন অনুরাগের পক্ষে কি আর করণীয়?

কিন্তু, আজ মনে হয়, সত্যই কি সান্ত্বনা আছে! শোক-সভায় দাঁড়িয়ে তাঁর বন্ধু-পরিজনের সম্মুখে ভগ্নস্বরে সান্ত্বনার কথা বলেছি।

কিন্তু আজ যে সম্ভাবনা অকালে শেষ হয়ে গেল, সে ঘটনায় কি কোন সান্ত্বনা থাকতে পারে?

যে মৃত্যু চিহ্ন না রেখে ফুলকে নিঃশেষে জ্বালিয়ে দিয়ে যায়, সে কি অমরতা দিতে জানে?

আত্মা নূতন বেশে দিব্যলোকে উদ্ভিত থাক, কিন্তু সেই হাসিমুখ কীর্ত্তাঙ্গীকে যে আমরা দেখতে পাবো না, এই বোধ বিশ্বাসের মূলকে আঘাত করে।

আজ আমার লেখনী বিষাদাচ্ছন্ন, দীর্ঘ কল্পনা সাময়িক নয় তার।

বাংলাসাহিত্যে আমরা কয়েকটি লেখিকা মাত্র। আমাদের কাজ অনেক, আমাদের লোক নেই।

দীর্ঘদিনের অনেকটাই শেষ হয়ে গেছে পথে পথে।

যে টুকু আমাদের করণীয়, তাতে ক্লান্তি থাকলে চলবে না। যে-টুকু আমাদের দেবার, দিতেই যে হবে; কেউ নিক বা না নিক।

সাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা নারী। নারীর অবদান ছিন্ন কোন দেশ বা জাতির সাহিত্যসৃষ্টি সম্পূর্ণ হয় না।

তাই জাতি-গঠনেও নারীর সাহিত্যিক তীর্থযাত্রায় বিরত হ'লে চলে না।

দীর্ঘ পথে দীর্ঘ কালের বোঝা নিয়ে কয়েকটি যাত্রি নিঃসঙ্গ পথিক চলেছে।

একজন থেমে গেলে অন্যের ক্লান্তি যে আরও গভীর হয়।

———

স্বপ্নই থেকে যায়…

শ্রীআরতি দত্ত

The dream goes on for ever
—Only the dreamers die—
Past reason's last endeavour
Belief's last ecstasy—

যখন আমার বয়স আট থেকে দশ বছরের মধ্যে তখন আমি প্রায়ই একটি স্বপ্ন দেখতাম; স্বপ্নটির বিষয়বস্তু বা দৃশ্যপটের কখনও বদল হতো না কেবল মাঝে মাঝে পারিপার্শ্বিকতার বদল হতো। স্বপ্নে দেখতাম একটা দেয়ালঘেরা, প্রকাণ্ড বাঁধানো প্রাঙ্গণ—তার একপাশে একটি বড় প্রাসাদের একটি ধার দেখা যেতো। প্রাসাদটির অনেকগুলি পদ্মফুল আর লম্বা বারান্দা ও ঘরের সারি! প্রাঙ্গণটির উঁচু দেয়ালের দুপাশে দুটি বড় বড় লোহার কটক। স্বপ্নে আমি একটা কটকের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে দেখতাম, দেখতে পেতাম দালানের সমস্তটা চৌকো পাথরের টুকরো দিয়ে বাঁধানো।

স্বপ্নে মাঝে মাঝে প্রাঙ্গণের ভেতরের দৃশ্যের বদল হতো। কখনও ছোট ছেলেমেয়েদের দেখতাম ভেতরে খেলা করছে, কখনও দেখতাম ফুটবল খেলা হচ্ছে বা সৈন্যেরা কুচকাওয়াজ করছে, আবার কখনও বা দেখতাম দালানটা জলে ভরা অথচ জল লোহার কটকের ফাঁক দিয়ে বেরোচ্ছে না কেবল কাঁচের মত ঝক্ ঝক্ করছে। কদাচিৎ দেখতাম আমি যেন কটকের ওপাশে দালানের মধ্যে গেছি—আনন্দের আতিশয্যে পাথরের টুকরোগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে পার হচ্ছি। সামনে দেখতে পেতাম ছোট্ট ছুটি ঘর। প্রত্যেক স্বপ্নই আমার একই ভাবে শেষ হতো; দেখতাম সেই ছোট্ট ঘর থেকে বেরোচ্ছে দুটি সাদা দাড়িওলা লোক, তাদের মাথায় সবুজ কাপড়ের টুপি, প্রায় চোখ পর্যন্ত নেমে এসেছে। দুজনে ঠিক একরকমের দেখতে। তাদের দেখেই আমার কেমন ভয় হতো ও আমি পেছন ফিরেই দৌড়তে আরম্ভ করতাম আর মনে হতো লোকদুটি আমাকে তাড়া করে আসছে, এখুনি বুঝি ধরে ফেলবে। এমনি সময় ঘুম ভেঙ্গে যেতো, তখন ঘটনাটা সবই স্বপ্ন জেনে—মনের ভাবনা হতো।

দশবছর বয়সের পর কিন্তু আর এই স্বপ্নটি দেখিনি। লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, ছেলেবেলার স্বপ্নের কথা ক্রমে মনে আবছা হয়ে এলো।

পনেরো বছর বয়সে নৌবিহারে আমি যোগ দিই এবং কিছুদিন পর আমাদের ব্রহ্মদার্কের রাজধানী কোপেনহাগেন যেতে হয়। সেখানে পৌঁছবার পর প্রথম রবিবারে আমি অন্য দুজন সহকর্মীর সঙ্গে তীরে নেমে শহরে যাবার জন্যে বেরোই। রাস্তায় লোকেরা বললে—সামনের রাস্তা ধরে সোজা চলে গেলেই শহরে পৌঁছবো কিন্তু আমার খুব ইচ্ছা হলো ডানদিকের রাস্তা ধরে চলতে এবং আমার বন্ধুরা তাতে রাজি হয়ে গেলো। তাইনে, বাঁয়ে না ঘুরে সেই রাস্তা ধরে সোজা চললাম। নির্জন শহরতলীর পথ, দর্শকরা রাজি নয় ও পথে আর এগোতে, ওরা চায় ও দেখতে

বাজার দেখতে কিন্তু আমি কিছুতেই ভুলবোনা, ক্রমে পথ এসে শেষ হলো। একটা মস্ত বড় বন্ধ ফটকের সামনে। কয়েকজন প্রহরী দাঁড়িয়ে ছিল, একজন এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলো—"তোমরা কি বিদেশী? এখানে কি চাও?"

"সহরে যাবার রাস্তা কোনদিকে—বলতে পারো?" আমি বললাম।

"তোমরা ভুলপথে এসেছো, ফিরে যেতে হবে" বলেই আমাদের ক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে বোধ হয় তার মায়া হলো, বললে, "আচ্ছা একটু দাঁড়াও, আমি ফটক খুলছি তোমরা ভেতরে এসো কিন্তু ওধারের ফটক দিয়ে লোক বেরিয়ে যাবে।" ভেতরে ঢুকে আমিতো অবাক—এ কী, এ যে আমার অতি পরিচিত স্বপ্নে দেখা বাড়ি। তেমনি পাথরের টুকরো গেঁথে বাঁধানো চৌকা বিরাট প্রাঙ্গণ এক পাশে দেখতে পাচ্ছি এক বড় প্রাসাদের অংশ, প্রাঙ্গণের ভেতরে সৈন্যরা পা মিলিয়ে চলেছে একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। আমি কিছু না ভেবেই ছোট ছেলের মত স্বপ্নে যেমন করতাম তেমনি লাফিয়ে লাফিয়ে এক পাথরের টুকরো থেকে অন্য পাথরের ওপর যেতে লাগলাম। আমার বন্ধুরা আশ্চর্য্য হয়ে আমাকে টানাটানি করতে লাগলো, ভাবলো বোধহয় লোকটার মাথা খারাপ হলো নাকি বললো—"আরে চলো চলো, এখান থেকে বেরোনো যাক।" আমি ওদের আমার ছেলেবেলার স্বপ্নের কথা বললাম। ওরা বোধ হয় বিশ্বাস করলো না। জিজ্ঞাসা করলাম "এ প্রাসাদের নাম কি?" প্রহরী বললো—"তোমরা একেবারেই এদেশে নতুন এসেছো দেখছি—এ হলো এখানকার রাজপ্রাসাদ।"

আমার স্বপ্নের বাড়ি—এদেশের রাজপ্রাসাদ। কিন্তু সেই দুটো লোক কোথায় গেল? ঠিক একরকমের দেখতে, লম্বা লম্বা দাড়ি, মাথায় সবুজ কাপড়ের টুপি, প্রায় চোখ পর্য্যন্ত নেমে এসেছে।

কয়েক বছর কেটে গেছে—আমাকে একবার ইংলণ্ডে Harwitch সহরে—যেতে হলো জাহাজের কাজ উপলক্ষ্যে। সেখানে কাজ যতো শিগ্রি শেষ হবে ভেবেছিলাম তা হলোনা ফলে বেশ কিছুদিন থাকতে হলো। হারউইচ্—সমুদ্রের ধারে ছোট সহর, অলিগলি, ঘোরানো রাস্তা ও পোড়ো বাড়িতে ভরা। এখানে একদিন তাদের সঙ্গে আমার দেখা হলো। স্বপ্নে দেখা সেই দুটি লোক—ঠিক একরকমের দেখতে, লম্বা, সাদা দাড়ি, মাথায় সবুজ কাপড়ের টুপি, প্রায় চোখ পর্য্যন্ত নেমে এসেছে। আমি তাদের দেখে এত আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম যে তাড়াতাড়ি যে কাছে এগিয়ে যাবো সে খেয়াল পর্য্যন্ত হলোনা। যখন খেয়াল হলো, ততক্ষণে তারা মোড় ঘুরে অলিগলি দিয়ে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেলো, তাদের আর খুঁজে পেলাম না। ওদের কথা ভাবতে ভাবতে জাহাজে ফিরে এলাম। ভাবলাম একরকমের দেখতে লোক তো অনেক সময় দেখা যায়, কিন্তু কি অদ্ভুত সাদৃশ্য এদের আমার ছেলেবেলায় স্বপ্নে দেখা লোক দুটির সঙ্গে।

একবছর পর আবার হারউইচ এ ফিরে গেলাম কয়েকদিনের জন্যে—ওখানে গিয়ে লোকদুটির কথা স্বভাবতই আমার মনে পড়লো। ওখানকার একজন পুরনো বাসিন্দাকে লোক দুটির বর্ণনা দিতেই, সে বললো—"ওদের তো এখানে সবাই চেনে দুই যমজ বুড়ো, দুজনেই অবিবাহিত—এখানে একটা ছোট পোড়ো বাড়িতে কষ্ট করে দুজনে থাকতো আর জাহাজ তৈরীর কাজ করতো। ওদের অতীত সম্বন্ধে এখানকার কেউ বিশেষ কিছু জানে না। কোথায় ওদের বাড়ি, আপনজন কেউ আছে কিনা, কেনই বা এখানে এলো—কিছুই এখানকার লোকে জানে না। কয়েক মাস আগে—এক সপ্তাহের আগপিছু দুই ভাই মারা গেছে।

ওরা কষ্ট করে অনেকদিন ধরে টাকা জমাচ্ছিল বাইরে যাবে বলে, তা আর বেচারিদের হলো না।"

"কতদূরে যেতে ওরা চেয়েছিল যে অনেকদিন ধরে টাকা জমাচ্ছিল?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"ওরা যেতে চেয়েছিল—কোপেনহাগেনে, সেখানকার কথাই ওরা সব সময় বলতো আর কোপেনহাগেনে যাবার আশায় যেন ওরা জীবনের শেষ পর্য্যন্ত আশা করেছিল। ওখানে ওদের একটি ছোট বাড়ি আছে শুনেছি—রাজপ্রাসাদের কাছে।" *

* সত্য ঘটনা অবলম্বনে। বিদেশী পত্রিকা হইতে গৃহীত।

স্ত্রীশিক্ষা সংপ্রসারণে বাঙ্গালী যুগন্ধরগণ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্র বিমল চৌধুরী

রাজা রামমোহন যুগাবতার মহাপুরুষ। জাতীয় জীবনের এমন কোনও দিক নেই, যাতে তাঁর প্রভাব বিস্তৃত হয় নি। তাঁর জীবদ্দশায় নারীসমাজের পশুতা, শিক্ষা-হীনতা তাঁকে স্বভাবতই বিচলিত করেছিল। তজ্জন্য তিনি যেমন একদিকে সহমরণ প্রথা রোধ করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন, তেমনি প্রাণপণে নারী শিক্ষার প্রসারের চেষ্টা করেন। তাঁর "সহমরণ সম্বন্ধে প্রবর্তক-নিবর্তকের দ্বিতীয় সংবাদ" নামক গ্রন্থে তিনি নারীদের শিক্ষার অভাবকেই নারীদের বিরুদ্ধে আনীত সমস্ত অভিযোগের, নারীদের সমস্ত দুঃখের কারণ বলে ঘোষণা করেছেন। তাঁর যুক্তিকৌশল যেমন অপূর্ব, ভাষাও পরম কৌতুকময়। তিনি বলেছেন—

"স্ত্রীলোককে স্বামীর সহিত মরণে প্রবৃত্তি দিবার যথার্থ কারণ এবং এরূপ বন্ধন করিয়া দাহ করিবার আগ্রহের কারণ স্ত্রীলোক স্বভাবত অল্পবুদ্ধি, অস্থিরান্তঃকরণ, বিশ্বাসের অপাত্র, সাহসরাগী ও ধর্মশূন্য।"

"প্রথমতঃ—স্ত্রীলোকের বুদ্ধির পরীক্ষা কোন্ কালে লইয়াছেন যে অনায়াসেই তাহাদিগকে অল্পবুদ্ধি কহেন, কারণ, বিদ্যাশিক্ষা ও জ্ঞানশিক্ষা দিলে পরে, ব্যক্তি যদি অনুভব ও গ্রহণ করিতে না পারে, তখন তাহাকে অল্পবুদ্ধি কহা সম্ভব হয়। আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ স্ত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয়, কিরূপে তাহা নিশ্চয় করেন।"

অন্যদিকে নারীদের অন্তঃকরণের স্থৈর্য, দৃঢ়তা প্রভৃতির ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি নারীদের বিদ্যার প্রকৃষ্ট আধার রূপেই বর্ণনা করতে চেয়েছেন। তিনি অপূর্ব সুন্দর ভাষণে তাঁর বক্তব্য সুস্পষ্ট করেছেন—"তাঁহাদিগকে (নারীদিগকে) [আপনারা] অস্থিরান্তঃকরণ কহিয়া থাকেন, তাহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করি। কারণ, যে দেশের পুরুষ মৃত্যুর নাম শুনিলে মৃতপ্রায় হয়, তথাকার স্ত্রীলোক অন্তঃকরণে স্থৈর্য-দ্বারা স্বামীর উদ্দেশে অগ্নিপ্রবেশ করিতে উদ্যত হয়—ইহা প্রত্যক্ষ দেখেন, তথাচ কহেন, যে তাহাদের অন্তঃকরণে স্থৈর্য নাই।"

"বাল্যবিবাহের দোষ" নামক গ্রন্থে[১] স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতার উপর জোর দিয়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় বলেছেন —"এতদ্দেশে যদপি স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষার প্রথা প্রচলিত থাকিত, তবে অসন্দেহনীয় বালক-বালিকারা মাতৃসন্নিধান হইতেই সদুপদেশ পাইয়া অল্প বয়সেই কৃতবিদ্য হইতে পারিত। সন্তানেরা শৈশবকালে যেরূপ স্ব স্ব প্রকৃতির অনুগত থাকে, পিতা বা অন্য গুরুজনের নিকট তাদৃশ অনুগত হয় না। পিতৃগণের নিকট সস্নেহ মধুর বচন যাদৃশ অনুকূলরূপে অনুভূয়মান হয়, উপদেষ্টকের হিত বচন তাদৃশ প্রীতিজনক নহে। এই নিমিত্তে বালকেরা স্ত্রীসমাজে অবস্থিতি করিয়া যাদৃশ সুখী হয়, পুরুষ সমাজে থাকিয়া তাদৃশ সুখী ও সন্তুষ্ট হয় না। অতএব স্তনপান পরিত্যাগ করিয়াই যদি বালকেরা মাতৃমুখ-চন্দ্রমণ্ডল হইতে সরল উপদেশসুধা আস্বাদ করিতে পারে, তবে বাল্যকালেই বিদ্যার প্রতি দৃঢ়তর অনুরাগী হইয়া অনায়াসে কৃতবিদ্য হইতে পারে। কারণ, সন্তানের হৃদয়ে জননীর উপদেশ যেমন বদ্ধমূলরূপে সংলগ্ন হয় ও তদ্দ্বারা যত শীঘ্র উপকার দর্শে, অন্য শিক্ষকের দ্বারা তাহার শতাংশেরও সম্ভাবনা নেই।" এজন্যই নারীদের মধ্যে বিদ্যার সংপ্রসারণের নিমিত্ত বিদ্যাসাগর মহাশয় এত সুকঠোর প্রচেষ্টা করেছিলেন।

১৮৪৭ সনের প্রথম দিকে বাংলার ছোটলাট সার ফ্রেডারিক হ্যালিডে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। তাঁরই অনুরোধে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিভিন্ন অঞ্চলে অবৈতনিক বালিকা বিদ্যা-নিকেতন স্থাপনে ব্রতী হন।

বীটন প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয় সংক্রান্ত সমুদয় কার্যের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করার জন্য যে অধ্যক্ষসভা গবর্নমেণ্ট নিযুক্ত করেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় তার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। বলা বাহুল্য, এই বালিকা বিদ্যালয়ের নাম প্রথমে "কলিকাতা বালিকা বিদ্যালয়" ছিল।

এ ভাবে নারী শিক্ষার সংপ্রসারণের জন্য তিনি পরবর্তী কালে বদ্ধপরিকর, তিনি হচ্ছেন বিশ্ববিজয়ী ধর্মবীর স্বামী বিবেকানন্দ।

এঁদের শ্রীশ্রীচরণ কমলে প্রণতি নিবেদন করে আজকের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ সমাপ্ত করছি।

---

(১) পৃঃ ৭, গ্রন্থাবলী, সমাজ।

যার যেথা স্থান

শ্রীমতী কণা দেবী, ভারতী

এক গাল হেসে বোর গলায় নিতাই বলে—"অ বউ, কলকাত্তা শহর তুর কেমন লাগছে বল ?"

তরুণী লক্ষ্মীমণির মুখে লজ্জা হাসি। ঘাড় নেড়ে জানালো সে—'ভালো'। এবার মিচু স্বরে বলে নিতাই—"আর তুর মন কাঁদবে না, বল ? মেসে পরাণ কাঁদতো তুর !"

এর উত্তরে খিল খিল ক'রে হেসে ওঠে লক্ষ্মী ; বাঁধ ভাঙা ঢেউ যেন লুটিয়ে পড়ে শুকনো চড়ার বুকে। নিতাই তৃষিত চোখে তাকে তাকিয়ে দেখে আর ভাবে—চার বছর হ'ল তাদের বিয়ে হয়েছে। বিয়ের সময় লক্ষ্মী ১০।১১ বছরের মেয়ে, স্বামীকে দেখলেই সে তখন দোমটা টেনে ছুটে পালিয়ে যেত। মেহিনীপুরের চাষী-সমাজের নিয়ম—বউ বড় না হ'লে স্বামীর সঙ্গে কথা বলে না। সেই লক্ষ্মীই আজ কলকাত্তা শহরে এসেছে ঘরকন্না করতে। খোলার ঘরের বারান্দায় এসে, টিনের সুটকেশ খুলে লক্ষ্মী তার শাড়ী গামছা-সেমিজ ইত্যাদি বের করে গুছিয়ে রাখছিল, সেলফের তাকটাতে, আর সামনে ব'সে নিতাই তাকে এ কথাগুলি বলছিলো—আর মুগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে দেখছে তাকে।

কিছু ক্ষণ হেসে লক্ষ্মী বলে—"হ্যাঁ, কইবা ভুলায় গেছ ? টিউ কলে জল নাই যে শুনলায়।" পাশের ঘরের কথা তার কানে এসেছে।

"তু বড় বোকা, বউ ! এখানে 'টিউ কল' নেই ; সব—জলের কল। সকাল, দুপুর, বিকেল আর রাতে জল আসে কলে। তিনটায় জল আসবে আবার। এখন চৌবাচ্চায় জল আছে ; স্নান করে নে-গে-যা। আমি একবার হোটেলে যাই—ভাত নিয়ে আসি গে।"

একটা আধ পোড়া বিড়ি ধরিয়ে টানতে টানতে নিতাই হোটেলের পথে রওনা হ'ল। গুরুচরণ শতপতির পাইস—হোটেলে। নিতাই যায় টেবিল-বয়ের কাজ করে। হিসাবে খুব পাকা এবং কাজে বেশ বিশ্বাসী ব'লে গুরুচরণ তাকে আপন ছেলের মত স্নেহ করে। কিছুদিন থেকেই সে নিতাইকে বলেছে—"বউ এনে বাসা করো ; এমন শহরে একা থাকা ভালো নয়। খাওয়ার খরচ লাগছে না তো—শুধু বাসা ভাড়া ৫৲ টাকা ; মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছি।"—বউকে নিয়ে শহরে বাস করতে কার না ইচ্ছা হয় ? তার চেয়ে ঐ অমূল্যের একটা পা খোড়া ; কিন্তু সেও বিয়ে বউ নিয়ে আছে। অমূল্য বিড়ি বাঁধে, আর তার বউ ভরদালা ঘরে ব'সে সুপুরি কাটে, ঠোঙা তৈরী করে। বড়ী-আচারও ভালো ভাবে করতে জানে সে। এই সব বিক্রী করেও বেশ আয় হয়। বিয়ে সংসার চালাচ্ছে ওরা। আবার কি-সপ্তাহে খোঁড়া—অমূল্যর বউ রঙিন শাড়ী প'রে, পায়ে জুতো দিয়ে 'সিনেমা' দেখতেও যায়। এই সব দেখে শুনে নিতাইএর বউ আনার লোভ হ'ল। অমূল্যের বাসার পাশেই বাসা ক'রে সে বউ আনতে চললো বাড়ি। বাড়ি পৌঁছে, জোর ক'রে বুকে সাহস এনে নিতাই বাপের কাছে দাঁড়িয়ে কথাটি বলে ফেলে একদমে ? ছেলের কথা শুনে বুড়ো শ্রীপতি তারী অবাক হয়ে যায়। এমন কি, হাতের হুঁকোয় টান দেবার কথাও ভুলে গেল শ্রীপতি। খানিক সময় নিতাইএর দিকে হাঁ ক'রে চেয়ে থেকে বলে বুড়ো—"কী কও বাপু ? বউ কলকাত্তায় যাবে কেনে ?"

নিতাই এবার প্রমাদ গুণলো। বুড়ো বয়ে শ্রীপতি কানে বেশ কম শুনতে আরম্ভ করেছে। আকাশে মুখে, শুয়ে শুয়ে, জোরেই সে বলে—"গঙ্গাস্নান করবে, কালী ঘাটে ঠাকুর"—

শ্রীপতি এবার বুঝতে পারে আসল কথা। একটু কাল বেশ গম্ভীর হয়ে রইল। নিতাইএর মা নেই। ছোট বোন যোগমায়া বিধবা হওয়া থেকে ভাইএর সংসার আগলে পড়ে আছে ; কিন্তু তারও বয়স হয়ে আসছে। সংসার

আছে। গরু বাছুর আছে। চাষের সময় নানা রকমের ঝঞ্ঝাট। এ সব একলা ক'রে উঠতে তার বেশ কষ্ট হয়েই থাকে। তাদের সমাজে মোটা 'পণ' দিয়ে ছেলের বিয়ে দিতে হয়। শ্রীপতি ঠিক গরীব নয়; কিছু হাত-টান; তাই ছেলের বিয়ে দিতে চায়নি। শেষে চাপে প'ড়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই কাজ করতে হ'ল। মোক্ষদাই মেয়ে পছন্দ করে, বিয়ের ব্যবস্থাও করে। বউ শ্রীপতিরও মনে ধরলো। চাষী ঘরের যোগ্য কাজ-কর্ম মেয়েটা ঠিক মত করতে না পারলেও অসন্তুষ্ট হয় না মোক্ষদা বলে—"বুদ্ধি আছে শিখে নেবে।" কিন্তু ছেলের এমন বুদ্ধি কী করে হল? কলকাতায় বেড়াতে যাবে, ক'দিন থাকবে, হয়তো; শেষে বলে বসবে—বউ আমার কাছেই থাক। এমনি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে শ্রীপতির কালো মুখ, আরো কালো হয়ে উঠলো। নিতাই এক ফাঁকে বাপের কাছ থেকে সরে পড়ে।

রাত্রি বেলা শোবার আগে স্বামীর সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মীমণি ঘরা গলায় বলে—"তুমাকে ছাড়া হয়ে থাকতে মোর পরাণটা কাঁদে।"...তাকে কাছে পাওয়ার ইচ্ছা নিতাইএর প্রবল হলেও, নিতাই তার আশা পূর্ণ হবার কোনো সম্ভাবনাই দেখতে পেলো না। হতাশাকে বুকে চেপে সে শুয়ে পড়ে; বউ ভাবে—স্বামী তাকে ভালবাসে না। কিন্তু পরের সকালেই এক অভাবনীয় ঘটনা ঘ'টে গেল। সিনেমা শোলমেলে হাওয়া ঠিক ক'রে দিল। মাকে বললো মোক্ষদা—"ছেলেমানুষ বউ, বেড়িয়ে আসুক দিন কতক।" বউকে তোয়ের করেই পাঠিয়ে দিল ভাইপোর সঙ্গে। এমন কি লুকিয়ে পোটা কয়েক টাকাও বউকে দিয়ে দেয়। যোগের কাজ শ্রীপতিকে তেমন অসন্তুষ্ট করলো না। যোগের জন্যেই তো তার বলা।

কালীঘাট, চিড়িয়া খানা হাত দিনের মধ্যেই দেখা হয়ে গেল। এবার বাকী 'সিনেমা'। ছবি হাসে, কথা কয়, গান করে 'টকী'তে, এ গল্প লক্ষ্মীমণি শুনেছে কিন্তু চোখে দেখেনি, কানে শোনেনি। সিনেমা যাবার জন্যে নতুন ঘোষে-ফ্রিল্ড ছাপা-শাড়ী ও ফুটপাথ থেকে কেনা রং চংএ স্নোপার প'রে লক্ষ্মীমণি যেদিন সেজে দাঁড়ায়, তার দিকে তাকিয়ে নিতাইএর চোখের পলক আর পড়ে না। ফরবালার চেয়েও তাকে ভালো দেখাচ্ছে।

ছবি দেখে লক্ষ্মী অভিভূত হয়ে পড়ল। 'এমন সব অবাক করা জিনিষ আছে। সিনেমাতে? পাড়াগাঁয়ে কী সুখ। গোরুর সেবা কর, ঢেঁকিতে পাড় দাও, কাঠ-কুটো জেলে, কালি মেখে বাসন সেদ্ধ কর, রান্না কর। বর্ষার প্যাচ্‌পেচে কাদা, কাঠ কাটানো রোদ গরম কালে—গাঁ আবার একটা থান? সহরে থাকার কত সুখ!' কয়েক দিন পরে নিতাইও বুঝতে পারলো বউএর মনের কথাটা। সত্যিই তো? চাষার ঘরের বউ ব'লে কী ওর সাধ ইচ্ছে নেই? সংসার তো করবেই দু'দিন পরে; কাটাক না ক'টা দিন ঘুরে ফিরে। নিতাই বাড়ীতে খবর দেয়, বউ মাস দু'ই পরে যাবে। কিন্তু দেখতে দেখতে প্রায় বছর ঘুরে আসে। লক্ষ্মীমণি বাড়ী যাবার নামটিও করে না। কিন্তু নিতাই তাকে নিয়ে পড়লো বড় বিপদে। তার চুল বাঁধা, কাপড় পরার কায়দা বদলে গেছে। সে চা খায়, মুখে 'পমেটম্' মাখে। ফরবালার পরামর্শে বউ একদিন দাওড়ী খুলে রেখে কার পাশার দাবী করলো, নিতাই রাজী হ'ল না। কলকাতায় সংসার পেতে অনেক টাকা খরচ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আদায়ের মোক্ষম অস্ত্রের কথা লক্ষ্মীমণির অজানা নয় আজ। সে মুখ ভার করলো; দু'দিন কথা কইলো না। বাধ্য হ'ল পুরুষ; তার পাশা এসে গেল। তা ছাড়া, আর এক যোগ—সিনেমা দেখার বাতিক লক্ষ্মীকে পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছে। সপ্তাহে অন্ততঃ ২-খানা ছবি না দেখলে তার মন-মেজাজ খারাপ হয়ে ওঠে; ঘরের কাজ কর্মে ভুল হয়; রান্না কোনদিন নুনে পোড়া, নয়তো আলুনা বা কাঁচা। বাধ্য হ'য়ে নিতাইকে সিনেমা দেখার পয়সা দিতেই হয়। সিনেমা দেখার পরই আবার লক্ষ্মীর হাসি-খুশি উছলে ওঠে। বিরক্তে নিতাই ভাবে—ঘরকুণে; আর ক'টাদিন। পুজোর আগে নিয়ে বাড়ীতে ফেলে আসব। চাষা-ঘরের বউ; চাষাণী হওয়া এর চেয়ে অনেক ভালো। লক্ষ্মীমণির কিন্তু কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা নেই। নদীর স্রোতের মত দিনগুলি তার কেটে যাচ্ছে। হঠাৎ এক ঘটনা তার এমন সাদের জীবনের গতি একেবারে পরিবর্তন করে দিল।

ভরবালার পরে সে চুড়ামণি যোগের স্নান করতে যায় গঙ্গায়। এমন ভিড় সে জীবনে দেখেনি। মহিলাদের মধ্যে যেলাতেই সে চুকতে ভরসা পায়নি; আর এই ভিড়ে সে কী ভরে ঠিক থাকবে? আশপাশের লোক দেখতে গিয়ে সে হারিয়ে ফেলে নিজের লোক। ভয়ে পাগল হ'য়ে সঙ্গিনীকে খুঁজতে থাকে। বৃথাই খোঁজা। শেষে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ভীত দৃষ্টি দিয়ে এদিক ওদিক দেখতে থাকে। চেনা মুখের দেখা নেই। ভয়ে তার গা দিয়ে ঘাম ঝরে আসে; একটা বোবা কান্না বার বার তার গলা ঠেলে উঠতে চায়। তখনি এক জন 'বাবু'-লোক তার কাছে এসে সহানুভূতির সুরে তাকে জিজ্ঞাসা করে—কোথায় যাবে সে। লক্ষ্মী অতিকষ্টে বাসার ঠিকানা বলতে বাবুটি বলে—"আমিও সেখানেই যাব; তুমি আমার সঙ্গে এস।"

ঘোমটা আর একটু কমিয়ে দিয়ে লক্ষ্মী বাবুটির পিছু পিছু চলে সরল বিশ্বাসে। কিন্তু পথ যে আর ফুরোয় না! শেষে লক্ষ্মীর খেয়াল হ'ল—তাদের বাসা এত দূরে নয়—যাতে একটা বড় বাজার মাত্র আছে। এ যে এসে পড়েছে রেল লাইনের কাছে। সাহস করে লক্ষ্মী বাবুকে বলে—"মাপনার, আপনি মোকে গঙ্গার ধারে রেখে আসবেন চলুন। আপনি মোকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন।"

বাবু তার আপাদ মস্তকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে বলেন—"কাছেই তোমাদের লক্ষ্মী, চল আর একটু।"

চাষা-রক্তে কিন্তু বলরামের রাগ এসে পড়েছে। গলা চড়িয়ে লক্ষ্মী বলে—"চোক কাছে; মু যাবে না তুমার সাতে। তারী মোর ভক্ত লোক দেখছি!"

একজন পথিক এগিয়ে এল ওদের কাছে। ধরা গলায় লক্ষ্মী ঘটনার কথা বলতে থাকে। মোড়ের মাথায় পুলিস ছিল—সন্তোষোল শুনে সেও এগিয়ে এলো। কিন্তু এসেই সে বুঝলো—পথ-প্রদর্শক বাবু সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছে। এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। পুলিসের সাহায্যে লক্ষ্মী খুব তাড়াতাড়িই বাড়ী ফিরলো। নিতাই ছিল তার প্রতীক্ষায়। সব কথাই তাকে জানালো লক্ষ্মী। নিতাই রাগ না করে একটু হেসে বলে—"বুদ্ধি ক'রে চেঁচামেচি করেছিলি, তাই রক্ষে। সহরে হ'য়ে তুর বেশ সাহস হয়েছে, বউ!"

"ছাই—সাহস!" বলে—লক্ষ্মী নিতাইএর বুকে মুখটা গুঁজে দিয়ে ভীত গলায় বলে—"মোর বেহ এখুনো ভয়ে কাঁপছে গো!"

নিতাই ওকে আদর করে বলে—"দেশে যাবি? পিসীর অসুখ করেছে; চিঠি দিয়েছে বাবা। বাবু খুড়ো আজ বাড়ী যাচ্ছে—তার সাথে যাবি তুই? খুড়ো একটু আগে এসেছিল।"

লক্ষ্মী—লক্ষ্মী মেয়ের মত তখনি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। সোহাগ-ভরা কণ্ঠে বলে—"তুমিও চল।"

"আমি পুজোয় যাব, তুর জন্যে শাড়ী জামা নিয়ে।"

চোখ ছলছল্ ক'রে উঠলেও এ-কথায় লক্ষ্মীর ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসির ছোঁয়া লাগে। সে যাত্রার জন্যে তৈরী হয়।

দু'মাস পরের কথা। নিতাই বাড়ী এল; তখন প্রায় সন্ধ্যা। সদর উঠানে পা দিতেই তার দেখা হয়ে গেল লক্ষ্মীর সঙ্গে। লক্ষ্মীর এক হাতে গরুর দড়ি, অন্য হাতে ঘুটের সুড়ি; গোয়ালে চলেছে, গরু বেঁধে 'সাঁঝ' দিতে। কোমরে আঁচল জড়ানো; মুখ ঘামে ভেজা। স্বামীকে দেখে সলজ্জ ভাবে বলে—"কখন এলে গা তুমি?"

মুগ্ধ দৃষ্টিতে বউকে দেখতে দেখতে নিতাই বলে ওঠে—"এই তো আসলাম।"

"তুমি ঘরে যাও। পিসী আছে। বাবা গেছে দুকানে। তুমি আসবে"—মুখে সলজ্জ হাসি, চোখের দৃষ্টি রঙিন। "যাও; আমি 'সাঁঝ' দিয়ে এখুনি এলাম।"

লক্ষ্মী গোয়ালে গেল; নিতাই গেল বাড়ির ভেতর।

বেশ রাত হ'ল শুতে। কলকাতা থেকে ফিরে লক্ষ্মী একেবারে 'লক্ষ্মী' হ'য়ে গেছে—বাবা বললো, পিসী বললো। সে বলার মধ্যে একটুও রঙ ফলানো নেই। নিতাই এ কথা শুনে সত্যিই আনন্দ পেল, লজ্জা পেল—নিজের বাচালতার কথা ভেবে। এও ভাবে মনে মনে—শহরে না গেলে কী লক্ষ্মী এমনি হ'ত? যাক্ যার সবাই সুখী।

লক্ষ্মীকে পরীক্ষা করতেই বিছানায় বসে, হাসি মুখে নিতাই বলে—"এবার তুকে নিয়ে যাব বউ।"

ঝিক করে একটু হেসে লক্ষ্মী বলে—"উঁহু, আমার ব'লে সময়ের সময় নাই ; তুমার সংসার, গরু-বাছুর দেখবে কে শুনি ? দিদী তো বুড়া হয়ে গেল। মনে হয় না দি যথা ?

মুচকী হেসে লক্ষ্মী মশারী টাঙাতে লাগলো। আর তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিতাই এর মনে হ'ল—চাষী ঘরের বউকে গাঁয়ের ঘরে যেমন মানায়, তেমনটি আর কোথাওও মানায় না।

রাজগীর কুণ্ড ও নালন্দার পথে

শ্রীতারাপদ রায় (সান্ন্যাল), সমগ্র ভারত পর্যটক

বহুদিন হইতে নালন্দা ও রাজগীরের প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক কাহিনী পুস্তকে ও লোকমুখে শুনিয়া দেখিবার প্রবল আগ্রহ মনে গোপন করিয়া আসিতেছিলাম। সুযোগ খুঁজিতে খুঁজিতে একটি কার্যোপলক্ষে আমার মাতামহ বিখ্যাত প্রাচীন পত্রিকা প্রকাশক ৺পি, এম, বাকচির পাটনা আফিসে যাইতে হইয়াছিল।১ সিদ্ধিই দিনে আমাদের ভাগলপুরের বাড়ী হইতে রওনা হইয়া এক মাইল দূরে কহলগাঁও লিটি ষ্টেশন হইতে কলিকাতা পি, এম, বাকচির বাড়ী আসিলাম। দুই দিন পর ভাগলপুর হইতে গিরিডির টিকিট কাটিয়া ট্রেনে উঠিলাম। ট্রেন ছাড়িল। একে একে বর্দ্ধমান জং আসানসোল জং অতিক্রম করিয়া মধুপুর ষ্টেশনে নামিলাম। এখান হইতে গিরিডি শাখা লাইনের গাড়ী ছাড়িতে ৪ ঘণ্টা দেরী আছে দেখিয়া আমি মধুপুর সহরের কিছু অংশ ঘুরিয়া দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। এই সহরের রাজপথের ধারে ধারে মেলা পাকা কোঠাবাড়ী, বাজার স্থল মোটামুটি সব ঘুরিয়া দেখিলাম। এখানে মানুষের কিছুই দেখিবার নাই। দূরে ছোট পর্ব্বত দেখা যায়। এস্থানের জল হাওয়া স্বাস্থ্যকর। ঘণ্টাখানেক পর এক দোকান হইতে চা ও জলযোগ অন্তে ষ্টেশনে আসিয়া গিরিডিগামী ট্রেনে উঠিলাম। গাড়ী হইতে পার্ব্বত্য জঙ্গল ও গ্রাম্য দৃশ্য দেখিতে দেখিতে গিরিডি পৌঁছাইলাম।

গিরিডি

ষ্টেশন হইতে এক ধর্ম্মশালায় গিয়া উঠিলাম। স্নান সারিয়া ঘরে তালাবন্ধ করিয়া গিরিডি সহর পরিদর্শনে বাহির হইলাম। প্রথমে গিয়া এক দোকানে খাওয়া সারিয়া খোঁজ লইয়া জানিলাম গিরিডি সহরে দেখিবার কিছুই নাই, জলের কল ও বিজলী বাতিযুক্ত সাধারণ জেলার সদর সহর। থাকার মধ্যে এক ১৫।১৬ মাইল দূরে মেলা কয়লার খনি আছে আর আছে একমাত্র জইবা স্থান ৭।৮ মাইল দূরে উত্তরী জলপ্রপাত। ঐ রাস্তায় পাঁচমাইল চা বা কোন খাবার দোকান নাই, সেজন্য যাতায়াতে এই ১৬ মাইল হাঁটাপথের জন্য দুপুরের কিছু পুরি ও খাবার দোকান হইতে লইয়া উক্ত জলপ্রপাতের পথে পদব্রজে যাত্রা সুরু করিলাম। কারণ বহু টাকায় একটা সমগ্র গাড়ী রিজার্ভ করা ভিন্ন কোন মাসিক বাস দৈনিক এপথে চলাচল করে না। সহর পেরিয়ে গ্রাম আর বনজঙ্গল ভেদ করে চলতে ক্রমে ক্লান্তি নেমে আসছিল। এমন করে একলা চলা কত যে দুঃসহ। কিন্তু প্রপাতের মাইল খানেক দূর থেকে মটর রাস্তা ছাড়াইয়া বড় বড় বৃক্ষ শোভিত জংগল মধ্যবর্ত্তী রাস্তা দিয়া চলিতে লাগিলাম। এখানে নিকটেই এক সাঁওতালী বস্তিতে স্থানীয় অধিবাসীদের একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া প্রপাত অভিমুখী রাস্তা ও উহার দূরত্ব জানিয়া লইলাম। এই স্থান হইতে প্রপাতের শব্দ কানে আসতেই আমার উৎসাহ বেড়ে উঠলো। তাকে দেখবার জন্য মন আমার নেচে উঠলো। সে যেন আমাকে ডাকছে। দূর থেকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছে। আমার হৃদয় মন দেহ তাতে সাড়া না দিয়ে কি পারে? আমার চলার গতি বেড়ে চললো ক্রমেই। আমার মনের অবস্থা ঠিক অভিসারিকা

যাবা কিম্বা বৃন্দাবন-পথযাত্রিনী মীরার মতই বলতে পারা যায়। কখন্ দেখবো, কখন্ মিলবো এম্‌নি ভাব। এম্‌নি অবস্থায় চলে এক সময়ে তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। তখন অপূর্ব্ব বিস্ময় আমার চোখে মুখে। কি সুন্দর তার রূপ। কি তার প্রাণচাঞ্চল্য। তার চারদিকে ঘুরে ঘুরে প্রাণ মন দিয়ে উপভোগ করলাম সেই রূপকে, সেই জীবনকে। বার বার আমার মনে পড়তে লাগলো কবির "নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গের" কথা। জলপ্রপাতের সেই গর্জ্জনকে কান পেতে শুনতে লাগলাম—সত্যই যেন কথা বলছে—"ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্ কারা, আঘাতের পর আঘাত কর"। উস্রী সত্যিই কি সুশ্রী প্রপাত; যৌবন-চঞ্চল উস্রী জলপ্রপাতের নিম্নে বা উপরে কোন জঙ্গল নাই। রাঁচীর ২৫ মাইল দূরে ৬ষ্ঠ জলপ্রপাত ও শিলংয়ের জলপ্রপাতের ন্যায় অত উচ্চ নয় বা সেইরূপ মনোহর নয় তবু বাংলা দেশের দার্জ্জিলিংয়ের জলপ্রপাত অপেক্ষা উস্রী উচ্চতায় বড় ও দৃশ্যের দিক দিয়ে মনোহর। উস্রী জলপ্রপাতের উপর স্রোতস্বিনীর উজানে ধারে ধারে কিছুদূর এগিয়ে দেখলাম, বহু প্রস্তরের সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে সবেগে নেমে গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ করে নিম্নে পতিত হইতেছে। তারপর জলপ্রপাতের গোড়ায় পৌঁছে নীচ থেকে আরও সুন্দর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করলাম। উপর হইতে জলরাশি নিম্নে পতিতের সময় উত্থিত বারিকণা রৌদ্রের ন্যায় দেখাইতেছিল তাহার উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া রামধনুর মত কত রংয়ের সৃষ্টি করেছে। কি মনুময় দৃশ্য! নিম্নে একস্থানে গভীর খাদে জমাকৃত জলরাশি নিম্নে নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। আমি নীচে ঐ জলাশয়ের তীরে প্রায় দুই ঘণ্টা বসিয়া প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে দুপুরের আহারাদি শেষ করিয়া উঠিতেছি এমন সময় দেখি দুজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক উপর হইতে জলপ্রপাতের ফটো তুলিতেছেন। তারপর আমিও ঐদলে মিশিয়া প্রায় ৪।৫ ঘণ্টা প্রপাতের ঐ মনোমোহিনী রূপ দেখিবার পর আমরা একত্রে গিরিডি সহরের দিকে হাঁটিতে লাগিলাম। তারপর আমরা গল্পে গল্পে ঘণ্টাখানেক পর গিরিডি সহরের ধর্ম্মশালায় পৌঁছাইয়া ম্যানেজারের নিকট হইতে বিদায় লইয়া সন্ধেয় সহ ষ্টেশনে রওনা হইলাম। গিরিডির ষ্টেশন হইতে রাজগীর কুণ্ডের টিকিট লইয়া গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িল। কিছুক্ষণ পর মধুপুর জংশনে গাড়ী বদলী করিয়া পাটনাগামী ট্রেনে উঠিলাম। ট্রেন ছাড়িল, একে একে জসিডি জংশন ও বহু ষ্টেশন অতিক্রম করিয়া বক্তিয়ারপুর জংশনে বড় গাড়ী ছাড়িয়া বক্তিয়ারপুর বিহার লাইট রেলওয়ে নামক ছোট গাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ী ছাড়িল, ট্রেন হইতে দুই পার্শ্বের বহু শ্যামলিমা ও শস্যক্ষেত্র দেখিতে দেখিতে নালন্দা ও আরও অনেক ষ্টেশন অতিক্রমের পর এই লাইনের শেষ ষ্টেশন রাজগীর কুণ্ডে পৌঁছাইলাম।

রাজগীর

ষ্টেশন হইতে নিকটেই এক ধর্ম্মশালায় দোতলার ঘরে তিনদিনের জন্য বিনা ভাড়ায় স্থান পাইলাম। পাটনা হইতে এখানে দৈনিক যাতায়াতের বাস সার্ভিস আছে। প্রাচীন কালে এই রাজগীরের নাম ছিল রাজগৃহ। রাজগৃহ ছিল বিম্বু রাজাদের রাজধানী। প্রাচীনকালের নগর সভ্যতার অনেক ধ্বংসাবশেষ তার স্মৃতিকে বহন করে চলেছে আজো। রাজগীরেও উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এই সব গন্ধকের প্রস্রবণে স্নানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে আধুনিক পদ্ধতিতে—বড়ো বড়ো পাইপ টেনে টেনে। উহার পার্শ্বেই বাঁধান বৃহৎ কুণ্ডের মধ্য হইতে ফুটন্ত গন্ধকের জল অনবরত উঠিতেছে; তাহার জন্যে নামিয়া বহু যাত্রী অবগাহন স্নান করিতেছে। আমিও সেখানে স্নান সারিয়া উঠিলাম। এই প্রস্রবনে স্নান করিলে চর্ম্ম-রোগের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। কাজেই স্নানার্থীর ভীড় এখানে একটু বেশী।

আমিও এখানে স্নান করে স্থানীয় মন্দির দর্শন করে বেড়ালাম। তব মন্দির আর প্রাচীন রাজাদের কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষের অন্ত নেই এখানকার পাহাড়ে, জঙ্গলে। রেল ষ্টেশন হইতে এই কুণ্ড পর্য্যন্ত রাস্তার দুই ধারে বেশ লোক বস্তি ও খাবার দোকান দেখা যায়। ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধ মাইল এই কুণ্ড পর্য্যন্ত আসিবার পর কোন দোকান কিম্বা লোকবস্তী দেখা যায় না। এই কুণ্ডে স্নানের পর নির্জ্জন পাহাড়ে, জঙ্গলের দিকে এগিয়ে চললাম প্রাচীন রাজাদের

ধ্বংস মন্দির ও স্মৃতি চিহ্নগুলি দেখিবার জন্য। গিয়ে দেখলাম চারিদিক জংগলে পরিবৃত অথচ মধ্যে মধ্যে এক একটি ভগ্ন শিবমন্দিরের ভিতর হইতে আমাদের ২।৩ জনের গলার শব্দ পাইয়া শৃগাল বাহির হইয়া পলাইতেছে। এই সব মন্দির ও শিবলিঙ্গগুলি আজ অনাদরে উপেক্ষিত দেখিয়া মন বিষাদক্লিষ্ট হইল। পাহাড়ের চূড়ায় যে সব মন্দির আছে সেখানে নিত্য পূজা হয়। সাধারণতঃ পুরোহিতেরা কেহ মন্দিরে বাস করেন না কারণ এই জংগলাকীর্ণ নির্জন পরিবেশে বাঘের চলাফেরার সম্ভাবনা প্রচুর। আমার সমগ্র ভারত ভ্রমণের পথে যাবকা হইতে ফিরিবার সময় এলাহাবাদ ঝাঁসি লাইনে চিত্রকূট পাহাড়ে এই রাজগীর পাহাড়ের ন্যায় বহু প্রাচীন ভগ্ন রামসীতার মন্দির দেখিয়াছিলাম—সেইস্থান ইহা অপেক্ষাও নির্জন ও ভয়াবহ কিন্তু বন্যপশু, হরিণ প্রভৃতি বন্য পশুপক্ষী সমন্বিত নয়নমনোমুগ্ধকর প্রাকৃত দৃশ্যাবলীতে এই চিত্রকূট রাজগীর অপেক্ষাও সুন্দর। রাজগীরের গন্ধকের উষ্ণ প্রস্রবনের জল কেবলমাত্র চর্ম রোগ নিরাময়ের জন্য ও স্বাস্থ্যের জন্য প্রসিদ্ধ কিন্তু এই জল পানীয় রূপে ব্যবহৃত হয় না। সারা ভারতে এইরূপ গন্ধকের উষ্ণ প্রস্রবণ ১২।১৩টি দেখিয়াছি। রাজগীরের পাহাড়ে জংগলে এতো প্রাচীন ভগ্ন মন্দির ও ঐতিহাসিক কীর্তিকলাপ কোন হিন্দু রাজার আমলে কোন সালে নির্মিত তাহা বলা কঠিন। আমি দুই দিন পাহাড়ে জংগলে প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসলীলা দেখিবার পর ধর্মশালা হইতে বিদায় লইয়া নালন্দা অভিমুখে ট্রেনে রওনা হইলাম। ঘন্টাখানেক পর নালন্দা ষ্টেশনে আসিয়া ট্রেন হইতে অবতরণ করিলাম।

নালন্দা

ষ্টেশন হইতে দুই মাইল দূরে নির্জন প্রান্তরে বিশ্ববিখ্যাত নালন্দার ধ্বংস স্তূপের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। চারিদিক প্রায় মাইল খানেক কাঁটা তারের বেড়া বেড়া। ভারত সরকারের প্রাচীন স্মৃতি রক্ষা বিভাগ হইতে গেটে প্রহরী নিযুক্ত ও গেটের পার্শ্বে বড় সাইন বোর্ডে লিখিত রহিয়াছে দর্শকদের জন্য নিয়ম কানুন ; দুই আনার টিকিট কাটিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। ভারতের গৌরবোজ্জ্বল শিক্ষাকেন্দ্রের ধ্বংস স্তূপের সম্মুখে এসে দাড়ালাম শ্রদ্ধানত মস্তকে। নালন্দার জ্ঞানালোক একদিন সমস্ত এশিয়া এমন কি এশিয়া ছাড়িয়া আরো দূরে ছড়িয়ে পড়তো দিকে দিকে, মানুষকে মুক্তির বাণী শোনাতো, আলো ধরে পথ দেখাতো। যেখানে প্রত্যহ সহস্র লোকের কোলাহলে পূর্ণ ছিল আজ সেই এতো বড়ো বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাসাদ সব নির্জন শ্মশানে পরিণত হয়েছে। "চিরস্থির কবে নীর হায় রে জীবন নহে?" কালের করাল আহ্বানে সকলকে সকলই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহাই বিশ্ব সৃষ্টির চিরন্তন নিয়ম। আজ ঐ ধ্বংস স্তূপের সামনে দাড়িয়ে ক্ষণে ক্ষণে শ্রদ্ধানত না হয়ে পারলাম না। ক্ষুদ্রে অতীতে মন চলে গেল। আমি এক বাঙ্গালী যেন বাঙ্গলার সঙ্গে সাক্ষাত প্রয়াসী হইয়া আসিয়াছি তীর্থক্ষেত্রে, মুক্তি তীর্থের পথপ্রান্তে। নালন্দার প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন দেখে আজকের বিংশ শতাব্দির বৈজ্ঞানিক যুগেও বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। পর পর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধ্বংস স্তূপ পাঁচ ছয়টা পাশাপাশি তিন তলা উচ্চইষ্টক স্তূপ যেন ছোট ছোট পর্বত স্তূপ বিশেষ দাড়িয়ে অতীতের সাক্ষি দিতেছে। বহু প্রাচীন কীর্তি উদ্ধারের জন্য এখনও বহু সরকারী লোক জন প্রত্যহ মাটি খনন করিয়া ধ্বংস স্তূপ অপসরণ করিতেছে দেখিলাম। হঠাৎ দেখি তিন চার জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক গাইড সহিত সব দেখিবার জন্য ভিতরে প্রবেশ করিলেন। তখন আমিও তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে গল্প বেড়াইয়া সেই সব ধ্বংস স্তূপের কাহিনী দেখিতে ও শুনিতে লাগিলাম। সিড়ি দিয়া দোতলায় উঠিয়া সব খুটিনাটি পূর্ণ ইতিহাস গাইডের মুখে শুনিতে লাগিলাম। পাশাপাশি তিনতলা বাড়ীর ছাদগুলি পড়িয়া গিয়াছে কিন্তু উহার দেওয়ালগুলি সব শক্ত ও খাড়া আছে। ঘরের দেওয়ালগুলি এতো চওড়া ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। কোন কোন দেওয়াল গায়ে ও প্রস্তর ফলকে প্রাচীন কালের বিভিন্ন ভাষায় কত লেখা রহিয়াছে। ১২।১৩ হাত অন্তর এক একটি ধ্বংস স্তূপ শত শত বৎসর ধরিয়া আজও দাড়াইয়া বহু প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নালন্দার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। পূর্বকালে ভারতের তৎকালীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলির মধ্যে নালন্দা বিশ্ব-

বিদ্যালয় ইতিহাস মুখী শিক্ষা পদ্ধতিতে বৃহৎ ছাত্রাবাসের ব্যবস্থায় ও বড় প্রাসাদ সম বিল্ডিং-এর দিকে দিকে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। ভারতে যত ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংস হইয়াছে ও আজ কাল ভূগর্ভ হইতে খনন করিয়া যতগুলি প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, যেমন সীমান্ত প্রদেশের তক্ষশীলার ধ্বংসস্তূপ, যুক্ত-প্রদেশের কাশীর পার্শ্বে সারনাথের কীর্ত্তি ও বিহার প্রদেশে এই নালন্দার ধ্বংস কীর্ত্তি সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। নালন্দার এই ধ্বংস স্তূপ ছেড়ে প্রায় এক মাইল দূরে নালন্দা Institute এ এলাম। সেখানে রক্ষিত স্মৃতিচিহ্ন দেখবার জন্য দু আনার টিকিট কিনে এগিয়ে গেলাম ধীরে ধীরে। বহু যুগের মত অতীতের ইতিবৃত্তকে স্মরণ করতে করতে এই বাড়ী ঘরে পাশাপাশি তিন চারটে ঘরের ভিতরে গিয়া দেখি বহু প্রস্তর শিল্প ও প্রস্তরে খোদাই করে লেখা ও বহু ভাষার ছাপান পুস্তক ও চিত্র কলা স্তরে স্তরে সাজান রহিয়াছে! প্রায় এক ঘণ্টা ঘুড়িয়া দেখিবার পর ষ্টেশনে আসিলাম। নিকটে এক দোকান হইতে আহারাদি করিয়া লগেজ লইয়া পাটনা অভিমুখে ট্রেণে রওনা হইলাম। কিছুক্ষণ পর বক্তিয়ারপুর জংশনে আসিয়া ছোট লাইনের গাড়ী ছাড়িয়া বড় লাইনের গাড়ীতে উঠিলাম, দেখিতে দেখিতে ঘণ্টা খানিক পর পাটনা আসিয়া পৌঁছিলাম।

পাটনা

আমার মাতামহ পত্রিকা প্রকাশক পি, এম, বাকচির পাটনা ব্রাঞ্চ অফিস ম্যানেজার আমার মামাত ভাইয়ের বাসায় উঠিলাম। বিশ্রাম ও আহারাদির পর বিহারের রাজধানী পরিদর্শনে বাহির হইলাম। লাট প্রাসাদ, ইউনিভার্সিটি বিল্ডিং, সেক্রেটারীয়েট, হাইকোর্ট, বড় পোষ্ট অফিস, যাদুঘর, বড় বাজার প্রভৃতি ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে আসিয়া পরিলাম এক প্রাচীন ঐতিহাসিক কৃত্তিম গোলাকার ত্রিনতল উচ্চ পর্ব্বত স্তূপের গোড়ায়। হিন্দুরাজত্ব কালে পাটনার অপর নাম পাটলিপুত্র ছিল। ২৬৯ বি, সি পূর্ব্বে মহারাজ অশোক এবং ৩২১ বি, সি, সালে মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময় পাটনা দেশের রাজধানী ছিল, পাটনার যাদুঘরে অশোকের কিছু স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত আছে। ১৭৮৬ সালে দুর্ভিক্ষ হইতে কিছু রক্ষা পাইবার জন্য ঐ গোল ঘর গ্রেনাইড প্রস্তরে নির্ম্মিত হয়। যেন জমির উপর প্রকাণ্ড মৌচাক আকৃতিতে গড়া উহার বাহিরে সিড়ি দিয়া ঘোড়ার পিঠে বসে উঠা যায় মাটি হতে প্রায় ৯০ ফুট চূড়ার উচ্চতা। পাটনায় খোদার বক্স গ্রন্থাগার প্রসিদ্ধ। পাটনা গঙ্গা তীরে ডিঙ্গা ঘাট হইতে রেলওয়ে ফেরী ষ্টীমারে উঠিয়া ওপারে প্যালেজাঘাট N. E. রেলওয়ে ষ্টেশন হইয়া পার্শে সোনপুর হরিহরক্ষেত্র রেলায় পৌঁছান যায়। দুই দিন পাটনা পরিদর্শন করিয়া পি,এম, বাকচির অফিসে কাধ্য অন্তে পরদিন ভোরের ট্রেনে কলিকাতায় গিয়া দুই দিন বিশ্রামের পর পি, এম, বাকচি বাড়ী হইতে বিদায় লইয়া শিয়ালদহ হইতে ট্রেনে কৃষ্ণ নগর সিটি ষ্টেশনে নামিয়া আমার মাতুলালয় বাড়ী পৌঁছিলাম।

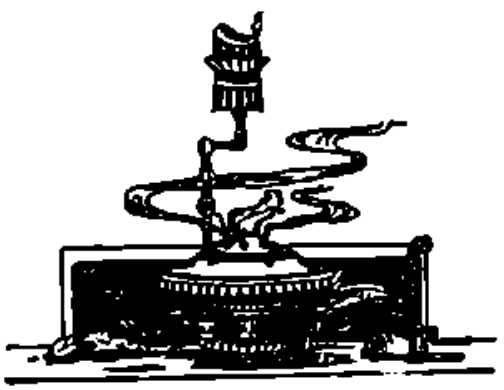

নূতন যুগের ঘর

শ্রীহেমলতা ঠাকুর

ওগো আমার ঘর গৃহিণী ঘরোয়া রাণীর দল
ঘর খানিরে সাজিয়ে তোলার শিখেছ কৌশল।
ভালবাসার বেড়া দিয়ে ঘেরি ফুল বাগান
সারা ঘরে আনিছে রাখ অপূর্ব্ব সুঘ্রাণ।
পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ অন্ন সবার পাতে দাও
স্বাস্থ্যে ভরা দেহের শোভায় সংসার সাজাও।
সবার মুখে তুলে ধরো বাটী ভরা দুধ
নষ্ট হতে দাওনা ঘরের একটি কণা খুদ।
ধরণী সো ধরণী মোর হৃদয় হরণী
বধূ রূপে কন্যারূপে চিরঃস্মরণী।
উছলে পড়ে সচ্ছলতা তোমার চারি পাশে
ঘর রেখেছি তোমার ঘরে সুখে থাকার আশে
নূতন যুগের শিক্ষা নূতন ভরো
হৃদের পানে ধরহ ভরা দৃষ্টি মেলি ধরো।
দেশের মানুষ হৃদয়জনারে দোসর করি লও
নূতন যুগের নূতন ঘরে নূতন কথা কও।
বলো, যদি অগ্নি দাহে সবাই পুড়ে মরে
একা তুমি আপন ঘরে বাঁচবে কেমন করে।
ওগো আমার ঘরের রাণী বল বারং বার
"বাঁচলে সবাই তবেই বাঁচি এই জেনেছি সার।"
ঘর ওগো ঘর মোদের নূতন যুগের ঘর
সবাই সেথা মানুষ হব বিধাতার এই বর।

অন্নপূর্ণার স্নেহের তনয় তনয়াদের প্রতি

শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু

ছোটবোন সে ছিল আমার
চলে গেল হঠাৎ আগে!
তারি পরলোকের ক্রিয়া—
শুনতে যেন কেমন লাগে!
কেমন করে পারবো যেতে?
অনবরত ঐ আকাশ ডাকে!
থেকে থেকে পড়ছে মনে
আহারাদের বল্পাকে।
সান্ত্বনা কি আছে বলো?
মায়ের অভাব ঘুচবে কিসে?
চিরজীবন পড়বে মনে
সেই হাসিকে, সেই আশীষে।
বড়ো হবে, ভালো হবে—
এই ছিল তার স্বপ্ন জানি।
সেই কামনা পূর্ণ করো
ধন্য করো জীবন খানি।
নিজেরেরে চাইত না সে
শিল্পীজনী বাসতো ভালো
তারি হাতে দীপশিখাটি
জ্বালিয়ে রেখে বিদায় আলো।

মিলনের নাহি আর ক্ষণ অবকাশ

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অন্তরের ভাষা মম পড়িতে চেয়েছ বঁধু! আঁখি পানে চেয়ে
পরশ করিয়া বুকে মুছায় সেনব কর বেণুটি নিমিষে
আনন্দিমার অনুরাগে কথাহারা ছিলে হারা মেয়ে!
তোমার যৌবন সঁপি আমার জীবন স্বপ্ন জাগাইয়া দিতে
দেখেছি প্রচেষ্টা তব। কামনার বহ্নিশিখা জ্বলেছে দ্বিগুণ,
হর্ষোজ্জ্বল মুখখানি ছিল যেন মধুময় পুষ্পিত কানন।

হৃদয়-উত্থিত শুভ্র তনু তব বর্ণোজ্জ্বল যেথায় যেথায়
অতনুর স্পর্শাতুর ছিল যেন,—সাথে সবে দূর অতিথায়।
না-বলা বাণীর কোন্ অর্থহরা অর্দ্ধস্ফুট প্রেমের লেখায়
পাঠালে লিপিকা মোরে। ধরা দিলে ছল করেমোরে বারবার।
ভাব ভাবনার বাঁধ ভেঙে ফেলে এসেছিলে বাসনা-প্রবাহে,
আমারে নিয়েছ টেনে হৃদা তরঙ্গ তুলে প্রণয়-প্রবাহে।

স্বল্প আলাপ মর্ম্মে মধু ঝরি আনে প্রেম শ্রাবনের সম,
এ কথা জেনেছি বঁধু! জীবন নাট্যেতে সেই
দ্বিতীয় অঙ্কেতে
প্রথম বসন্ত দিনে। বাসন্তীর মত তুমি গোপন সঙ্কেতে
হেনেছিলে মুকুলের তোমার নয়ন হেতে! স্মৃতিকথা সম
ভরেছে বিরহে। তুমি নাই সেই স্মৃতি বসালাপে সম্ভাষণ,
তুমি যেন ত্রিলোত্তমা ভেলভেমনোর মত সঁপেছিলে মন।

ভাষার রঙেতে আজ আঁকিতেছি তব হৃদয়ের ছবিখানি
বৈচিত্র্যের সমারোহে তুমি কেন ভিন্নমুখী?—কেন প্রবঞ্চনা!
ঝিলিমিলি জোছনায় কার সাথে নিরালায় করি কানাকানি
আঘাত হানিলে মোরে। নারী আর পুষ্প জানি
করে অন্তমনা—
রূপ যদি থাকে তার, তাই তো সুন্দরী সনে আনন্দের নীড়
প্রাণের বিহগ বাঁধে।···আজিকার মৃত্তপট ব্যথায় নিবিড়।

তোমাতে আমাতে বঁধু! মিলনের নাহি আর ক্ষণ অবকাশ,
বিচ্ছিন্ন বীণের মত বেদা আমি, বেথা কেন দুরন্ত বাতাস?

প্রশ্ন ?

শ্রীআদিত্য নাথ মিশ্র

আকাশের বুকে ভাসা একটি রঙীন মেঘ
দেখে যদি তুমি ভালবাসলে,
দুখের বর্ষাদিনে জলেভেজা বুঁই যেথে
কেন তবে মৃদু হাসি হাসলে?
নবীন শিল্পী মোর তোমার আঁচলে এসে
শরতের ভোরে চলে পড়লো,
মিষ্টেল হাওয়ার দোল সামলাতে গিয়ে মন
সোনালী স্বপন-পথ ধরলো।
সে পথে অনেক আশা সে পথে অনেক রঙ,
দেখলে তো তুমি আছে ছড়ানো,

তখনো তো জেনেছিলে আগামী দিনের সুখ
হাসি আর প্রেম দিয়ে জড়ানো।
সংশয় জাগেনিক তখনো তোমার মনে
কি ভুলের যাদু চরে ফিরলে!
কত সাধে কৌশলে স্বপ্নের জাল দিয়ে
প্রাণের প্রিয়কে তুমি ঘিরলে।
মনের মাধুরী দিয়ে গেঁথেছ প্রেমের হার
হীরে মণি চুণী আর পান্নায়—
বলো বলো, সুন্দরী, আজকে জীবনখানি
তবে গেল কেন বোবা কান্নায়?

সহজ মানুষ

শ্রীমমতা ঘোষ

যুক যেখেই সহজ ও যে, বাস্তলোকে বাস,
স্বপন দেখা স্বভাবে নেই, বয় না দীর্ঘশ্বাস।
কাজ বোঝে যেন, কর্মী ও যে,
সকল সময় কাজ সে খোঁজে,
ভাব-সাগরে ডুবে থাকার নাইকো অভিলাষ,
কাজের ভিতর দিয়ে যে ওর আত্ম-পরকাশ।

আপনারে এ দেয় রেখে যে কাজের অন্তরালে,
সকল কাজে নিজের অমল প্রাণেরি রস ঢালে।
কথার পরে কথা গেঁথে
পারে না ও উঠ্‌তে মেতে,
মাতাতে ও পারে না যে সরস বাক্যজালে,
মনটি যে ওর বেজে ওঠে কাজের তালে তালে।

সাজানো আর গড়া ছিল শৈশবেরি খেলা,
তাই নিয়ে ওর আনন্দেতে কাটত যে যে বেলা।
ধীরে ধীরে এম্‌নি ক'রে
শক্তিতে ও উঠ্‌লো ভ'রে,
শিশুকালের খেল্‌নাতে ওর আজ যে দেখি হেলা,
এই ভুবনে বসাতে চায় নতুন মহামেলা।

কোন্ দেবতার আশিস-প্রসাদ স্বর্গ হ'তে ঝরা
অমর করা অমৃতে ওর হৃদয়খানি ভরা।
সকলকে ও ভালোবেসে
আপন ক'রে মিল্‌লো এসে,
স্বর্গ হ'তে সরীসৃপী যা যে যে আর নরা,—
বাঁধা দিয়ে দুই মায়েরে জিন্‌তে চায়ে ধরা।

কাজের মানুষ—তবুও দেখি রয়েছে ওর মাঝে
মিহি সুরের তারগুলি সব সূক্ষ্মতারি সাজে।
কাজের ফাঁকে ছবি আঁকে,
ফুল দিয়ে ঘর সাজিয়ে রাখে,
সুন্দরে ও ভালবেসে মুক্তি যে দেয় কাজে,
দরিদ্রীরে সাজিয়ে দেবে এ ওর বাসনা যে।

বাস্‌লো ভালো আপন জনে, তাই সে সকল ধরা
এক নিমেষে জানি যে ওর হ'লো আপন করা।
ভালবাসার মন্ত্র বলে
কাজ করে ও সুকৌশলে,
সবাই ওরে খোঁজে, বোঝে, চায় সকলে ধরা,
আপন্ত ওর হৃদয় দেহ—নয়কো ভাবে ভরা।

অনুতাপ

শ্রীমতী যূথিকা দাস

রবীন্দ্রের কণ্ঠ গলে
বিশ্ব কবি বলেছিলে—
"জীবনের কত না সঞ্চয়
দিনান্তে পথের প্রান্তে ফেলে যেতে হয়।"
এক মুঠি স্মৃতির ধূলি
চলিতে চলিতে ফেলি
এ জীবন ভিলে ভিলে হইতেছে ক্ষয়।
তবুও যেয়ে চলি জীবন আশায়
পলে পলে স্বপ্ন রচি বিচিত্র ভেলায়
জানি ব্যর্থতায় সবি
সব ধরি যায় ডুবি

সে গান শুনাই যেন শেষ সীমানায়
কত পাওয়া মিমিষে হারায়
অযাচিত যাহা এলো জীবন-সন্ধ্যায়
তবুও অশ্রু ঝরে
কাঁদে হৃদি বারে বারে
এই কি জীবন-ব্যর্থ পূর্ণ সুন্দরতায়?
মোহ-জাল বাঁধি নিরালায়
কাঁদে প্রাণ সৃষ্টি লালসায়
সৃষ্টি তার অভিমান
সহি কত অপমান
নিজেরে নিজেই বাঁধি চির বন্ধনায়।

পরিবর্ত্তন

শ্রীসুধালতা দত্ত

স্বামীর ওপর প্রথম দৃষ্টি সবিতার, বিকুণ্ঠ স্নান শেষ করে ভিজে প্রথম ধাপে পা দিতেই সে তর্জ্জন করে উঠলো:—"উপরে উঠছো যে বড়? গায়ত্রী জপ করলে না?"

"ওঃ—বড্ড ভুল হয়ে গেছে।"—বিকুণ্ঠ ফিরে এল উঠোনের বাস্তখানে।

সবিতার নজর পড়ল তার খোলা গা'য়ের ওপর। তীক্ষ্ণ স্বরে বলল,—"তোমার পৈতে কোথা গেল?"

বিকুণ্ঠ চোখ ফেরাতেই দেখতে পেল উপবীত নিঃসন্দিগ্ধই হয়েছে।

"তাই তো—তাই তো:"—বলে, শশব্যস্তে সে ঢুকে পড়ল কল ঘরে, কিন্তু কোথাও পৈতের হদিশ পেল না। হতাশ হয়ে ফিরে এসে বিনা উপবীতেই গায়ত্রী জপ শুরু করল। সবিতা হেঁকে এল—"পৈতে বার দিয়ে গায়ত্রী—কোন শাস্ত্রের বিধান শুনি?"

নিরুপায় বিকুণ্ঠ আমতা আমতা করল—"পৈতে নাই বা রইল? মন্ত্র ত মনে, মন ঠিক থাকলেই হল।"

তাহা কাঁসির মত সবিতা ঝন ঝন করে উঠল "মন ঠিক তোমার কোনখানে শুনি? এই তো ভুলে গায়ত্রী না করেই ওপরে ছুটছিলে, সন্ধ্যে আহ্নিকের কথা না হয় বাদই দিলুন। পৈতে কোথায় ফেলেছ তার ঠিক নেই, মন ঠিক কোথায় শুনি? গিগ্‌গীর নতুন পৈতে পরবে চল।"

সবিতা ছুটলো। বিকুণ্ঠ তাকে অনুসরণ করল।

দোতলায় শোবার ঘর। তার মধ্যে ছোট একটা কুলুঙ্গি। সেখানে নানা দেবদেবীর মূর্ত্তি। দেবতার সামনে খুব ছোট একটা থালায় চার-পাঁচখানা বাতাসা ও পাশে মানানসই এক গ্লাস জল। এ তাঁদের নৈবেদ্য বরাদ্দ।

কুলুঙ্গির এ জায়গাটা একাধারে সবিতার কাছে মন্দির ও সেফ্-কাস্টোডি, এই পবিত্র মন্দিরের এক কোণ থেকে সে নতুন একটা পৈতে বের করে আনতেই বিকুণ্ঠ চিৎকার করে উঠলো—"দাঁড়াও দাঁড়াও—মনে পড়েছে" বলে, সে গিয়ে হাজির হল অধুনা বইয়ের সেলফের কাছে।

একটা আধছেঁড়া বই'এ অন্তর্ধান রয়েছে তার পৈতেটা।

সবিতার আপাদ মস্তক রাগে জ্বলে উঠলো। কড়ায় দিয়ে বলল,—"পৈতে দিয়ে বই বেঁধেছ কি আক্কেলে? এ কি তোমার ঘড়ি? এমন ধেড়ে আমি জীবনে দেখিনি, আচ্ছা নাস্তিকের পাল্লায় মানা দিয়েছি তো!"

বিকুণ্ঠ সঙ্কুচিত হয়ে বলল,—"রাগ করো না, লক্ষ্মীটি। কাল রাত্তিরে বইটা একটু দেখ্‌ছিলাম। সমস্ত পাতাগুলো আলগা—সেলাই আগাগোড়া কাটা। ইঁদুরের কাণ্ড নিশ্চয়ই। হাতের গোড়ায় কিছু পেলুম না,—তাই পৈতে দিয়ে"—

সবিতা তাকে কথা শেষ করতে দিল না।—"কি তোমার ধর্ম্মপুস্তক শুনি, যে, পৈতে দিয়ে বেঁধে রাখতে হবে। ছেঁড়া কাপড়ের পাড় কি চাইলে পেতে না?" বলে, অগ্নিশর্ম্মা হয়ে বইটা টান মেরে হাত থেকে কেড়ে নিল।—

দেখল—"দেশ চিত্রতারকাদের সচিত্র জীবনী।"

"তোমাকে বার বার নিষেধ করেছি না। তবু এই ছাইভস্ম সব পড়বে? আজ আমি উনুনে দিয়ে ছাড়ব।" বলে, বই নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম করল।

বিকুণ্ঠ এবার জ্বলে উঠল, তার পথ রোধ করে কর্কশ স্বরে বলল,—"খবরদার বলছি—অমন কাজ ক'র না। তোমার কুলুঙ্গি আমি ভেঙে তছনচ করে ফেলব। তোমার দেবতাদের ওজন দরে বিক্রি করে দেব।"

আগুনে ঘি পড়ল।—"কি? তুমি আমার ধর্ম্মের ওপর হাত দেবে? তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা? ঠাকুর তুমি শুনলে। এর সাজা তুমি দিও।"—বলে, সবিতা বইটা ঘরের মেঝের ওপর ছুড়ে ফেলে দিল। আধছেঁড়া বইখানার পাতা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে গেল।

বিকুণ্ঠদের গায়ত্রী করা হল না। না খেয়ে পাড়ি দিল—অভিসের অভিমুখে। সবিতার মন বেদনায় টন টন করে উঠলো। "পুরুষ মানুষ অমন একটু হয়েই থাকে"—এ তারই অন্যায়—নিজের কাছে দিল নিজের জবাব। কাঁদল কিছুক্ষণ ঘুমন্ত মূর্ত্তিকে সাক্ষী করে। নিজেও রইল সারাদিন অভুক্ত।

সন্ধ্যায় বিকুণ্ঠদ বাড়ি ফিরে এল সব অস্তিত্ব নীতির মনোভাব নিয়ে। সবিতা বেতবনে চেয়ার দিয়ে বসে।

বিকুণ্ঠদ সস্নেহে জিগেস করল,—"রাগ করেছ সবিতা?"

অভিমানে সবিতা মুখ ফিরিয়ে নিল।

বিকুণ্ঠদ কাছে এল,—"এই দেখ, কি এনেছি তোমার জন্যে।"

"চাই না যাও।" সবিতা চলে যাওয়ার উপক্রম করল।

বিকুণ্ঠদ পথ আগলে দাঁড়ালে। "নেবে না ত? এই দেখ! মহাভারত—ধর্ম্মের বই। না নিলে পাপ হবে।" বিকুণ্ঠদ বইখানার আচ্ছাদন খুলে ধরল তার সামনে।

সবিতা আর দ্বিরুক্তি করল না। বইখানা নিয়ে স্বামীর আহারের জোগাড়ে গৃহান্তরে গেল। ফিরে এসে স্বামীর মূর্ত্তি দেখে হতচকিত দৃষ্টিতে নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

বিকুণ্ঠদ নূতন উপবীত পরে রাধাকৃষ্ণের সামনে করজোড়ে বসে, তার দু'চোখ বন্ধ, সে গভীর ধ্যানে মগ্ন।

"আমার পরিহাস করা হচ্ছে। ওঠ শিগ্‌গীর।"—সবিতা দিল—এক ধাক্কা।

"পরিহাস নয়—সত্যি।" ঈষৎ চোখ খুলে তাকিয়ে বিকুণ্ঠদ আবার চোখ বন্ধ করল।

সবিতা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ঘরের মধ্যে যাবার ঢাকা দিয়ে রাখাল, স্বামীর সুমতির জন্যে দেবতার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কথায় কথায় বিকুণ্ঠদ একদিন সবিতাকে বলল—"সংসার আর ভাল লাগছে না। এ জগৎ বড় তিক্ত—বড় একঘেয়ে।"

সবিতা আপত্তি জানায়—"কেন, আমাদের দুঃখ কিসের, সংসার বলতে, কেবল তুমি আর আমি। ছেলে-পুলের ঝামেলা নেই। ভাল না লাগার কারণ তো কিছু দেখছি না।"

বিকুণ্ঠদ করুণ ভাবে বলল,—"আজ আমরা দুজন। কিন্তু, পরে আমরা পাঁচজনেও তো দাঁড়াতে পারি, চাকুরীর তো এই অবস্থা। রোজগার যা করি তাতে দিন চলে কোন রকমে। পরে সংসার বাড়লে কি হবে—আমি তো ভেবে কূল কিনারা পাই না।"

সবিতা স্বামীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল,—"তখনকার কথা তখন ভাবা যাবে। এখন থেকে মন খারাপ করার দরকার নেই। বরং ভাল চাকুরীর চেষ্টা কর।"

বিকুণ্ঠদ স্ত্রীকে বাধা দিয়ে বলল,—"চেষ্টা কম করছি কোথায়। জোটে না—কপাল আমাদের পোড়া।"

সবিতা কটাক্ষ করে বলল,—"তা হলে এতদিনে স্বীকার করলে, যে, কপাল বলে একটা পদার্থ আছে?"

বিকুণ্ঠদ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালে। বলল,—"তোমার কথাই ঠিক। তিনি না দিলে কিছুই হবে না, মাঝে মাঝে মনে হয় বৈরাগী হয়ে বেরিয়ে পড়ি, কোন আশ্রমে বা মঠে গিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে তাঁর ভজনা করি।"

সবিতা খিল্ খিল্ করে হেসে ফেটে পড়ল। ভাবখানা তার—"তবেই হয়েছে।" কিন্তু মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠল। সত্যি যদি তাই করে! না—না,—এ সে কিছুতেই হতে দেবে না।

বিকুণ্ঠদ গম্ভীর হয়ে গেল।

দিন কয়েক কাটল। সবিতার নজরে পড়ল—বিকুণ্ঠদের কাজে কর্ম্মে ক্রমশঃ যেন বিরাট পরিবর্ত্তন দেখা দিচ্ছে। নিয়মিত সন্ধ্যা আহ্নিক জপতপে তার আর ভুল হয় না। নতুন একটা কমণ্ডলু, একজোড়া খড়ম, একগাছা জপের মালা, এখন তার নিত্য সহচরী। পরণে গেরুয়া রঙ'এর কাপড়, মুখে এক হাত দাড়ি, চোখে কেমন কেমন দৃষ্টি,—এ সব সবিতার কাছে বিসদৃশ ঠেকে, ধ্যানের প্রতি তার ক্রমবর্দ্ধমান আকর্ষণ সবিতাকে করে তোলে পীড়িত। তার উদাস চাহনি, বৈরাগ্য সুলভ মনোভাব,—তাকে তীক্ষ্ণ ভাবে করে স্পর্শ। সবিতা অনুভব করে,—তার প্রতি স্বামীর আর আগের মত আকর্ষণ নেই, জপতপের দিকেই তার আকর্ষণ বেড়ে উঠছে। সে মনে মনে শিউরে ওঠে।

একদিন বিষ্ণুপদ স্ত্রীকে কাছে ডেকে এনে বুঝিয়ে বলে,—"দেখ, এ সংসার মায়াময়, আনন্দহীন। আমার আর ভাল লাগছে না, মনে করছি তীর্থ ঘুরে আসি।"

সবিতা উৎসাহিত হয়ে ওঠে,—"বেশ তো, চল না দু'জনে কিছুদিন বাবা বদ্রিনাথকে দর্শন করে আসি।"

বিষ্ণুপদ আপত্তি করে—"দুজনে হবে না। আমায় একা যেতে হবে, তোমাকে তোমার বাপের বাড়ী থাকতে হবে।"

সবিতা বাধিত হয়ে বলে,—"আমি যাব না কেন? কি দোষ করেছি।"

বিষ্ণুপদ উদাসীন ভাবে ব্যক্ত করে—"তুমি যে নারী, তোমার যাওয়া চলবে না। কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী গুরুর আশ্রমে তোমার স্থান হবে না। তাঁর আদেশ—দীক্ষা নেওয়ার সময় হয়েছে, আমায় একা যেতে হবে।"

সবিতা কঠিন স্বরে নির্দ্দেশ করে—"কে তোমার গুরু শুনি?"

বিষ্ণুপদ নিরুদ্বেগে উত্তর দেয়—"কলি যুগানন্দ স্বামী—মোটা পুরুষ।"

সবিতা দৃঢ়কণ্ঠে বলে,—"তোমার যাওয়া কিছুতেই হবে না।"

বিষ্ণুপদ কাতরভাবে নিবেদন করে—"দীক্ষা আমাকে নিতেই হবে। গুরু চাই—দীক্ষা চাই; গুরু সাধন মন্দিরের প্রধান দ্বারী, তাঁর কৃপা না হলে কিছুই হবে না। জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কি? ঈশ্বরকে জানা। গুরুদেব বলেছেন—'আমি তোমাকে ঈশ্বর দেখাব। সংসার ত্যাগ করে আমার কাছে চলে এস। এই দেখ তাঁর চিঠি।—" বলে, পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে সবিতার হাতে দিল।

"কই দেখি"—বলে সবিতা তার হাত থেকে চিলের মত ছোঁ মেরে চিঠিটা ছিনিয়ে নিল। এক নিশ্বাসে চিঠিটার ওপর আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে নিয়ে কর্কশ স্বরে বলল,—"ভেতরে ভেতরে তোমার এই সব হচ্ছে! তাই তোমার দু'বছরের কমে যান হয় না। তাই তুমি চুল ছোট ছোট করে কেটেছ। তাই তোমার মাথায় টিকি, মুখে দাড়ি! কেন, আমাকে কি তোমার পছন্দ হয় না?" সবিতার গলার স্বর ভারী হয়ে এল।

বিষ্ণুপদ ভক্তিতে গদগদ হয়ে বলল,—"কি করি বল। প্রেরণা যখন আসে তখন এইভাবেই আসে। সংগুরুর অভাবে আমি নাস্তিক ছিলাম, আমার জীবন এতদিন বৃথা গেছে, তিনি আমাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন। যাদের যে কি আনন্দ সবিতা, তুমি বুঝতে পারবে না। ছার এই সংসার, ছার তুমি—ছার আমি। সমস্ত তিনি ময়।"—বলে, হাত দুটো জোড়া করে কপালে ঠেকিয়ে নিল।

সবিতা ক্রুদ্ধ হয়ে বলল,—"মুখে আগুন তোমার সেই 'তিনির'। আমার সর্বনাশ করে তোমাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেবে? দেখি তোমার গুরুর কত বড় বুক।"

আবেগের সুরে বিষ্ণুপদ মিনতি করে,—"নাঃ, নাঃ সবিতা। আমাকে বাধা দিও না, বিষ্ণুপ্রিয়ার ত্যাগের কথা স্মরণ কর। নিমাইকে সে বাধা দেয়নি। আমি আজ বুঝতে পেরেছি,—সংসার মায়া, অনিত্য। তিনিই সত্য। লক্ষ্মীটি আমাকে দীক্ষা নিতে নিরস্ত কর না।"

সবিতা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে স্বামীর পা জড়িয়ে ধরে, বলল, "ওগো, আমার অমন সর্বনাশ করো না, সন্ন্যাসী না হয়েও তাঁকে পাওয়া যায়।"

—"না, না, সবিতা, তাঁকে সংসারে থেকে পাওয়া যায় না। তোমাকে আমি এতদিন যে ভালবাসা দিয়ে এসেছি, সেই ভালবাসা ঈশ্বরকে সমর্পণ করতে হবে। তবেই তাঁকে পাওয়া যাবে। হা ভগবান, তা কৃষ্ণ, হা কালী!"—বলে বিষ্ণুপদ নিজের বুকে ঘন ঘন করাঘাত করতে থাকে।

সবিতা ডুকরে কেঁদে উঠল। করুণভাবে বলল,—"তা হলে আমার কি হবে? ওগো বল—আর আমায় কি তুমি ভালবাসবে না? আমায় অনাথ করে চলে যাবে?"

বিষ্ণুপদ গম্ভীর স্বরে উত্তর করল—"উপায় নেই। সব ভালবাসা আমি তাঁকে সমর্পণ করে দিয়েছি। জয় গৌর হরি—জয় কলিযুগানন্দ স্বামী। আমার কম্বল কই? কমণ্ডলু নিয়ে এস, গীতা দাও—আমি যাবে বলব।"

সবিতা এবার কঠিন হয়ে উঠল। সরোষে তার কমণ্ডলু আছড়ে ভেঙে দিল। গীতা কুটি কুটি করে ছিঁড়ে ফেলল, কম্বল জোড়া বাইরে সজোরে ছুড়ে ফেলে দিল। তার

পেলসা কাপড় চারর টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তারপর বেওয়ালে হেলান দিয়ে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্ত্তির সামনে দাঁড়িয়ে সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না জুড়ে দিল।

হঠাৎ সবরের খড়া নড়ে উঠল। তার পিওন এসেছে। এনেছে চিঠি। কি একটা অনুমান করে সবিতা শঙ্কিত হয়ে উঠল। তার বুকের ভেতর শুরু হল হাতুড়ির আঘাত। কাঁদতে কাঁদতে দ্রুতপদে সে ছুটল চিঠির উদ্দেশে। বিকুপদ তাকে করল অনুসরণ।

"পোড়ার মুখো শুকর চিঠি। আমার সর্ব্বনাশ করতে এসেছে"—বলে, লেফাপা সমেত চিঠিখানা ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হল। চোখের কোণে তার আগুনের ফুলকি।

চিঠিটা কুটি কুটি হওয়ার আগেই বিকুপদ তার হাত থেকে সেটা ছিনিয়ে নিল। তারপর চিঠিটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আক্ষেপের সঙ্গে বলল,—"কি সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলে সবিতা। এ শুকর চিঠি নয়; নতুন চাকরী পাওয়ার চিঠি। এই তো সেদিন ইণ্টারভিউ দিয়ে এলাম।

সবিতা আঁচলে চোখ মুছে ফোঁপাতে ফোঁপাতে অপরাধীর মত উত্তর করল—"আমি কি করে জানব! তুমি কি আমায় কিছু বলেছিলে? তুমি তো সন্ন্যাসী হয়ে যাচ্ছিলে।"

বিকুপদ হো হো করে হেসে বলল,—"দূর পাগল অতিনয় বোঝ না। চল ঠাকুর প্রণাম করবে চল।"

সবিতা হেঁট হয়ে স্বামীর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলল,—"ও-ঠাকুর আর না, আমার আজ ঠাকুর তুমি। তোমাকেই আমি এবার থেকে পুজো করব।"

কৃষ্ণকলি

(উপন্যাস)

শ্রীকণপ্রভা ভাদুড়ী

(১)

অফিসে যাবার জন্য বরুণ পোষাক পরছিল। এমন সময় ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠল টেলিফোনের ঘন্টা। সে তাড়াতাড়ি গিয়ে রিসিভারটা কাণে তুলে নিয়ে প্রশ্ন করলে।

—"হ্যালো কে?"

—"আমি সুধা বউদি।"

—"আপনি এখুনি একবার আসুন।"

—"যাচ্ছি বৌদি—কিন্তু ব্যাপার কি?"

—"এলেই জানতে পারবেন।"

—"আর ঘন্টার মধ্যে আমি যাচ্ছি।"

—"ধন্যবাদ।"

রিসিভার নামিয়ে রেখে বরুণ মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

ব্যাপার কি? বউদি ত' কিছুই বললো না? শরদই বা কোন কোরল না কেন? ওর কিছু শরীর খারাপ হয়নি ত"? নিশ্চয় শরদেরই কিছু হয়েছে; তাই ব্যস্ত হয়ে সুধা তাকে ডেকেছে। ভাগ্যে তার আগে খাওয়া হয়ে গিয়েছিল না হ'লে। গতরাত্রির অনাহারের পর, আজ ভাত না খেয়ে সে কোনও কাজই করতে পারতো না। যথারীতি পোষাক পরিচ্ছদ পরে, সে সুধাদের বাড়ীর উদ্দেশে রওনা হোল।

দ্বিতলের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল সুধা; বরুণকে আসতে দেখে দ্রুত পায়ে নীচে নেমে এল!

"ব্যাপার কি বউদি—হঠাৎ এমন করে ডাকলেন কেন?" বরুণের চোখে মুখে গভীর উদ্বেগ!

সুধা গম্ভীর স্বরে বললে, "ঘরে আসুন সব বলছি।"

সুধার পিছনে পিছনে ঘরে প্রবেশ করে একটি সোফায় বসে, সে উত্তরের আশায় সুধার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

"আমি এখানে থাকবো না ঠাকুরপো;" সুধা কিছু

ভূমিকা না করে বললে, "আপনি আমায় দেশে যার কাছে পৌঁছে দিন"—

"কেন আপনার হোল কি? শঙ্কর কোথায়, তাকে দেখছি না যে"। বিস্ময়ে রঞ্জনের মুখে আর কথা ফোটে না।

দেখতে দেখতে সুধার গম্ভীর মুখ ম্লান হয়ে গেল। একটি নিঃশ্বাস গোপন করে সে বললে, "তার কথা আমি কিছু জানি না, মদন বললে, ভোরবেলা সে বেরিয়ে গেছে—এ বেলা ফিরবে না:"—

"তবে?" রঞ্জন বললে, "তার অবর্ত্তমানে আপনি বাড়ী থেকে চলে যাবেন"?

"কি করবো ঠাকুরপো আমার থাকবার উপায় নেই" সুধার গলা কেঁপে উঠল।

"ছেঁদালী করবেন না বৌদি," রঞ্জন দৃঢ়কণ্ঠে বললে, আপনাদের কি হয়েছে না বললে, আমি কিছুতে আপনাকে কোনও কথা দিতে পারছি না"—

সুধা তার বড় বড় কালো চোখদুটি তুলে রঞ্জনের পানে তাকালো, দেখতে দেখতে সে চোখ অশ্রুতে ছল ছল করতে লাগল। মুখ নীচু করে আঁচলে চোখ মুছে, বললে, আপনি শপথ করুন তাইতে একথা বলবেন না?"

সুধার চোখে জল দেখে, রঞ্জন মনে মনে ভারী বিব্রত বোধ করতে লাগল। সে বাধিত স্বরে বললে, "আমায় বিশ্বাস করুন বৌদি, আমি কাউকে বলবো না"—

"কাল রাত্রে হঠাৎ একটা সামান্য কারণ নিয়ে", সুধা গলাটা ঝেড়ে নিল একবার তারপর বললে, "ওর সঙ্গে আমার ঝগড়া হোল; পরে আমি নিজের ভুল বুঝতে পেরে ওর কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছিলুম;" কিন্তু সুধা আবার আঁচলে চোখদুটো মুছে নিয়ে বললে, "আমি ঘুমোচ্ছিলুম তখন ও আমাকে কিছু না বলে চলে গেছে।"

—"ওঃ এই কথা;" এতক্ষণে রঞ্জনের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠল। সে বললে, "চলে আর যাবে কোথায়? আমাদের জমিদারীর মাঠে, একটা সভা হবার কথা আছে, তারই ব্যবস্থা-করবার জন্য ভোরবেলা গেছে বোধহয়। জানেন, ও কি রকম কাজ পাগলা লোক? কাজ শেষ হয়ে গেলেই চলে আসবে"—

"না ঠাকুরপো না; বাধা দিয়ে সুধা বললে, আপনি জানেন না, আমি ওর মনের মত নই বলে, ও সব সময় আমায় দূরে সরিয়ে রাখে। আমার কথা সহ্য করতে পারে না"—

"আপনি এতদিনেও ওকে চিনলেন না।" রঞ্জন স্নিগ্ধ স্বরে বললে, "আপনাকে ছাড়া ওর একদিনও চলবে না—লক্ষ্মী বউদি আপনি ওর মনের মত হতে চেষ্টা করুন"—

—"আমি পারবো না" সুধা দৃঢ়কণ্ঠে বললে।

—"পারবেন না?" রঞ্জন কোমল কণ্ঠে বললে, "মানুষ কি মনের মত সব জিনিষ খুশীমত হাতের কাছে পায়? আপনিই বলুন?"

সুধা কথার কোনও উত্তর না দিয়ে নীরবে বসে রইল। রঞ্জনের আন্তরিকতার স্পর্শে তার মনের অভিমান যেন ম্লান হয়ে আসছিল। কিন্তু সে মনোভাবকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেবেনা বলে, এই নীরবতার আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। রঞ্জনের নিজের হৃদয়ও শঙ্কার প্রেমে উন্মাদ। কিন্তু শঙ্কার হৃদয়ের কাছ থেকে সম্পূর্ণ সাড়া না পেয়ে সে অভিমানে গর্জ্জিত হয়ে রয়েছে। সে বুঝতে পেরেছে ভালোবাসা ব্যর্থ হলে, তার প্রতিক্রিয়া বড় বেদনাদায়ক হয়। তাই সে প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগল, সুধাকে সেই ব্যর্থপ্রেমের বেদনাবহন থেকে রক্ষা করবার জন্য। সে বললে, "চুপ করে থাকলে চলবে না বৌদি; কথা আপনাকে বলতেই হবে"—

কি কথা বলবে সুধা? আর বলার আছেই বা কি? স্বামীর সঙ্গে তার মতের মিল হয় না, এই ত একমাত্র কথা? কিন্তু এই কথাটি বাদ দিলে তার জীবনের সমস্তই ত শঙ্করময়। কিন্তু শঙ্করের সঙ্গে কেন তার মতের মিল হয় না? তার যে এত রূপ, শঙ্কর কেন কখনও ভালো করে চেয়ে দেখে না? কয়েক মিনিট উত্তরের প্রত্যাশায়, সুধার মুখের পানে চেয়ে থেকে, যখন কোনও উত্তর পেল না; তখন রঞ্জন উঠে গিয়ে সুধার পাশে চৌকীতে বসল। ধীরে ধীরে অতি স্নেহসিক্ত কণ্ঠে ডাকলে, "বৌদি, শুনুন; আমি আপনার বড় ভাইয়ের আমার কথা আপনি শুনবেন না?"

সুধা জীবনে স্নেহ ভালোবাসা অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে

পেয়েছে ; তাই তার হৃদয় স্নেহের জন্য কাঙাল ছিল না ; বহু ক্ষেত্রে সে মানুষের অন্তরের দিকে কখনও দৃকপাত ও করত না ; কিন্তু রঞ্জনের কথার সুরে, যেন তার মৃতা পিতামহীর স্নেহ উৎসারিত হয়ে উঠছে ; ঠিক এমনি, আন্তরিকতা, এমনি দরদ ভরা ছিল সেই স্নেহের স্পর্শ। সুধা মনে মনে বিচলিত হয়ে উঠলো ; তার সুঠাম তনুলতা থর থর করে কাঁপতে লাগল। ব্যথিতে সে দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢেকে ফেললে।

রঞ্জন বুঝতে পারল তার মানসিক বিপর্যস্ত অবস্থা। সে অতি সন্তোষে বহু চিন্তা করে ধীরে ধীরে সুধার পিঠে হাত রেখে বললে "ছিঃ বৌদি, ছেলেমানুষের মত এমন করে কাঁদে কি ? আপনার কি দুঃখ আমার কাছে বলুন ; আমি যেমন করে পারি, তার প্রতিকার কোরবো"—

হঠাৎ সুধা মুখ তুলে, রঞ্জনের অপর হাতখানি, দুই বলে নিজের দুই হাতের মধ্যে নিয়ে বললে, "সত্যি বলছেন ঠাকুর পো ?"

"হ্যাঁ, আমি তোমায় সত্যিই বলছি", রঞ্জন সুধার অশ্রুসিক্ত করুণ মুখের পানে চেয়ে সস্নেহে বললে, "তোমার মনের কোন জায়গায় ব্যথা আমায় বল।"

"সত্যি ঠাকুর পো ?" সুধা তার হাতখানি ধীরে ধীরে ছেড়ে দিয়ে গোপনে একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললে, "আপনি পূর্ব জন্মে আমার নিশ্চয়ই নিজের দাদা ছিলেন ; আমি আপনাকে দাদা বলে ডাকবো কেমন ?"

"নিশ্চয়ই ডাকবে বৈকি" রঞ্জন তার মানসিক পরিবর্তনে মনে মনে খুশী হয়ে উৎসাহের সঙ্গে বললে, "তাতে আমি ভারী আনন্দ পাবো ; কিন্তু তোমার দুঃখের কথা দাদাকে না বলে যদি মনে মনে কষ্ট পাও, তবে, আমি ও যে কষ্ট পাবো বৌদি" ?

"আমার দুঃখ" ? বলে সুধা হাসতে চেষ্টা কোরলো ; কিন্তু তার বয়সের মত দাদা মুখে, হাসির কোনও রেখাই ফুটল না। হঠাৎ সে চঞ্চল হয়ে বললে, "হ্যাঁ, দাদা, তোমায় আমি বলবই ; তানা হলে এমন কষ্ট করে বেঁচে থাকতে আমি পারবোনা"—

"তোমার মনে কোনও দুঃখ থাকতে আমি দোবনা বৌদি, রঞ্জন বললে, "দাদাকে তুমি বিশ্বাস করো"—

সুধা মুখ নত করলো। এতক্ষণ পরে তার সমস্ত মুখে ফুটে উঠল, একটা গোপনীয় আভা। সে বললে, "জানো দাদা, আমি বুঝতে পেরেছি, ও আমায় ঠিক মনের মত করে ভালো বাসতে পারে না"—

মনে মনে চমকে উঠে রঞ্জন বললে, "কেন বৌদি" ?

"আমি লেখাপড়া জানিনা বলে", সুধা বললে, "সে চায় আমি লেখাপড়া করি, কিন্তু লেখাপড়া করতে এই বুড়ো বয়সে আমার মোটে ইচ্ছে করে না"—

"তুমি ঠিকই বলেছ বৌদি, রঞ্জন বললে, তবে তুমি যদি নিজে সুখী হতে চাও, ও স্বামীকে সুখী করতে চাও, তবে তোমায় ত কিছু ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে।

আজীবন আদরে পালিতা সুধা অকস্মাৎ, অসহিষ্ণু হয়ে বললে, "আমারই কি সব দায়িত্ব দাদা, ওর কিছু করবার নেই ? ওর কিছু দোষ নেই ?"

আবার তার পিঠে মৃদু করস্পর্শ করে রঞ্জন বললে, ওইখানেই ত মজা বৌদি, সংসারের সমস্ত ভালো মন্দর দায়িত্বটুকু ত তোমরা আঁচলে বেঁধে রেখে দিয়েছ। প্রয়োজন কালে তার ব্যবহার ত করতেই হবে। অসহিষ্ণু হয় না বোন, ভালো করে আমি যদি শোন"—

আঃ এমন দরদ ভরা কথা সুধা কতদিন শোনেনি ? সে নীরবে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে রঞ্জনের মুখের পানে তাকাল।

রঞ্জন বললে, শঙ্কর লেখাপড়া ভালোবাসে আমি জানি। কিন্তু তোমার তা শিখতে যদি ইচ্ছে না করে তবে জোর করে সে চেষ্টা কোরনা। তার বদলে, লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা কর, যাতায়াত বেরোনো অভ্যাস কর ; গান বাজানা শেখো।"

উৎসাহিতা হয়ে সুধা বললে ; "তাই বেশ দাদা ; কৃষ্ণা বলেছে মাঝে মাঝে, আমায় এসে গান শিখিয়ে যেতে"—

কৃষ্ণার নাম শুনে রঞ্জন কিছুক্ষণের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে আত্মসংবরণ করে নিয়ে বললে, "ও মাঝে মধ্যের কাজ নয় বৌদি ; আমি শঙ্করকে বলে বাড়ীতে ওস্তাদের কাছে গান শেখার ব্যবস্থা করে দেব তোমার—আর একটা কথা"—

"কি ?" সুধা বললো।

"তোমাকে একটু সহজ হতে হবে ; জানোতো, শঙ্কর

নিজে ধনী হলেও কত সহজ সরল ভাবে থাকে, সকলের সঙ্গে অকপটে মেলামেশা করে? তোমাকেই বাইরে যাতায়াত করে এই রকম সরল জীবন যাপন করতে অভ্যস্ত হতে হবে"—

—"বেশ তাই কোরবো"।

—"আরও একটা কথা"।

"কি দাদা"? সুধা বললে।

একটু ইতস্তত: করে রঞ্জন বললে, "তোমার ওই অদ্ভুত সুন্দর রূপের জন্য মনে মনে একটুও অহঙ্কার যাতে চলবে না"—

"যাঃ" সুধা লজ্জিত হয়ে মাথা নীচু করল।

"না, না, টা নয়", রঞ্জন বললে, "সত্যি কথা, রূপের কথা, মনে না থাকলে, তুমি সহজ ভাবে মেলামেশা করতে পারবে। জানোতো, আমাদের দেশের বেশীর ভাগ লোক গরীব; তুমি যদি তাদের সঙ্গে হীরে-জহরত টিনু বেনারসী পরে মেলামেশা করতে যাও; তারা তবে ত তোমার সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারবে না—"

"হ্যাঁ সে কথা ঠিক;" ঘাড় নেড়ে সুধা বললে, "তবে দাদা?"

বাধা দিয়ে রঞ্জন বললে, "হ্যাঁ, তুমি বিশেষ বিশেষ ঘরোয়ার যখন যাবে, তখন ওসব ব্যবহার করবে বইকি? যেমন সামাজিক নিমন্ত্রণ বাড়ীতে কিংবা, সিনেমা থিয়েটার, অলসা পার্টি ইত্যাদি; তখন সেজো প্রাণ ভরে।"

নিজের অঙ্গের মূল্যবান অলঙ্কারগুলির পানে চেয়ে, সুধা বললে, "তা হলে ও সুখী হবে, এই করলে, আমার পরে আর রাগ করবে না"—

—"এই পথে চললেই তুমি সুখী হবে"; রঞ্জন বললে, "শঙ্করও সুখী হবে"—

—"তুমি আমায় মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যেও দাদা"—

—"আজই নিয়ে যাবো, বিকেল চারটে নাগাদ আসবো আমি, তুমি খুব সাদাসিধে ভাবে প্রস্তুত হয়ে থেকো, কেমন?"

কোথায় নিয়ে যাবে দাদা"?

"সে গেলেই দেখতে পাবে; আজ এখন আমি যাই; আবার ওবেলা আসবো।"

রঞ্জনের সঙ্গে সঙ্গে যাতায়াত পর্য্যন্ত এসে, সুধা তাকে পৌঁছে দিল। তারপর পুনরায় ঘরে ফিরে এসে ক্লান্ত ভাবে একটা সোফার উপর শুয়ে পড়ল। শুয়ে শুয়ে কেবলই তার শঙ্করের কথা মনে পড়তে লাগল—অথচ একটুও রাগ হচ্ছে না, বেন আরও বেশী করে তাকে ভালো বাসতে ইচ্ছে করছে—কি আশ্চর্য্য; রঞ্জন কোনও যাদু মন্ত্র জানে নাকি?

(ক্রমশ:)

রেলওয়ে টাইম টেবল্

শ্রীঅরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সাহিত্যিক আমি নই সত্যি কথা, তবে সখ করে অনেক সময়ে টুকি-টাকি কিছু লিখে রাখি—তা'র কোনও কোনওটা ধুলোয় বন্ধী হ'য়ে যাওয়ার পাতাতেই থেকে যায় আর কোনওটা হয়ত বা কখনও কোনও নাম না জানা সাময়িক পত্রিকায় ছাপার হরফে আত্মপ্রকাশ করে।

মহালয়ার আগেই কলকাতার বাজার "পূজা সংখ্যায়" ছেয়ে ফেলবে—ঐসব সংখ্যায় থাকবে বড় বড় নাম করা লেখকের সুচিন্তিত লেখা; 'নাম না জানা' আমার মত একজনের লেখা এসব বিশেষ সংখ্যায়! খুব হতাশ হ'য়ে পড়ি। হঠাৎ সে দিন আমার পরিচিত, প্রবীণ সাহিত্যিক মহাশয়ের সঙ্গে দেখা, বেল-আপিসে দু'জনেই চাকুরী করি, কাজে কাজেই একটু অন্তরঙ্গতা জন্মেছে। তিনি আমাকে উৎসাহ দিলেন কিছু একটা লিখতে এবার—কোনও এক

পত্রিকার "পূজা সংখ্যায়" ছাপিয়ে দেবার আশ্বাস দিলেন; আজ তাই কলম নিয়ে বসেছি।

সুখ-দুঃখে, আলোয়-অন্ধকারে দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল! মাস খানেক পরেই আনন্দময়ীর শুভাগমন! জানি না আনন্দময়ী মা এবছর কতটা আনন্দ দিতে পারবেন! চারদিকেই ত দেখি অভাব আর অনটন—দৈনন্দিন জীবন বড় একঘেয়ে আর বেসুরো হ'য়ে উঠেছে; আসন্ন পূজার কথা ভেবে তাই বোধহয় উৎফুল্ল হ'তে বিশেষ কাউকে দেখছি না। মাসটা কাবার হ'লেই আসবে আবার চাঁদার তাগিদ—গিন্নি এখন থেকেই 'বোম্' ধরেছেন "বন্ধুবান্ধব দিন, আহা দেখ বাড়ীর কেউ যেন বিমর্ষ না থাকে.....।" অর্থটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারি কিন্তু সত্যি আমি একেবারে নাচার! গিন্নির কথাগুলো মনের মধ্যে তোলপাড় করে আর কি। যাক্ ওসব কথা—ঐ সমস্যা আলোচনা করার জন্যে ত অনেক মনীষী রেখে আছেন আর পূর্বে বহুবার তাঁরা ঐ বিষয়ে আলোচনা করেছেন সুতরাং আমি যা বলতে চাই তাই বলি এবার।

সেদিন বিকেল পাঁচটার কোঁকে এক পশলা বৃষ্টি নামল। "কেদারী ঝেড়ার" বৃষ্টি। অফিসে বসে গল্প-গুজব করছি হঠাৎ আমার এক সহকর্মী জিজ্ঞেস করল "হ্যাঁ রে, পালের কবে ছরখাস্ত করছিস—হঠা সেপ্টেম্বর ছরখাস্ত দেবার শেষ তারিখ কিন্তু।" প্রতি বছরের হতাশা বুকের মধ্যে একঝোটে চাড় দিয়ে উঠল তবুও বলে ফেললাম "নাঃ, এবারে আমি যেযোবই যেযোব—দেখে নিস্।"

বাড়ী ফিরেছি অনেকক্ষণ। বৃষ্টি থেমে গেছে। বারান্দার একটা চেয়ারে পা'টা এলিয়ে দিয়ে চুপচাপ ভাবছি কলকাতার বাইরে কোথায় যাওয়া আর তার আনুসঙ্গিক খরচ-পত্তরের কথা। গিন্নির হঠাৎ বারান্দায় আবির্ভাব—মনের কথাটা তাঁকে বলব কি বলব না ভাবছি; শেষ পর্যন্ত বলেই ফেললাম। শুনে তিনি ত চটে আগুন—"প্রতি বছর পুজোর সময় তোমার ঐ ইচ্ছেটা জাগে, কই একবারও ত বেরোতে দেখলাম না—ওসব বাজে কথা ছেড়ে দাও, তবে 'বেনা-কাটা' আরম্ভ করছ তাই বল।" 'বেন-কাটা' ত আছেই, পুজোর আগামটা পেলেই আরম্ভ করে দেব। তবে তুমি রেখে নিও, এবারে আমরা যেযোবই।" গিন্নি চলে যান রন্ধন-মহলে। আমি ডাক দিই "পিন্টু, বড় টাইম টেবলটা ওপর থেকে নিয়ে আয় ত।"

সন্ধ্যা আটটা মাত্র—খেতে এখন অনেক দেরী। তক্তপোষের ওপর টাইম টেবলটা মেলে ধরি। তারিখটা দিনের ত মোটে দুটী। এই অল্প সময়ের মধ্যে কম খরচায় কোথায় কোথায় ঘুরে আসা যায়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের টাইম টেবলের পাতাগুলি এবার-ওবার করছি—নজর পড়ল 'পুরী'নামের ওপর। মন্দ হ'বে না—মাত্র ১২ ঘন্টার পথ; রাত্তিরের গাড়ীতে চাপলে সকালেই পুরী। লোকে বলে ভারতে নাকি সর্বসমেত চারটী 'ধাম' আছে। উত্তরে বদরিনাথ, পশ্চিমে দ্বারকা, দক্ষিণে রামেশ্বরম্ আর পূর্বে জগন্নাথধাম। তীর্থকে তীর্থও করা হ'বে আর বেড়ানও যাবে। সকাল, বিকেল আর রাত্তিরের কিছুটা সময় সমুদ্রের ধারেই কাটিয়ে দেব। সকালের সূর্যোদয়, সন্ধ্যার সূর্যাস্ত, দিগন্ত-প্রসারী সমুদ্রের গুরু গুরু ডাক, ঢেউয়ের পর ঢেউ আর তা'র দুরু দুরু শব্দ—চুপচাপ ভাবছি। খাওয়ার সময় হ'ল। খাওয়ার পর বিছানায় টাইম টেবলটা নিয়ে আবার পাতা ওল্টাতে লাগলাম। ভুবনেশ্বর? না, অত কাছে গিয়েও ভুবনেশ্বরে ঘুরে না আসতে পারলে একটা দুঃখ থেকে যাবে—রেলযোগে খুব কম সময়ের মধ্যেই পুরীর থেকে ভুবনেশ্বরে আসা যায় দেখছি। কিন্তু কোণারকের বিখ্যাত সূর্যমন্দির দেখা হ'বে না! দেখি খরচ-পত্তরে কুলিয়ে উঠতে পারি কি না। ঘুম চোখে জড়িয়ে আসে।

সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি আমার বুকের ওপরে খোলা অবস্থায় পড়ে আছে টাইম টেবলটা—ভুলে রাখি সেল্ফের ওপরে। অফিসের বেলা—তাড়াতাড়ি বাজার সেরে আসি। অফিস থেকে ফেরার পর আজকাল আর কোথাও বেরোই না—আমার অবসর সময়ে চিত্ত-বিনোদনের সাথী টাইম টেবলটাকে নিয়ে বসে থাকি। কখনও রেলপথের মানচিত্রটা নিয়ে ভাল করে পর্যবেক্ষণ করি আবার কখনও বা চোখ বুলাই ভ্রমণ-সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় খবরাখবরের পাতাগুলিতে—কোথায় কোন সময়ে গাড়ী-বদল, কোথায়

হোটেল বা ধর্মশালা ইত্যাদি……। আচ্ছা, হরিদ্বার ঘুরে এলে কি রকম হয়? এই ত রেলের লাইন বরাবর মোগলসরাই, বেনারস, ইলাহাবাদ, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, আকবরাবাদ ইত্যাদি ক'রে হরিদ্বার আর তারপর ডেরাডুনে গেছে। কলকাতার থেকে মাত্র ৩৬ ঘণ্টার ব্যবধান—হরিদ্বার। প্রাক্ রেলযুগের কথা ভাবি আর 'বিজ্ঞানের' জয়যাত্রা অটুট থাকুক কামনা করি। রেলওয়ের আমি অবসরপ্রাপ্ত চাকুরীয়ার সামিল অর্থাৎ কি না প্রায়ই বাইরে বাইরে ঘুরতে হয় তাই অনেকবারই বারণ্যর কর্মোপলক্ষে যাতায়াত করবার সুযোগ পেয়েছি। হরিদ্বারের সেই 'হর্ কি পৌড়ি ঘাট'—সন্ধ্যায় ঝরণা পাহাড়ের ওপর সন্ধ্যারতির দৃশ্য আর নীচে ঘাটের ওপর ভক্তদের "হর্ কি পৌড়ি রাধে শ্যাম

বোল রাধে রাধে শ্যাম ··" ভজন গান। আর কি চমৎকার বাতাস!

হরিদ্বার থেকে হৃষিকেশ—এইত ছোট্ট শাখা লাইন। হৃষিকেশ ষ্টেশন, লছমন্ ঝোলা ইত্যাদি……। মাঝখানে পড়বে রাইওয়ালার ঘন বন।

টাইম টেবল্ সংলগ্ন রেলপথের মানচিত্র আমার সামনে খোলা আর আমি কল্পনার রথে সব জায়গায় ঘুরছি! ফিরে আসি বাস্তবতায়। আচ্ছা, হরিদ্বার থেকে দিল্লী এবং আগ্রার পথে গেলে কি রকম হয়—সময় হ'লে দুজায়গাটাও ঘুরে নেওয়া যেতে পারে। এই ত মুঘোরী এক্সপ্রেস—হরিদ্বার ছাড়ছে রাত্রিবে আর সকালেই দিল্লীতে পৌঁছে যাচ্ছে। দিল্লী ভারতবর্ষের রাজধানী। কত শত যুগের ইতিহাস দিল্লীর ধূলিকণায় লুকিয়ে আছে! মহাভারতের কুরু-পাণ্ডব থেকে নিয়ে পাঠান, মুঘল আর ইংরাজ প্রত্যেকের স্মৃতি বিজড়িত দিল্লীর বুকে—কল্পনার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আকাশ চুম্বী কুতবমিনার, লালকেল্লা, জুম্মা মসজিদ, ওখলার বাঁধ ইত্যাদি……। লাইনটা দিল্লীর থেকে ঘুরে এই ত আগ্রায় গেছে। আগ্রা ফোর্ট ষ্টেশন। স্বপ্ন সৌধ তাজমহল—কত কবি কত ভাবে কত ছন্দে এর রূপ বর্ণনা করেছেন তার ঠিক নেই। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ গাইলেন "কালের কপোল তলে শুভ সমুজ্জ্বল……।" আগ্রা ফোর্ট থেকে লাইনটা সোজা গেছে আবার আজমীরে। আজমীর—রাজস্থানের প্রসিদ্ধ সহর। আজমীর থেকে যাওয়া যেতে পারে পোয়ালিয়র, চিতোর-গড়, উদয়পুর, যোধপুর ইত্যাদি রাজস্থানের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ সহরগুলিতে। এই সহরগুলির প্রতিটী স্তম্ভ আর প্রাচীর রাজপুত জাতির শৌর্য, বীর্যের কথা বহন করছে। কোথায় সেই নির্ভীক রাণা প্রতাপ আর কোথায়ই বা সেই তেজস্বিনী মহিলা পদ্মিনী!

এমনি করে প্রত্যহই টাইম টেবলের পাতার মধ্যে বিভোর হ'য়ে থাকি। টাইম টেবল্‌কে হাযাম করে কল্পনার রথ না ঘুরে সুদূর দেশে ঘুরে বেড়াই। কখনও যাই তুষারাবৃত দার্জিলিংএর 'টাইগার হিলে' সূর্যোদয় দেখতে, কখনও উঠি গিয়ে কুতবমিনারের চূড়ায়, কখনও বসে থাকি পুরীতে সমুদ্র-বেলায় আর কখনও বা রাজপুতানার মরুভূমি পার হই দ্রুত পদক্ষেপে।

দিন এগিয়ে চলে—টমক্ নড়ে গিন্নীর তাগিদে "বলি ঠিক হোল, কোথায় যাবে?" মুখে কি রকম যেন একটা বাঙ্গের হাসি—সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যায়। ভাবি, আর সময় কোথায়? কাল বাদে পরশুই ত পুজো! যাওয়া আর হোল না কোথাও শেষ পর্যন্ত।

পুজো কেটে গেছে; 'কেনা-কাটা'র পর্ব্ব অন্যান্য বছরের মত এবারেও গিন্নী করেছিলেন। বাকি কিছু পড়েছে—শোধ দিতে হ'বে ক্রমশঃ। বাড়ীর সকলের মিষ্ট মুখে হাসি—আনন্দিত, আনন্দময়ী মা তোমার জয় হোক।

বন্ধু টাইমটেবল্! সত্যমুখে তোমায় অভিনন্দন করি। তোমার প্রভাব আর সাহচর্য্য অন্ততঃ দিন কয়েকের জন্যে আমার দৈনন্দিন জীবনের প্রহরগুলি মনোরম করে তুলেছিল। তুমি আমার বন্ধু, সুহৃদ।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে টিক্ টিক্ করে—কাল অফিস খুলছে।

অফিসে এসেছি। বন্ধুদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়। পরস্পর পরস্পরের কাছে জানতে চায় কে কোথায় গিয়েছিল ছুটিতে বেড়াতে?" টেবলের ওপর রাখা টাইমটেবলটার দিকে তাকিয়ে থাকি—মাথা নেড়ে জানাই "কোথাও নয়।"

অন্নপূর্ণা স্মরণে

শ্রীঅরুণ সরকার

সময়ের সঙ্কোচনের পথ ধ'রে গুটি গুটি যে পরিবেশ মনের কোমল স্থানে নিজের ঠাঁই ক'রে নেয় তাকে এক সময়ে দেখা যায়—যখন সে এক মহীরুহ হ'য়ে বসে আছে। তার মূল এমন গভীরে নামিয়ে দিয়েছে যা আর উৎপাটনের সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে।

এমনি করেই অপরিচিত মানুষের অপরীরি আত্মা অজ্ঞাতে পরিচয়হীন মানুষের অন্তরে প্রবেশ করে এবং তার নিশানা তখনই পাওয়া যায়, যখন 'অপরিচিত', 'সম্পূর্ণ পরিচিতের' নামকরণ নিয়ে মনের বন্ধ অর্গলে ক্রমান্বয়ে আঘাত হানে—মনোজ্ঞা খোলার দাবী নিয়ে।

লেখার মাধ্যমে নিতান্ত সাধারণ শিষ্টাচারের বশবর্তী হ'য়ে বিজয়া দশমীর শ্রদ্ধা জানিয়ে যখন চিঠি দিয়েছিলাম অন্নপূর্ণা গোস্বামীকে তখন কে জানত এই চিঠিই হ'য়ে রইল "বসুধৈব কুটুম্বকম্" অর্থাৎ সকলেই আপন জন। প্রবাদ আছে যে 'যেমনটি সে তেমনটি পায়'। আমি যখন চিঠি দিই তখন ভেবে ছিলাম অপর পক্ষ সেই একই আগ্রহ নিয়ে জবাব দেবেন। অবশ্য বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটলই তাই। শ্রীমতি গোস্বামী তাঁর জবাবে জানালেন, "পরিচয় ছিল না—দেখা দেখেছি···। এবার পরিচয় হবে আনন্দের ছলে।"

উক্ত দু'লাইনের মধ্যে দূরকে নিকট আর পরকে আপন করে নেবার দুরন্তপণের শক্তি তাঁর মধ্যে দেখেছি। এই ধারণার মধ্যে যেটুকু সন্দেহ ছিল তা পরবর্তী চিঠিতে ঘুচে গেল। এবার যেন নির্মেঘ আকাশের ন্যায় স্বচ্ছ সুন্দর। বুকসাম পরকে আপন করবার জন্যেই তিনি আগ বাড়িয়ে রাস্তার মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে আছেন—অতিথির দেখা পেলেই টেনে নিয়ে আদর করে ঘরে তুলবেন।

অন্যান্য কথা বলার পর এবার লিখলেন, "মধ্যে মধ্যে আপনার চিঠি পেলে খুশী হব।"

মানুষ যে প্রকৃতির দাস। তার সে আন্তরীণ মনোবৃত্তি প্রকাশ পেয়ে থাকে, তার জীবন যাত্রার মাধ্যমে। ১৯৫৫ সালে অন্নপূর্ণা গোস্বামীর "নয়া ইতিহাস" ভারত সরকার কর্তৃক 'গণসাহিত্য' হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে।

"নয়া ইতিহাসের" মাধ্যমে যে ইতিহাস তিনি রচনা করেছিলেন তা মানুষ গড়ার কাজে 'নয়া' বললেই অত্যুক্তি হয় না। কেন না—যে দেশ প্রাচীন সভ্যতা নিয়ে গড়ে উঠে—আধ্যাত্মিক জীবনবেদে যার চরিত্র গঠিত—যার স্নেহ মন মানুষকে নরনারায়ণের রূপ নিয়ে পূজা করে এসেছে—সেই মানুষকেই বাঁচবার আর বাঁচাবার নয়া পথেরই তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন তার 'নয়া ইতিহাসে'।

মানুষকে মানুষ ক'রে দেখবার যে বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী তিনি লাভ করেছিলেন—তার আভাষ পাই "রেল লাইনের ধারে।" এখানে দেখা যায় রেল শ্রমিকদের অবহেলিত আর অপচয় জীবন যাত্রার এক পূর্ণ ছবি।

"নয়া ইতিহাসে" উনি প্রথম জীবনে যে পর্যায়ের মানুষ হয়েছিল—তাকে যে একই জীবনে আবার ভিন্নরূপে রূপায়িত হ'তে হবে সে কথা কি উনি কোন দিনও কল্পনা করতে পেরেছিল? না—তা বোধ হয় পারেনি।

যে যুগে মানুষ গ্রাম হিসাবে আত্মীয়তা বজায় রাখিত। পাড়ার হিসাবে কুটুম্বিতা করত—আজ তার পরিচয় কোথাও বিদ্যমান নেই। আজ কেবল স্বার্থে স্বার্থে সংঘাত—সকল আত্মীয়তার বেড়াজালে জীবন বিপর্যস্ত। গোয়ালিনী মাসী দুধ বেচে বাড়ী ফেরার মুখে উদ্বৃত্ত দুধটুকু গৃহস্থের বাড়ীতে বিনামূল্যে দিয়ে যেওয়া—পাড়ার চাঁড়াল দিদি লাল আটসের চালের ভাত রান্না করে পাড়ার বামুন কায়েতের ছেলেদের লোভাতুর আকাঙ্ক্ষার সাথ মিটিয়ে তাদের বিরস মুখ সরস করিয়ে তোলার তৃপ্তি অনুভব করত তা আজকের দিনে কল্পনা করা আশি ভাগ ভাড়াটে বাসিন্দার মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

শত কল্পনা আশি জন লোক আমাদের দেশে গ্রামে বাস করে। তাদের রোগে ঔষধ দেওয়া—তাদের ভবিষ্যত জীবনকে গড়ে তুলতে শিক্ষা বিস্তারের ব্যবস্থা করা—সহরের বিজ্ঞান সম্মত জীবন যাত্রার সঙ্গে যোগাযোগ করে অগ্রগতির পথে তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি বিষয়ের কথা আমাদের পরিবেশন করেছেন। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' স্পষ্ট করে একথা শ্রীমতি গোস্বামী তাঁর ছোট ইতিহাসে ফুটিয়ে রেখেছেন।

উর্দ্মির প্রীতি আর প্রেম, ঘাত-প্রতিঘাতের হাপরের অগুনে পুড়ে পুড়ে যখন উপযুক্ত অবস্থায় এসে দাঁড়াল—তখন তাকে বেছাবে গড়া দরকার ঠিক সেই ভাবেই সে গড়ে উঠল নিপুণ কারীগরের হাতে। যে আদর্শের জন্য নিয়ে তার আর শান্তনুর জীবন একমুখী না হয়ে দ্বিমুখী হয়ে উঠেছিল—তা পরিবেশের গুণে, মনের সংকীর্ণতা গেল ঘুচে—শান্তনুর সঙ্গে হল মিলন। মৃতপ্রায় প্রাচীন জীবন যাত্রার প্রাণ সঞ্চারে দায়িত্ব নিয়ে অগ্রসর হল উর্দ্মি।

অসমীয়া গোস্বামী আগামী দিনের নয়া মানুষের জন্য যে ছোট্ট 'নয়া ইতিহাস' রচনা করেছেন—তা তাঁর অন্যান্য রচন-বলীর মধ্যে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকবে—ভবিষ্যত মানুষকে এক নূতন আলোক সন্ধান দিয়ে তিনি তাদের অন্তরে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে থাকবেন, সে কথা আজ স্পষ্ট করে বলা যায়।

মহিলা সমাচার

শ্রীজ্যোতির্ময়ী ঘোষ

মণিপুর রাজ্যে মহিলা শাসন কর্ত্রী :

রাজকুমারী মুখরা দেবী এম-এ, এবং মিসেস্ অমল আকিম্ মণিপুর রাজ্যে টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের সভ্য ভারত সরকার কর্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তাঁহারা দুইটি বিশিষ্ট শাসন বিভাগে ভার পাইয়াছেন।

"শঙ্কর" সাপ্তাহিক প্রতিযোগিতায় স্বর্ণপদক প্রাপ্ত বালিকা :

৭ই সেপ্টেম্বর নূতন দিল্লীর রিগ্যাল রঙ্গমঞ্চে ১৯৫৮ সালের আন্তর্জাতিক শিশু প্রতিযোগিতায় পুরস্কার বিতরণ করেন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ মহাশয়। ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতির ছেলেমেয়েরা এবং প্রায় পনেরোটি আন্তর্জাতিক সংস্থা শিশু প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনারের কন্যা মিস্ জুলিয়া লীয়া রেমস্ স্বর্ণপদক পাইয়াছেন।

আন্তর্জাতিক বাংলা শিক্ষাপীঠএর কৃতিছাত্রী :

৮ই সেপ্টেম্বর নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতি কর্তৃক প্রবর্ত্তিত আদ্য, মধ্য ও অন্ত্য বাংলা পরীক্ষায় যে সব শিক্ষার্থী ও শিক্ষায়িত্রীগণ উত্তীর্ণ হইয়াছেন সমিতির বিংশ সমাবর্ত্তন উৎসবে (কনভোকেশন সভায়) তাঁহাদিগকে সার্টিফিকেট ও পদক প্রদত্ত হয়। পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপাল মাননীয়া শ্রীমতি পদ্মজা নাইডু অসুস্থতা বশতঃ উপস্থিত হইতে না পারায় শিক্ষামন্ত্রী রায় হরেন্দ্র নাথ চৌধুরী মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। পরম শ্রদ্ধেয় ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এক বাণীতে বলিয়াছেন—"ভারতীয় সংবিধানে আঞ্চলিক ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে এবং আঞ্চলিক ভাষার প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি রাষ্ট্রভাষার প্রচার প্রসারের পরিপন্থী ত নয়ই বরং বহুলাংশে সহায়ক। বাংলা সাহিত্যের গৌরব ও ঐতিহ্য সর্ব্বজনবিদিত। এই ঐতিহ্য ও গৌরব সংরক্ষণে নিখিল ভারত বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির প্রয়াস সর্ব্বাঙ্গীন সাফল্য লাভ করুক—এই আমার কামনা।" তিনি উক্ত সমিতিকে দুইশত টাকাও দান করিয়াছেন।

শ্রীমতী ই মায়া খান্ (ব্রহ্মের কন্সল জেনারেলের স্ত্রী) পুরস্কার বিতরণ করেন এবং রাশিয়ার কলিকাতাস্থ কন্সুলের প্রতিনিধি মিঃ ষুকোভ (ইনি ও ইহার পত্নী ভাল বাংলা জানেন ও বলেন) এর হস্তে বঙ্গভাষা প্রসার সমিতির পক্ষ হইতে বারোখানি বাংলা পুস্তক যন্ত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য প্রদান করেন।

সমাবর্ত্তনে তামিল, মালায়ালি, গুজরাতি, গান ও নৃত্য দেখাইয়া এক মধুর আন্তর্জাতিক পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াছিল।

মধ্য পরীক্ষায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহিলা শিক্ষায়িত্রী মার্কিণ মহিলা মিস্ ফ্রান্সিস্ মেজর, মিত্র মুখার্জী স্বর্ণরঞ্জিত পদক পান। আদ্য পরীক্ষায় মহিলাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম হওয়াতে "লীলা" পদক শ্রীমতী সুমতি বি, রাও (কর্ণাট) এবং বাংলা আবৃত্তির জন্য শ্রীমতী ইন্দ্রা সমর্থন যোশী "ক্ষেমেন্দ্র ঠাকুর" স্বর্ণরঞ্জিত পদক পাইয়াছেন। বাংলা

গানের জন্য শ্রীমতী মৃদুলা সা (গুজরাতি) "মলিনা বসু" পদক পান।

শান্তা রাজেন্ (তামিল), বাসন্তী ও গুরু গান্ধী (গুজরাতি), ইন্দিরা ঠক্কর (কান্নি), আর, ভি, ললিতা (তামিল), "কমল দেব" "আইজ্ সরকার", "ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল," "ডাঃ হরেন্দ্র মুনাজী" পদক ও পুরস্কার পান। শ্রীমতী ডি. এল, জয়ন্তো তিব্বতীয় মহিলা "জীবরতন" পদক আদ্য পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য পাইয়াছেন।

বিহার বিশ্ববিদ্যালয় কৃতী ছাত্রী :

রাঁচী মহিলা কলেজ হইতে শ্রীমতী সুষমা মিশ্র আই, এ, পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। তিনি বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ছাত্রী এই গৌরব লাভ করিলেন।

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীর কৃতিত্ব :

শ্রীমতী রত্না গুহ বর্ত্তমান বর্ষে আই, এ পরীক্ষায় সপ্তম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইনি শিলংয়ের লরেটো হইতে সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পরীক্ষায় আসামের মধ্যে ২য় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী দিপ্তী সিংহ গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বি, এ, পরীক্ষায় সংস্কৃত 'অনার্স' মানে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

বঙ্গনারীর কলঙ্কিত জীবন

সম্প্রতি পুলিস কোর্টের এক ধর্ম্মাসীন ম্যাজিষ্ট্রেটের রায় দান কালে যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা যেমন কলঙ্কপূর্ণ তেমনই ক্ষোভাদায়ক ও মানবসমাজের ক্ষতিকর। এক নারী ও তাঁহার স্বামী প্রকাশ্য স্থান মার্কেটের রাস্তায় পাপকার্য্য করিবার জন্য পথচারীকে আকৃষ্ট করিবার অপরাধে অভিযুক্ত হন। তাঁহারা দোষ স্বীকার করিয়া বলেন দারুণ অর্থাভাবে ও ক্ষুধার তাড়নায় স্বামী তাহার স্ত্রীকে দেহ বিক্রয় করিয়াও অর্থসংগ্রহ করিতে বাধ্য হন। নারী কোলে সন্তান লইয়া এই পাপ কার্য্যে লিপ্ত হয়। এ চিত্র কোন সভ্য সমাজে বরদাস্ত করা যায় না : তথাপি বিচারকর্ত্তা সেই স্বামী-স্ত্রীকে তিরস্কার করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি মন্তব্য করিয়াছেন অতি নিদারুণ অর্থ কষ্ট দেশে উপস্থিত হইয়াছে যে এমন ঘৃণ্য প্রবৃত্তি নারী হইয়াও করিতে বাধ্য হইয়াছে—তাহাতে সমাজের মূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইবার উপক্রম। সেই স্বামী বা নারীকে দণ্ড দিলে সমাজের কল্যাণ ভাল ত হবেই না বরং একটী নারীকে আরো পাপকার্য্যে লিপ্ত করা হবে। এই বিষয় সমাজ ও রাষ্ট্রনেতাদের চিন্তার বিষয়। এরূপ জঘন্য বৃত্তি আর যাহাতে মানব সমাজকে কলঙ্কিত না করে তাহার জন্য জীবন ধারণের উপায় ও প্রবৃত্তির উন্নতির জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা করিতেই হইবে।

সরোজনলিনী নারী-মঙ্গল সমিতি

মহিলা সমিতি পরিদর্শন

মহিলা সমিতির সাব কমিটির গত ৪ঠা তারিখের সভায় কতিপয় সদস্যাকে সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির অন্তর্ভুক্ত মহিলা সমিতিগুলি পরিদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদনুযায়ী যে কয়টি সমিতি পরিদর্শন করা হইয়াছে তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে :—

কাঁচড়াপাড়া ও ডাঙ্গাপাড়া মহিলা সমিতি

গত ৪ঠা সেপ্টেম্বর আমি শ্রীমতী সতীসা আচার্য্য এবং প্রচার বিভাগীয় কর্মী শ্রীমিতের লাল ঘোষ সহ প্রথমতঃ কাঁচড়াপাড়া ও পরে ডাঙ্গাপাড়া মহিলা সমিতি পরিদর্শন করি।

কাঁচড়াপাড়া সমিতির সভানেত্রী, সম্পাদিকা ও আরও কতিপয় কর্মিটির সদস্যা সমিতিতে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। সমিতির বিষয়ে তাঁহাদের সহিত বিস্তারিত আলোচনা করি।

শিক্ষয়িত্রীকে সেলাই বিষয়ে কতিপয় ডিজাইন দেখাইয়া দেওয়া হয় এবং ছাত্রীদেরও ঐ বিষয়ে বিশেষ ভাবে বলা হয়। সময় অভাবে শিক্ষার প্রণালী যথাযথ জানা সম্ভব হয় নাই, আগামীতে যখন পুনঃ যাওয়া হইবে তখন সে বিষয়ে শিক্ষয়িত্রী ও কমিটির সদস্যাদের সহিত আলোচনা করিবার আশা রাখি। শ্রীমতী আচার্য্য কল্যাণীতে থাকেন। তিনি মাঝে মাঝে কাঁচড়াপাড়া ও ডাঙ্গাপাড়া সমিতিতে যাইয়া সেলাই বিষয়ে পরিদর্শন ও সাহায্য করিবেন স্থির হয়।

কাঁচড়াপাড়া সমিতি হইতে ডালাপাড়া সমিতিতে আমরা যাই। সমিতির স্থানের অসুবিধা বিষয়ে সম্পাদিকা আমাকে বিশেষভাবে জানান। আমরাও লক্ষ্য করিলাম যে সমিতি উপযুক্ত স্থানের অভাবে খুবই কষ্টের সহিত কাজ করিতেছে। ইনষ্টিটিউট সেক্রেটারীর সহিত যোগাযোগ করিয়া সমিতির স্থানের এই অসুবিধা দূর করিবার চেষ্টা করা হইবে বলিয়া সম্পাদিকাকে জানান হয়। সময় অভাবে সমিতির কাজ ও শিক্ষিকার কাজ দেখিবার সুযোগ হয় নাই।

স্বাঃ শ্রীমেহালী চৌধুরী, সম্পাদিকা
মাতৃ ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র, সঃ নঃ সমিতি।

নারীকল্যাণ বয়ন সমিতি—বেলঘরিয়া

বয়স্কা শিক্ষা বিভাগ

গত ২০শে সেপ্টেম্বর বেলঘরিয়াস্থিত নারীকল্যাণ বয়ন সমিতি পরিচালিত বয়স্কা শিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করি।

উক্ত বয়স্কা শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্রীদের হাজিরা বহিতে ছাত্রী সংখ্যা মোট ৩০ জন রহিয়াছে। পরিদর্শনের দিনে ২০ জন শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

আক্ষরিক শ্রেণীতে নামলিখি করিতে জানেন না এমন অনেক বয়স্কা মহিলা রহিয়াছেন। বয়সের বাধা অতিক্রম করিয়া ইহারা যে শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হইতে পারিয়াছেন তাহা দেখিয়া আমি বিশেষ প্রীত হইলাম। বর্ণপরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া ৩য় শ্রেণীর মান পর্য্যন্ত এই আক্ষরিক শ্রেণীতে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। এই বিভাগের শিক্ষয়িত্রী ৯ম শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। শিক্ষাদান কার্য্যে ইহাকে অনলস দেখিলাম।

সামাজিক শিক্ষা শ্রেণী। এই শ্রেণীতে শিক্ষার্থীরা সকলেই বয়স্কা। ৪র্থ শ্রেণী ও তদূর্দ্ধ লেখাপড়া জানা শিক্ষার্থীদের এই শ্রেণীতে নেওয়া হয়। ইতিহাস, ভূগোল, নাগরীক ও রাষ্ট্রীয় আলোচনা ও সামাজিক শিক্ষা প্রভৃতি এই বিভাগে শিক্ষা দান করা হইতেছে। এই বিভাগের শিক্ষিকা আই, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়াছেন। তাঁহাকেও বিশেষ কার্য্যক্ষম মনে হইল।

দৈনন্দিন রুটিন ও পাঠদান পদ্ধতি লিপিবদ্ধ, শিক্ষার বিষয়বস্তু ও হিসাবপত্রাদি রাখিবার ব্যবস্থারীতি নির্দ্দেশ দেওয়া হয়।

বয়স্কা শিক্ষা বিভাগের কতিপয় ছাত্রীকে সাধারণ পরীক্ষা করি এবং তাহাদের উত্তরের মধ্যে তাহাদের বুদ্ধি-মত্তার পরিচয় পাই।

শিল্প শিক্ষা বিভাগের খাতাপত্রাদি ঐদিন দেখিতে পারি নাই। পরে দেখাইবে স্থির হয়।

সমিতির প্রায় ১০ জন সদস্যা আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন।

উল্লেখ করা যাইতে পারে যে এই সমিতি সরকারী পুনর্বাসন দপ্তরের সাহায্যে এক অনাবাসিক তাঁত শিক্ষা-কেন্দ্র পরিচালনা করিতেছে। ২৫ জন শিক্ষার্থী মাসিক প্রত্যেকে ১৫৲ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইতেছে।

স্বাঃ—শ্রীমতীষা রায়
মুখ্য সাধারণ সম্পাদিকা, সঃ নঃ সমিতি।

স্বাধীনতা দিবস পালন

১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা দিবস পালন উপলক্ষে এক সভা ও আনন্দ উৎসবের ব্যবস্থা করা হয়। সমিতির মহিলা কর্ম্মী শ্রীযুক্তা সুবোধ বালা ঘোষ স্বাধীনতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং স্বাধীন ভারতে নারীর দায়িত্ব বিষয়ে বক্তৃতা করেন। সরোজনলিনী ট্রেনিং, শিল্প, বয়স্কা সকল শিক্ষা বিভাগের শিক্ষার্থীরা এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে। শিক্ষার্থীরা গীত ও নৃত্যদ্বারা এক মনোজ্ঞ পরিবেশের সৃষ্টি করে। জাতীয় সঙ্গীত ও পতাকা উত্তোলন করা হয়। ঋষি অরবিন্দের জীবনী আলোচনা, তাঁহার অবদান বিষয়েও শ্রীযুক্তা ঘোষ আলোচনা করেন এবং সমবেত সকলে তাঁহার অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদের প্রতিও শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়।

চরকা কেন্দ্র

চরকা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা সকাল ৮-৩০ ঘটিকায় রাজি হইতেছে এবং অপরাহ্নে ইন্ডিয়ান কলিকাতা জেলা কংগ্রেস অফিসে সূত্রযজ্ঞে যোগদান করে এবং উক্ত স্থানেই তাহারা চরকায় সুতা কাটে।

শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই কেন্দ্রের চিকিৎসাধীন শিশু ও রোগীদের ভিতরে দুধ ও মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয় এবং এই সকল রোগী ও শিশুদের মধ্যে সংগৃহীত পুরাণো জামা কাপড়ও বিতরণ করা হয়। শ্রীমতী সাবিত্রী সেন, শ্রীমতী সবিতা ব্যানার্জী ও শ্রীমতী অমিতা চৌধুরী এই অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিতে সাহায্য করেন।

শিশু ও মাতৃমঙ্গল কেন্দ্রের ১০০টি প্রসূতি ও শিশুদের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটী বিনামূল্যে গুড়া দুধ দিয়া এই বিভাগটীকে সাহায্য করিতেছেন। এজন্য এই জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে সরোজনলিনী নারী মঙ্গল সমিতির পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা জানান যাইতেছে।